সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ডঃ দীপক চন্দ্র

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SACHAL JAGANNATH SRIKRISNACHAITANYA

By

Dr. DIPAK CHANDRA

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

স্বাধীনতা দিবস—১৯৭০

প্রচ্ছদ :
গণেশ বসু

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

শ্রীসুশীলকুমার বিশ্বাস

ও

শ্রীমতী মীরা বিশ্বাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম
ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায় (১ম, ২য়)
বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ
কাশ্যপেয়
কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন
মহাবিশ্বে মধুকৈটভ
দ্রৌপদী চিরন্তনী
রাবন বহে নিজনাম
জননী কৈকেয়ী
রামের অজ্ঞাতবাস
যদি রাধা না হ'ত

সমালোচনা সাহিত্য

বাংলা নাটকের আধুনিকা ও গণচেতনা
মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

সম্পাদনা গ্রন্থ

হরিবংশ
মনোজ বসুর রচনাবলী (১—৪)
মনোজ বসুর কবিতা,

॥ দৃষ্টিকোণ ॥

শ্রীচৈতন্যের পাঁচশত বৎসরের পূর্তি উৎসবে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। পাঁচশত বৎসর ধরে চৈতন্যদেব সম্পর্কে যে প্রচলিত সংস্কার ও দার্শনিক চিন্তায় আধ্যাত্মবিশ্বাস মনকে অভিভূত করে আছে তা আমার স্পষ্ট সিদ্ধান্তে অনেকে ক্ষুব্ধ হতে পারে। পাঁচশত বৎসর অতিক্রান্ত হল। তবু চৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনের পশ্চাতে যে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাতপট আছে তার ঐতিহাসিক পৃষ্ঠাটি উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। চৈতন্যদেবের পূর্ব-স্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে সেই প্রথাবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের অতি পুরাতন ও জীর্ণ পাঁচিলটি যদি ভেঙে পড়ে, অপসংস্কৃতির অন্ধকার থেকে চৈতন্য মুক্তির কোন সুযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে অতি সুন্দর সুন্দর কাব্য কথায় দার্শনিকতার তলায় চাপা পড়া কথার চেয়ে কঠিন সত্য অনেক বেশি পবিত্র নয় কি? পাঁচশ বছর পরে, ধর্মহীনতার যুগে আমরা নিশ্চয়ই পরিশীলিত যুক্তি, বুদ্ধি, মার্জিত রুচি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে শ্রেয় ও অশ্রদ্ধেয়কে অনায়াসে বাছাই করে নিতে পারি। প্রয়োজন হলে তার জন্যে আমাদের আবহমানকালের সংস্কারকে আঘাত করতে হবে। কেননা, মানুষের ধর্ম তাই; যা সর্বমানবের মঙ্গল করে। চৈতন্যদেব নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন জনগণের মঙ্গল বিধানের

ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সর্বজনীন দৃষ্টি ছিল না। এইজন্যে হিন্দু-ধর্মের উপর আঘাত এসেছে বারংবার।

পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষকে পথের সন্ধান দেয়, অনেক সময় তাকে গড়েও তোলে। গৌড়সুন্দরের সমসাময়িক অবস্থাই তাঁর আগমনের পটভূমি। জাতি-বর্ণে বিভক্ত সমাজে নানাপ্রকার বঞ্চনা, ঘৃণা, অবহেলা বেদনা, নিপীড়ন,—তন্ত্রের বিকৃতি, অনাচার, ব্যাভিচার সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছিল। বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মের বিস্তার অভিযানে হিন্দু মন্দির ধ্বংস, গোমাংস খাইয়ে দিয়ে, মুখে কুলিকুলি করে জল দিয়ে হিন্দুদের ধর্মনাশ, জাতিনাশ এবং জোর করে ধর্মান্তর করা হত। কারণ, হিন্দু অধ্যুষিত দেশে একটি বিদেশী রাজ-শক্তিকে টিঁকে থাকতে হলে নিজ ধর্মমতে বিশ্বাসী লোক বৃদ্ধির প্রয়োজন। এরকম একটা পরিবেশে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব।

এখন প্রশ্ন কিসের ভিত্তিতে উদ্ধত, অহংকারী, দাম্ভিক পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ গৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন? জাতিভেদের কঠোরতা বর্ণবৈষম্যের নিষ্ঠুরতা, আচার প্রথার অমানুষিকতা, ধর্মবৈরী হিন্দুদের প্রবল আধিপত্য পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ ক্ষোভ, বঞ্চনা, নিপীড়িত দরিদ্র, অসহায় মানবকুলকে মুসলমান ধর্মগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল দুটি কারণে। রাজ-শক্তির ছত্রচ্ছায়ায় এলে সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা যেমন প্রবল, তেমনি ইসলামের গণতন্ত্রী আদর্শ ও সাম্য মনোভাব তাদের সামাজিক, আত্মগ্লানি এবং অসহায়তা থেকে উদ্ধার লাভের অবলম্বন হয়েছিল। তাই হিন্দুধর্মের উপর আঘাত প্রতিরোধের সংকল্প নিলেন চৈতন্য। জাতি ও বর্ণভেদে দিশাহারা হয়ে হিন্দুরা পরস্পরকে ঘৃণা করে, উপেক্ষা করে, অবহেলা দেখিয়ে সামাজিক ঐক্য সংহতি ও শক্তি ক্ষয় করছে। সুতরাং এই ক্ষয় রোধ করতে হলে মানুষ মানুষকে সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়িয়ে তুলতে হবে। পারস্পরিক নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। মানুষ শক্তির উৎস। ভেদাভেদ সৃষ্টি করে কি রাজশক্তি, কি সমাজ বেশিদিন টেঁকে না। তাই আগে মানুষকে প্রেমে বাঁধতে হবে। মানুষের মধ্যে ছোট বড় বলে কিছু নেই-এই বোধ, বিশ্বাস আপামর জনসাধারণের চিত্তে জাগানো দরকার। অতএব, সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, সমাজে যে অত্যাচার, নিপীড়ন, অবহেলা ব্যাভিচার, অনাচার, ধর্মনাশ চলছিল তার প্রতিকার প্রচেষ্টাতেই নিমাইর সন্ন্যাস গ্রহণ। কারণ, একজন গৃহীর কথা কেউ শোনে না। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি মানুষের অচলা ভক্তি। সন্ন্যাসী

পার মিষ্ট কথায়, মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা চিত্ত জয় করতে। তাই'ত তিনি পরবর্তীকালে লোকচোখে হয়ে উঠলেন সচল জগন্নাথ।

চৈতন্য তিরোভাবের পর মূলতঃ চৈতন্যকে নিয়ে এক দার্শনিক ভক্তিবাদের সৃষ্টি হয়। চৈতন্যচরিত কাব্যগুলি তার ফসল। ভক্ত কবির পুজাঞ্জলি। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ আর নবদ্বীপের নিমাই দুধে আমে এক হয়ে গেল। আর আঁঠির মত পড়ে রইল রক্তমাংসের সজীব মানুষটি। ভক্ত কবির চোখে নিমাই মানুষীবৃত্তের বাইরে এক অন্য মানুষ ঃ নররূপী কৃষ্ণ, সচল জগন্নাথ, যুগাবতার শ্রীচৈতন্য। সন্ন্যাস তাঁর কর্মজীবনকে ঢেকে দিল। বাস্তব হারিয়ে গেল এক রহস্যময় কুহেলিকায়। একজন ঐতিহাসিক মানুষের বিশালতা আনতে তাঁর চরিত্রকে বড় করে আঁকতে মাঝে মধ্যে এমন সব অদ্ভুত, অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ হল যা তার ভেতর শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের মহিমা গৌরব নষ্ট হয়ে গেল। তাকে অনেক ছোট করে ফেলা হল। পিতার বয়সী অদ্বৈতাচার্য, জননী শচী, লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া একজন গ্রাম্য গোঁয়ার-গোবিন্দ অশিক্ষিত মানুষের মত পদাঘাত কিংবা প্রহার করার ঘটনাগুলো বিসদৃশ শুধু নয়, দৃষ্টিকটু, পীড়াকর। এরকম অসংখ্য ঘটনা পাঠকের অজানা নয়। প্রচলিত চরিতগ্রন্থগুলি শ্রীচৈতন্যের জীবনের সামগ্রিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

প্রচলিত চৈতন্য চরিতগ্রন্থগুলি নানাদিক থেকেই অসম্পূর্ণ। তাই নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই অসম্পূর্ণতা যথাসাধ্য দূর করে একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তব জীবনালেখ্য রচনা করেছি। চৈতন্যচরিত কারেরা চৈতন্যের সমকালে জন্মগ্রহণ করেও পরস্পরবিরোধী তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং ইচ্ছাকৃত তথ্যের পরিবর্ত্তন এবং বিলোপ করেছেন। একালের লেখকও সত্যের তাগিদে চৈতন্য চরিতকারদের অলৌকিক এবং বিসদৃশ ঘটনাগুলো বর্জন করেছে। আবার অনেক ঘটনা উপন্যাসের খাতিরে নতুন করে সাজিয়েছে এবং গড়েছে। তাতে হয়ত, চৈতন্যচরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং বাস্তবতা আরো সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট হয়েছে।

গ্রন্থ প্রসঙ্গে আরো দু'একটা কথা বলার আছে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্প দংশনে মৃত্যু আমার যথার্থ মনে হয়নি। এটি একটা আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে হয়েছে। নিমাইর সঙ্গে জননীর পছন্দ করা কনে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন সম্পর্কই গড়ে উঠেনি। বিষ্ণুপ্রিয়াকে উপেক্ষা করে সে মায়ের উপর লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর শোধ নিয়েছে। সন্ন্যাসী হয়ে জননীকে প্রিয়জন বিরহের কষ্ট দিয়েছে। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের কুয়াশা এখন অনেকখানি কেটে গেছে। একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর মত

বাস্তব পরিবেশ তৈরী হয়েছে। সত্য প্রমাণের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি এবং অনুসন্ধান হলে যা হতে পারে আমি তার সম্ভাব্য সত্যটি তুলে ধরেছি। চৈতন্যের অন্তর্ধানের রহস্যকে রহস্য আবৃত করিনি। নিজের বিশ্বাস ও ধারণাটি ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন'এর অভিমত এবং উড়িয়া কবি ঈশ্বর দাস'এর বর্ণিত তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করে একটা সিদ্ধান্তে এসেছি।

বইটি উৎসুক গ্রাহক ও পাঠকদের হাতে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দিতে পারিনি বলে আমি লজ্জিত। এজন্যে তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এই গ্রন্থটি সূচনা করার দিন থেকে প্রকাশক শ্রী রণধীর পালের আগ্রহ ও উৎসাহ আমাকে কাজে লেগে থাকতে বাধ্য করেছে। এবং আমার কিছু অসুবিধাও হাসিমুখে সহ্য করেছেন। এজন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ গ্রাহকদের কাছে।

॥ এক ॥

খুব সন্তর্পনে আর চুপি চুপি দিনের সব আলো মুছে দিয়ে সন্ধ্যা নামল দ্বীপে। জলস্থল অন্তরীক্ষের সব বাস্তবতা হারিয়ে গেল এক রহস্যময় কুহে-কায়। গঙ্গার বুক থেকে ফুর-ফুরে দক্ষিণ হাওয়া এল অদ্ভুত এক হাহা-রের শব্দ নিয়ে। নিমাইর ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কালো কোঁকড়া চুল হাওয়া লেগে লামেলো হয়ে গেল। মুগ্ধ-বিভোর নিমাইর তবু কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ানো ঘাটের একপ্রান্তে চিত্রকরের আঁকা ছবির মত বসে আছে বালক াই। তার দেহ নিস্পন্দ স্বপ্নালু চোখ দুটো অন্ধকার নিসর্গে নিমগ্ন।

অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বরূপ তার ছোটভাইটিকে দেখতে পাচ্ছিল। খুব ়। অনেকক্ষণ ধরে সে বড় বড় দুই চোখে চেয়ে নিঃশেষ করে দেখল কে। বুকের ভেতর তার কেমন একটা উথলে উঠার ভাব জাগল। এই তার ভবিষ্যতে খুব বড় কেউ একজন হবে। চোখের দৃষ্টি এই বয়সেই ভীর! কেমন ধারাল চেহারা। যেমন ঝকমকে তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত তার নন, আর কথাবার্তা। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এক আশ্চর্য সুন্দর বালক। াই ভাল লাগে। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। যে তার বুকেই জেগে উঠে স্নেহভরা আবেগ আর মধুর ভালবাসা। পর গায়ে কাঁটা দিল। নিমাইর গা ঘেঁষে বসল। একটু চাপা দীর্ঘশ্বাস খুব ধীরে।

নিমাইর মুখোমুখি বসে বিশ্বরূপের দশবছর আগের এক প্রভাতের কথা ড়ল। নিমাই তখনও হয়নি। মাতৃ গর্ভে এসেছে কেবল। তখন তার বয়স। আচার্য অদ্বৈতের টোলের ছাত্র। তবু আশ্চর্য এক বিস্ময় নিয়ে বছর আগের ঘটনা দেখতে লাগল। সেই অতীত এখন সজীব নে।

নিশাবসান হয়নি তখনও। কিন্তু অন্ধকারের ঘোর কেটে গিয়েছিল। থেকে কুয়াশা মাখানো ছাইরঙা আলো গঙ্গাবক্ষ স্পর্শ করল। তরঙ্গে তার অতুলনীয় আলোর মায়া মরীচিকার মত জ্বলজ্বল করতে লাগল।

আলো আঁধারের সন্ধির মধ্যে আকাশে ভোরের আয়োজন চলছিল। নীল আকাশ আত্মপ্রকাশের যন্ত্রনায় রাঙা হয়ে উঠল। এক কোমড় জলে দাঁড়িয়ে অদ্বৈত সূর্যোদয় দেখছিল।

আকাশে অদ্ভুত রঙের খেলা। দেখতে দেখতে পূব আকাশ রক্তের নদী হয়ে গঙ্গার স্রোতে এসে মিশল। আলোর জ্যোতি মেখে অদ্বৈতাচার্য বেশ কিছুক্ষণ স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল। দুই আঁখি পল্লবের পাতা ভারী হল। চোখের তারায় স্বপ্নাচ্ছন্নতা নামল। মহৎ উদার পবিত্র এক অনুভূতিতে তার অন্তরটা সহসা বিরাট আদিত্যবর্ণ এক অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে যেন লুটিয়ে পড়ল। নাভিমূল থেকে সহসা উচ্চ গম্ভীর এক স্বর উঠে এল। অজ্ঞানতে স্বগতোক্তি করল: প্রকাশের কাল বড় কষ্টের। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা বড়ই যন্ত্রনার। জ্ঞানহীনতা থেকে অজ্ঞতা থেকে, জ্ঞানে ফেরাও বড় কষ্টের।

নির্জন সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে ছাই ছাই অন্ধকারে বিশ্বরূপ অদ্বৈতাচার্যের খুব কাছেই অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনল। শুনতে পেল অদ্বৈতের বুকের গভীর থেকে উঠে আসা শ্বাস পতনের কষ্টকর শব্দ। বিশ্বরূপ বিস্ময় ও অবিশ্বাসভরে আচার্যকে দেখতে লাগল।

অদ্বৈতাচার্য অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাতের পাতার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ভরে চেয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ কাটল। বিশ্বরূপ খুব শান্ত স্বরে বলল: আচার্য ক'দিন ধরে দেখছি আপনার মনটা ভাল নেই। কেমন একটা অশান্ত অস্থিরতায় আপনি সর্বদা অন্যমনস্ক। বিষণ্ণ। আপনাকে এরকম বিচলিত হতে দেখিনি কখনও।

বিশ্বরূপের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন শুনে অদ্বৈতের মুখে স্মিত হাসি সঞ্চার হল না বটে, কিন্তু তার মুখে কিছু কোমলতা ফুটল। যেমন শিশুর দুশ্চিন্তা দেখে মায়ের মুখে কোমল প্রসন্নতা ফোটে। অদ্বৈতাচার্য পুরনো ক্ষতে ব্যথাতুর স্পর্শ লাগল। খুব মৃদু কণ্ঠে বিষণ্ণ গলায় ডাকল: বিশ্বরূপ! তুমি ঠিকই উপলব্ধি করেছ। যত দিন যাচ্ছে আমি ভীষণ মুষড়ে পড়ছি। ধ্যানে আমার মন বসে না। চিত্তকে স্থির রাখতে পারি না। আমার সব যুক্তি হার মেনে যাচ্ছে। বিশ্বাস ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমার মন ওই জাহ্নবীর তরঙ্গের মত অশান্ত হয়ে উঠেছে। নিজেকেই প্রশ্ন করি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ'ত বলেছেন ধর্মের গ্লানি হলে, অধর্মের অভ্যুদয় হলে তিনি অবতীর্ণ হন। সম্ভবামি যুগে যুগের সব লক্ষণ'ত প্রকট। তবু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হচ্ছেন না কেন? কিন্তু তাঁকে'ত আসতে হবে। দরিদ্র, নীচ, মুর্খ, দুর্গত, অধম মানুষদের উদ্ধার করতে

তাঁকে আসতেই হবে। কিন্তু, আর কবে অবতীর্ণ হবেন তিনি ?

অদ্বৈতাচার্যের লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কিন্তু তার দুই চোখ সূর্যোদয়ে নিমগ্ন। বিশ্বরূপ বিভ্রান্তের মত অদ্বৈতচার্যের দিকে তাকিয়ে রইল। কথা-গুলোর মধ্যে আশ্চর্য শক্তি ছিল। সারা শরীরে তার শিহরণ জাগাল। বিশ্বরূপ কিছুক্ষণ থম ধরে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তারপর কাঁপা কাঁপা বুক নিয়ে বলল: আচার্য, ব্যাকুল না হলে'ত তাকে দেখা যাবে না। ভোগান্তিতে ভোগান্তিতে অতিষ্ঠ হলেই তবে ব্যাকুলতা আসবে। ঈশ্বরের জন্যে সব মানুষের অন্তর ব্যাকুল না হলে তিনি'ত ধরাধামে আসেন না। বৈষ্ণব ধর্মের নায়ক শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কথাই ধরা যাক—দানব চরিত্র স্বৈরাচারী কংসের অত্যা-চারে, পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন যাদবকুলের লোকজনেরা দলে দলে বছরের পর বছর দেশত্যাগ করেছে, দুঃসহ দারিদ্র এক কষ্ট ভোগ করেছে, বছরের পর বছর ধরে এক নিঃসহায় নিরপরাধ নারীর সদ্যোজাত শিশু একটির পর একটি নির্মমভাবে হত্যা হয়েছে। মানুষের বিশ্বাসে, মনে কতবার সংশয় এসেছে। তার পর একদিন মানুষের ব্যাকুল আর্তির রূপধরে দুস্কৃতের বিনাশ সাধন করতে নিপীড়িত মানুষকে পরিত্রাণ করতে তাকে নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত করতে মানবী মাতার গর্ভে বিষ্ণুর অংশে জন্ম নিলেন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ।

বালক বিশ্বরূপের কথা শুনে আশ্চর্য হল অদ্বৈতাচার্য। দু'চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল ঔৎসুক্যে। মুগ্ধ অভিভূত গলায় উচ্চারণ করল: বিশ্বরূপ !

বিশ্বরূপের মুখে এক চিলতে বিজ্ঞের হাসি। বলল: আচার্য আপনি সকলের কথা ভাবেন। মানুষের শুভ ও মঙ্গল কি করলে হয়, রাত্রি-দিন শুধু তার কথাই ভাবতে দেখি। পিতা বলেন, ভগবানকে ডাকবার, তাকে জাগ্রত করার শক্তি একমাত্র আপনার মধ্যেই আছে। আপনার সাধনা এবং শক্তি নাকি পারে এই মহাশ্মশানের বুকে ফুল ফোটাতে। আপনার সে ঐশী শক্তি দিয়ে নবদ্বীপকে উদ্ধার করুন।

অদ্বৈতাচার্য দুই চোখ বিস্ফারিত হল। ভুরু কুঁচকে মুগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর স্তিমিত কণ্ঠে বলল: পাগল ছেলে। আমার যদি সে ক্ষমতা থাকত তা-হলে এমন করে আকুল কণ্ঠে সেই অনাগত বিধাতাকে ডাকব কেন ?

বিশ্বরূপ কথা খুঁজে পেল না। দারুন একটা চাপা উত্তেজনায় তার শরীরের শিরাগুলো দপ দপ করছিল। রক্তচাপের আধিক্যে গৌরবর্ণ মুখ

রাঙা হয়ে গেল। কিন্তু সে কয়েকমুহূর্ত্ত। তার পরেই ফিরে এল স্বাভাবিক-তায়। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল: কলিকালে মানুষ আদর্শহীন, বিবেকবর্জ্জিত ধর্মভ্রষ্ট, ভক্তিহীন বলে তাদের রসনায় হরিনামের মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। কিন্তু ঈশ্বর যাই করেন, তার পেছনে যুক্তি নিশ্চয়ই থাকে। সেই যুক্তি, আমাদের ঘোলা এবং অদূর-দৃষ্টি চোখে চেয়ে সব সময় বুঝতে পারি না। এরও হয়ত একটা মানে আছে। জীবন মানে'ত জীবিত থাকার চেষ্টা। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে এই আদর্শহীন, বিবেকহীন, ধর্মহীন জীবন যন্ত্রনার একফালি জমিতে গোটা জীবনটা থিতু হয়ে গেছে। কিন্তু জীবন'ত থেমে থাকে না। দুঃখের সমুদ্র পার হয়ে যাওয়ার আর এক নামত জীবন। আমাদের সমস্তরকম অনু-ভূতির মধ্যে তার স্বরূপকে বোঝার ক্ষমতা হচ্ছে না বলেই হয়ত মনে হয় ঈশ্বর নেই, কিংবা ঈশ্বর বড় নিষ্ঠুর।

গৌরকান্তি, শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত প্রধান সাধক অদ্বৈতাচার্য হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছেন বিশ্বরূপের দিকে। শরতের সকাল বেলা। বাতাসে শিউলির গন্ধ। গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে নিঃশব্দ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। কোঁয়াক কোঁয়াক করে ডাকতে ডাকতে এক ঝাঁক বক উড়ে এসে আদি গঙ্গার চরে বসল। ঠোঁটে করে যেন সূর্যের আলো আনল তারা। পাখীরা গাছের ডালে সব জেগে মহানন্দে কলরব করে উঠল। অদ্বৈতাচার্যর দুই চোখে স্নিগ্ধ ও গভীর মায়াবী দৃষ্টি। মুখে অনির্বচনীয় হাসি। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল: বিশ্বরূপ! তোমার জ্ঞান, ভক্তি বিশ্বাসের প্রতি আমার অনুরাগ ও বিস্ময়কে আরো দ্বিগুণিত করলে। তোমার অদ্ভুত কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, বেশিরভাগ মানুষই বাইরের বারান্দায় বসে কোলাহলের মধ্যে কাটিয়ে দেয় সময়টা। সময় প্রবাহের গভীরের কলধ্বনি তাদের শোনা হয়ে উঠে না। বাইরে বসে থাকলে কি আর ভিতরের ডাক শোনা যায়? আমি নিজেও তাদের মত। শুধু তুমিই অন্য রকম। তুমি যা বললে তা এমনি অমোঘ ভাবে হঠাৎ একটি পরম সত্যকে প্রকাশ করল যে, আমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি। বৎস তুমি আমাকে আর সংশয়ে রেখ না। যত দেখছি, জানছি তোমাকে, অবাক হচ্ছি। তোমার মত অল্পবয়স্ক কোন বালক এত মেধা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয় না। তুমি এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছ। সত্য করে বল তুমি কে? তবে কি তুমিই আমার ইষ্টের রূপ ধরে এলে?

চমকানো বিস্ময়ে বিশ্বরূপের বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল।

ভয়ংকরভাবে। পাখি উড়ে যাচ্ছে শরতের অস্পষ্ট ভোরের আকাশ থেকে মাঝ সকালের আকাশে। অভ্র কুচির মত রোদের নরম উজ্জ্বল টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়েছে গঙ্গার তরঙ্গের হিল্লোলে, নরম সবুজ শিশির ভেজা ঘাসের উপর। স্নিগ্ধ সুন্দর সকাল যেন অদ্বৈতাচার্যকে হঠাৎ আভাসিত করে দিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। বিশ্বরূপ ধাঁধায় পড়ল। পৃথিবীর সব রঙ, শব্দ ও গন্ধের দিকে লোভীর মত তাকিয়ে সে বুকের ভেতর তার রক্তের দপ দপানি অনুভব করল। কিন্তু আচার্যের অদ্ভুত অনুভূতির সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? যুক্তি দিয়ে এসব বিশ্বাসের কোন ব্যাখা হয় না। এ হল অনুভূতি। কিন্তু হৃদয়ের অনেক প্রশ্নের কোন উত্তর নেই মস্তিকের কাছে।

হতভম্ব হয়ে বেশ কিছুক্ষণ আচার্যের দিকে তাকিযে বুকের গভীরতম প্রদেশে নিজেকে খুঁজল। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটল। তারপর, সমস্ত রকম অনুভূতিব মধ্যে দিয়ে এক অদ্ভুত আর্ত্তস্বর তার গলা থেকে বেরোল। আচার্য, এসব কথা বলে আপনি নিজেকে, বোধ হয় ঠকাচ্ছেন, আমাকে আঘাত কবছেন, কিন্তু এভাবে ধ্যানের ঈশ্বরকে ছোট করার কোন মানে হয় না। এসব মনের ব্যাপার। কতকগুলি আকাংখার মাধ্যমে মনের ভেতর সৃষ্টি হয় কেবল।

কথাগুলো বলে বিশ্বরূপ আর দাঁড়াল না। বিব্রত লজ্জায় বিচলিত হয়ে সে জল থেকে ত্রস্ত পদে উঠে এল তীরে। তারপর কোনদিক না তাকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল। পথে যেতে যেতে অনুভব করেন, আচার্যের কথাটার মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি লুকিয়ে আছে। শরীরের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে ওই কথাটার আনন্দ মনেব মুক্তির দরজা হাট করে দিল। শরীর কণ্টকিত হল পুলকে। মহৎচিন্তায় মনটা ভিজে গেল। মনটাও প্রসারিত হয়ে গেল বহু দূরে।

অদ্বৈতাচার্যের কথাগুলোর যেমন এক আলাদা আকর্ষণ আছে, তেমনি আছে তার অর্থের, ব্যাপ্তির ও বিকাশের। মনের অভ্যন্তরে তা একটু একটু করে তার আগোচরে কথাগুলো দাগ কেটে বসল। সে নিজেও অনুভব করল। ইদানীং কেমন যেন নতুন নতুন লাগে নিজেকে। একদিনের একটা ঘটনা বিশ্বরূপের চোখের তারায় ভেসে উঠল।

পাঠ সমাপ্তির পর অদ্বৈতাচার্য তাকে নিজের শয়ন কক্ষে নিয়ে বসাল। খুঁটিয়ে অনেক কথাই জানল। তারপর খুব নিরীহভাবে মলিন হেসে বলল: বিশ্বরূপ, অনেক মানুষ দেখলাম, একমাত্র তুমি বোধ হয় একটু আলাদা একটু

অন্যরকম। বেশীরভাগ মানুষের সদগুণগুলি অভাবে দারিদ্রে অশিক্ষায় নষ্ট হয়ে যায়। ভেতরের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। তখন তাদের কোন আদর্শ থাকে না, লক্ষ্য থাকে না। আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকেনা। সবচেয়ে বড় কথা নিজের ধর্মের প্রতিও তাদের শ্রদ্ধা নেই ঈশ্বরের ভক্তি নেই। কিন্তু তোমার চেহারার মধ্যে এমন একটা সন্ন্যাসীসুলভ সাত্ত্বিকভাব আছে যে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। তোমার রূপ পাণ্ডিত্য চুম্বকের মত মানুষকে আকর্ষণ করে। তোমার ভেতর আমি শ্রীভগবানকে ডাকবার শক্তি দেখেছি। নিদ্রিত দেবতাকে জাগ্রত করার শক্তি তোমার আছে। তুমি মানুষকে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ কর।

বিশ্বরূপ একেবারে নীরব। সম্মোহিতের মত চেয়ে রইল অদ্বৈতাচার্যের দিকে। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। উদাস বিষণ্ণ গলায় বলল : আচার্য, আমার সে শক্তি কোথায়? কথাটা বলার সময় বিশ্বরূপ বার দুই ঢোক গিলল। একটা আবেগ তাকে দুর্বল করে দিল। কান্না পেল। আচার্যের গভীর স্নেহ, অগাধ আস্থাকে এভাবে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। ধরা ধরা গলায় একটু থেমে বলল : কি করে বোঝাই আপনাকে? আমি কি করব তাও বুঝতে পারছি না।

বিশ্বরূপের মুখটা একটু ভাল করে দেখল অদ্বৈতাচার্য। চোখদুটোয় তার পাগলের চোখের মত অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। গম্ভীর গলায় বলল : মানুষের এবং সমাজের কোন কাজে যদি না লাগলে তুমি, তা হলে মানুষ হয়ে কেন জন্মালে? তোমার মূল্যই বা কি? যে মানুষের সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে তুমি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছ তার সুস্থতা নষ্ট হওয়া কিংবা সৌন্দর্যহানি হওয়া যে কি ভয়ানক তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার কাছে ধর্ম যতখানি, যতখানি তোমার বিদ্যাভাস, আমার কাছে গোটা হিন্দুধর্ম রক্ষার মহানায়কের অন্বেষণ এবং তার আবির্ভাব ঘটানো ততখানি। নবদ্বীপে বিদ্যাগর্বী পণ্ডিতেরা নিজ নিজ অহমিকা আর বেদ-বেদান্ত ন্যায়ের কুট তর্কাতর্কি নিয়ে মগ্ন। দেশ থেকে যে হিন্দুধর্ম লোপ পেতে বসেছে তার কোন উপলব্ধি নেই তাদের। ধর্মহীন পাষণ্ড মানুষদের বিবেকহীন অত্যাচারে, লোভে শাসনে, পাপে শান্তিপ্রিয় নিরীহ ধর্মপ্রাণ মানুষদের যে দুর্দ্দশা ভোগ করতে হচ্ছে তা কেউ চোখ খুলে দেখল না। বঙ্গে হিন্দুর আধিপত্য নেই। তুর্কীদের সময় থেকে একদিকে হিন্দুর ধর্মনাশ করার মহোৎসব চলেছে, অন্যদিকে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির বিচূর্ণ হচ্ছে। সেখানে গড়ে উঠছে মসজিদ। তবু

হিন্দুর চৈতন্যোদয় হচ্ছে না। হিন্দুদের উদারতা এবং তাদের ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে সুলতানীরাজ বঙ্গের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে। চোখের অগোচরে নিঃশব্দে হিন্দুরা কত যে হারাল আর কত যে হারাচ্ছে তা কাউকে আমি বোঝাতে পারব না। শুধু তুমি হয়তো বুঝলেও বুঝবে কিছুটা। তোমাকে আমার আদর্শের জন্যে ডাকছি না। তোমার ধর্ম রক্ষা এবং তোমার প্রতিবেশী মানুষের সেবার কাজে তুমি যদি লাগ, কোনরকম কাজে সে জন্যেই ডাকছি। আমি সব কিছুই করব তোমার জন্যে।

অদ্বৈতাচার্যের প্রস্তাব শুনে বিশ্বরূপের বুক কাঁপতে লাগল। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে আচার্যের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, একটু কষ্টের সঙ্গে হাসল। মাথা নেড়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল ঃ আচার্য আমাকে দিয়ে এত বড় কাজ হবে? আমি যে সামান্য মানুষ। মানুষকে আহ্বান করার শক্তি কোথায় আমার?

বিশ্বরূপের অসহায় মুখখানার দিকে নিষ্পলক নেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চুপ করে ভাবল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল বিশ্বরূপ তোমার সারা দেহে ভক্তিরসের লাবণ্য টলটল করছে। সিদ্ধসাধকের অপূর্ব লক্ষণ সমূহ তোমার চোখেমুখে। চারু দর্শন, গৌরতনু তরুণ ভক্ত সাধককে দর্শনমাত্র ভক্তের প্রাণ আকুল হবে। তোমার ভেতর লুকনো বিদ্যুৎশক্তির খবর তুমি জান না। তোমার স্বরূপ অবহিত নও বলেই এই দ্বিধা তোমাকে সংসারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। তুমি নামমন্ত্রের মহাচারণ। এই নাম প্রচারের ব্রত তুমি একান্তভাবে গ্রহণ কর।

একটা বিদ্যুৎস্পর্শ করে গেল বিশ্বরূপকে। তার বুক কাঁপছিল। মুখে চোখে অদ্বৈতাচার্যের এক অদ্ভুত অপার্থিবতা ভাব নেমে এল। চোখ দুটিতে তার গভীর সম্মোহন। বিশ্বরূপ কেমন যেন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ দুটি চোখ পেতে রাখল অদ্বৈতের মুখের উপর। একটু সময় নিয়ে বলল ঃ আচার্য আমার বুকের গভীরতম প্রদেশে আধ্যাত্মিক সুখের এক অদ্ভুত অনুভূতিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ঈশ্বর চিন্তা, কৃষ্ণ নাম আমার হৃদয়গুহায় চাঁদের নরম আলোর মত পবিত্রতায় ছড়িয়ে পড়ে। ভক্তিতে নুয়ে পড়ে অন্তর। আমার আর কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু মোহের কাছ থেকে মুক্তি চাইতে গিয়ে এক অদৃশ্য মায়ার বন্ধনে শুধু জড়িয়ে যাচ্ছি। এই মায়া মোহ ভালবাসা আমার জীবনে অশ্বত্থগাছের মত শিকড় গেড়ে বসেছে। এই গাছটাকে কেটে

না ফেললে মুক্ত হতে পারছি না। মুক্তি সহজে 'আসে না বোধ হয়। মায়া মোহ মানুষের জন্মগত অভিশাপ। কিছুতে কাটতে চায় না। সেই গন্ধমাদন উৎপাটন না হওয়া অবধি মুক্তি সুখের বিশল্যকরণী পাওয়া অসম্ভব। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধন হল নিমাই। মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ, সেই পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে সে।

দাদা বাড়ি যাবি না? নিমাই-এর আচমকা ডাকে চমকে উঠল বিশ্বরূপ। একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতা থেকে স্বাভাবিকতায় ফিরল।

মাথার উপর ফাল্গুনের আকাশ। তারায় তারায় দীপ্ত। আকাশ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। পূর্বাকাশে সিংহরাশির উত্তর ফাল্গুনী, পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র। পশ্চিমে কর্কটরাত্রির পুষ্যা। মধ্যগগনে মিথুনরাশি আর কালপুরুষ। সমস্ত আকাশকে নরম উজ্জ্বলতায় ভরে দিয়েছে কত অসংখ্য নামী ও অনামী তারা। মায়াবী চোখে তাকিয়ে আছে লুব্ধক আর অগস্ত্য। তাদের উত্তরে ব্রহ্মহৃদয়।

দীর্ঘ একটা সময় বিশ্বরূপ চেতনাহীনতার মধ্যে কাটিয়ে ক্লান্তি অনুভব করল। ধূপছায়ার মত অন্ধকারের মধ্যে নিমাই তার বড় বড় দুই চোখে দেখতে পাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি স্থির নয়, স্বাভাবিক নয়। সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অস্ফুটস্বরে ডাকল: নিমাই! এখনি উঠবি ভাই? সময়টা গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দিলি। পাছে একাগ্রতা ভেঙে যায়, তাই ডাকতে পারিনি তোকে। অত তন্ময় হয়ে কি দেখছিলি নদীতে?

বিশ্বরূপের চোখে চোখ রেখে নিমাই বলল: আমার দেখাটা কোন ব্যাপার নয়, তুমি কি বলছিলে বল?

হাসি হাসি মুখ করে বিশ্বরূপ বলল: তুমি কি চিন্তা করছিলে বল।

আমি কোন চিন্তাই করিনি। চুপ করে বসে থাকতে আমার ভাললাগে। বিশেষ করে গঙ্গার ধারে বসলে মা'কে মনে পড়ে। আমার কল্পনায় মা আর গঙ্গা এক হয়ে যায়। গোটা গঙ্গা নদীটা আমার মা হয়ে যায়। স্নানের সময় মায়ের মতই কত দুরন্তপনা আর ধকল তাকে সহ্য করতে হয় প্রতিদিন। ঢেউগুলো আমার খেলার সাথী হয়ে উঠে। দুরন্ত খরস্রোতা এই গঙ্গায় নির্ভয়ে আর নিশ্চিন্তে এপার ওপার করতে আমার একটুও ভয় করে না। মনে হয় আমি মা'র কোলেই আছি।

অবাক দুই চোখে বিশ্বরূপ নিমাই-এর দিকে তাকাল। বিস্ময়ের ঘোর

কাটতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। তারপর অভিভূত গলায় আচ্ছন্ন স্বরে বলল: নিমাই, নদী জল, মাটি তোর চেতনায় যখন মা হয়ে উঠেছে তখন মাটির বোবা কান্না, বাতাসের হাহাকার অদ্বৈত আচার্যের মত তুইও সত্তার ভেতর অনুভব করতে পারবি। জানিস নিমাই, আচার্যের চেতনায় দেশ মাটি নয়, কোন ভূখণ্ডও নয়—সাক্ষাৎ জননী। তোর সঙ্গে আচার্যের এই অনুভূতিগত মিল দেখে বড স্বস্তি অনুভব করছি। আচার্য প্রতিদিন যার আবির্ভাবের জন্যে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানায় সে যে আমার ছোট ভাই হয়ে এই ধরাধামে এসেছে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। এবার বড় স্বস্তিতেই যেতে পারব।

নিমাই-এর আশ্চর্য হওয়ার পালা। সে দুই চোখ বিস্ফারিত করে বলল: দাদা, কোন কথাই আমার মাথায় ঢুকছে না। একটু স্পষ্ট করে বল।

উৎফুল্ল হয়ে বিশ্বরূপ বলল: আজ আমার বড় আনন্দের দিন। যে কাজ আমাকে ভরসা করে আচার্য পেল না, সে কাজের দায়িত্ব আমি তোকে দিলাম ভাই। এখন আমার ছুটি। আমাব সবচেয়ে বড় অক্ষমতা আর ব্যর্থতার জ্বালা থেকে আমি মুক্ত হলাম।

বিশ্বরূপের কথা শুনে নিমাই ভীষণ চমকে গেল। এ সব কথাবার্তা এমন গভীর আর জটিল যে নিমাইর বোধগম্য হল না। বোবার মত মুগ্ধ চমক নিয়ে বিশ্বরূপের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল: তোমার কি হয়েছে বলত? ছুটি, মুক্তি এ সব কথা বলছ কেন?

বিশ্বরূপ জবাব দেবার জন্য যেন তৈরী হয়েছিল। নিমাই-এর প্রশ্নে তার অনুভূতি, শরীরের সব পেশী টানটান হয়ে উঠল। বুকের অভ্যন্তর থেকে কথাগুলো দ্রুততার সঙ্গে উৎসারিত হল। নিমাই, আমি সন্ন্যাস নেব।—সত্য যা, তা এমনি অমোঘভাবেই হঠাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

বিশ্বরূপের বাক্যে শান্ত নিথর শুদ্ধতাও কেঁপে উঠল। নিমাই-এর দুই চোখে কেমন একটা নিবিড় ব্যথা ফুটে উঠল। ভুরু কুঁচকে গেল। অবদমিত স্বরে বলল: তুমি সন্ন্যাসী হবে। জীবনে অনেক ব্রত উপবাস করে তোকে মা পেয়েছে।

বিশ্বরূপ একটু দিশেহারা বোধ করল। কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে কয়েকটি মুহূর্ত কাটল। নিমাই-এর থুতনিটা একটু নড়িয়ে দিয়ে বলল: হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হব। সন্ন্যাসের মধ্য দিয়ে বিশ্বভুবনের সঙ্গে আমার

অন্তর্লোকের ভুবনকে নতুন করে আবিষ্কার করব। বাকী জীবনটা বাঁচার মত বাঁচতে পারব তা-হলে।

নিমাই খুব করুণ চোখে বিশ্বরূপের দিকে চেয়ে রইল। অস্থিরভাবে নিজের মাথায় দুটো টোকা দিয়ে বলল ঃ তুমি আমাদের সকলের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে ?

বিশ্বরূপ চমকাল। কেমন একটু ম্লান দেখাল তাকে। বিমর্ষ গলায় বলল ঃ না, মানুষ তো পালিয়ে রেহাই পায় না। পালিয়ে যাওয়া মানেই তো থেমে যাওয়া। থামার জন্যে তো সন্ন্যাস নেয়নি বুদ্ধদেব। জীবনের যদি কোনও একটি মানে থাকে সে হলো অনন্ত চলা। চলতে চলতে অনন্তে গিয়ে পরিপূর্ণতা পায়। এই পরিপূর্ণতা পাওয়াটাই আসল পাওয়া। রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হল। রাজার ঐশ্বর্য হারিয়ে সে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য পেল। একেই বলে সত্যিকারের পাওয়া। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ 'আচাবঙ্গ সূত্র' গীতার সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বাতিল করে দিয়ে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্যে সন্ন্যাস হতে বলেছে। সন্ন্যাস নিয়ে ধর্ম-শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করা কর্তব্য বলেছে।

নিমাই হতভম্বের মত তার মুখের দিকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ক্লান্তস্বরে বলল ঃ দাদা তোমার জটিল দুর্বোধ্য কথাগুলো হেঁয়ালীর মত। এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।

বেশ একটু আশাহত হল বিশ্বরূপ। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বলল ঃ এক গভীরতর সংকটের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। সেন রাজাদের পতনের পর থেকে শুরু হয়েছে হিন্দুদের দুর্দিন। বাঙলার শাসনকর্তা এখন হুসেনশাহ। হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করতে যেমন সুলতান দক্ষ, হিন্দুর হিন্দুয়ানি নষ্ট করতে তেমনি পটু! সুলতান চান এই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ শুধু তার নয় সমগ্র মুসলমানের একটা নিজস্ব বাসভূমি হোক। এজন্যে অচিরেই প্রয়োজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী একপৃথক মানবগোষ্ঠীর। জন্মহারের সংখ্যাবাড়িয়ে রাতারাতি করা কখন সম্ভব ছিল না। তাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি নিল সুলতান। তার চোখ পড়ল দুর্বল, দুস্থ, অসহায় অভাবী মানবকুলের উপর। সমাজে তারা অচ্ছ্যুৎ, পতিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত। তাদের লোকবল, ধনবল নেই। সমাজের তারা নামহীন গোত্রহীন। কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুর উপর তাদের ক্রোধ, ক্ষোভ

পুঞ্জীভূত। সুলতান তার সহজাত বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল, এদের মুসলমান ধর্মের অনুকূলে টানা কঠিন কিছু নয়। সুলতানের অনুমান ছিল নির্ভুল। এরা মুসলমান হয়ে প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী হল। সুলতান আত্মবিস্তারের পথের কাঁটা, কাঁটা দিয়ে নির্মূল করার যে কূটকৌশল নিয়েছিল তা সফল হল। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ভীরু হিন্দুর দল এই ঘটনার নীরব দর্শক হয়ে থাকল। তাদের নীরবতা, ঔদাসীন্য এবং ভীরুতার নিজ ভূমিতে হিন্দুরাই আজ পরবাসী। সুলতানের আগ্রাসী নীতি হিন্দুর উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। তবু উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নির্বিকার আত্মসুখী এবং উদাসীন। নিদ্রিত হিন্দুর অন্তরে ঘুম ভাঙতে অদ্বৈত আচার্য দিনরাত তাদের কর্ণকুহরে নামকীর্তনের সুধারস ঢেলে দিচ্ছেন। কৃষ্ণের নাম উচ্চারণে সব ভয় দূর হয়। সাম্য, সৌভ্রাত্রবোধ সৃষ্টি হয়। বৈষম্য দূর হয়। সকল বর্ণের মানুষকে এক করে। কৃষ্ণ জাতিভেদ, বর্ণভেদ জানেনা। কৃষ্ণ সমদৃষ্টি সম্পন্ন জাতীয় নেতা। মানব সেবাই ছিল তার পরম ধর্ম। সেবাধর্মে দীক্ষিত হলে মানুষের শুভবুদ্ধি হবে। তার ভেতর সমদর্শীর ভাব জাগবে। বিভেদ বিদ্বেষ ঘৃণা, হলে হৃদয়ে প্রেম জাগবে। প্রেমে মানুষ আপন হবে ধর্মে সুন্দর হবে তাই দিনরাত্রি এই কৃষ্ণের নামগান করে অদ্বৈতাচার্য মানুষকে মাতিয়ে তুলতে চাইছেন। কিন্তু মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেয়ার সব চেষ্টা, সব উদ্যম, সব ত্যাগ, সব অধ্যবসায় তাঁর ব্যর্থ হল। হিন্দুরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রইল। মানুষের অন্তর বাইরে নাড়া দিতে আমিও পারলাম কৈ। তাই, এই সমাজ, সংসারের মধ্যে বাস করার আমার আর কোন আকর্ষণ নেই। একদিন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বোধ হয় এরকম একটা হতাশা আর অভিমান নিয়ে রাজগৃহ ত্যাগ করেছিল। মায়ামুক্ত সন্ন্যাসী হয়েই তিনি মানুষকে চিরকাঙ্ক্ষিত মুক্তির সন্ধান দিলেন। সংসারের মধ্যে বাস করে আমিও বোধ হয় সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পাচ্ছি না। অথচ কত আশা করে,কত বিশ্বাস নিয়ে আচার্য আমাকে মানব পরিত্রাতার স্বপ্ন দেখেছিল। ব্যর্থতার আত্মগ্লানিতে আমার মন পুড়ছে অহরহ। তাই আচার্য নির্দেশিত পথেই আমি মানব মুক্তির সেই পরম সত্যকে অন্বেষণ করব। নির্লোভ সন্ন্যাসী ছাড়া সেই পথের সন্ধান কেউ পায় না। তথাগতকেই আমি অনুসরণ করব। সন্ন্যাসী হলেই মানুষের সীমানায় নেমে আসা সহজ হয়। সন্ন্যাসীর কোন অহং নেই, অভিমান নেই, রাগ বিদ্বেষ নেই,

সকলের শুভ ও কল্যাণ কামনাই তার ধর্ম। তাই দুঃখী, দুর্গত, আতুর, সুখী ভোগী সব মানুষই সন্ন্যাসীর কাছে নিজেকে উন্মোচিত করে। সন্ন্যাসীই পারে তার দুঃখ কষ্ট ও বেদনার প্রতিকার করতে, তার শান্তি ও সুখের পথ দেখাতে। তাই সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব সত্যের সন্ধান দেয়া। সন্ন্যাসী হয়ে আমি সেই পথের সন্ধান করব।

নিমাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। চোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এল তার। বিশ্বরূপের শেষ কথাটা শুনে তার বুকের ভেতরটা আরো একবার চমকে উঠল যেন একটু। অগ্রজের আকুল করা কথার প্রত্যুত্তরে কি বলবে ভেবে পেলনা। স্তব্ধ দুই চোখে তার অসহায় আর্ত্তি। বুকের ভেতরটা তার কেমন করছিল। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটল। তারপর খুব গম্ভীর গলায় বলল: দাদা, সংসারে তোমার আমার জীবনের যাত্রাপথ অনেকগুলি ভাই বোনেব মৃত্যু দিয়ে অভিষিক্ত। তার পরিণতি যদি এইভাবে শেষ হয় আপাতত তাহলে বাবা-মা খুব দুঃখ পাবে, তাঁদের খুব কষ্ট হবে। বাবার নয়নমনি তুমি! তুমি গেলে বাবার প্রাণে ভীষণ লাগবে। সকলে সংসারে নিজেকে শুধু মানিয়ে নেয়। বাবা-মাব মুখ চেয়ে তুমিও না হয় একটু ত্যাগ স্বীকার করলে।

বিশ্বরূপ হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল। নিমাইয়ের বিষণ্ণ গম্ভীর স্তব্ধ দুই চোখের উপর নিজের নেত্রদ্বয় স্থাপন করে মৃদু স্বরে বলল: আমি এসব ভাবিনি তা নয়। আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে। তাঁদের ছেড়ে থাকতে আমারও ভীষণ কষ্ট হবে। কিন্তু মহৎ আদর্শের জন্যে বৃহৎ ত্যাগ দরকার। বড় ত্যাগ ছাড়া বড কিছু পাওয়া যায় না। সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছি তখন তার আর নড়চড় হবে না।

নিমাইর বুকের ভেতর ঝড়ের শব্দ। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নীরবতা। কিন্তু কিছুই দেখছিল না সে। একটা দারুণ কষ্টে হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে লাগল। কালো দুই চোখে সহসা প্রসন্ন কৌতুকে ঝলকে উঠল যদিও তা ব্যাথার আবেগে কাতর হয়ে ফুটল। নিমাইয়ের দৃষ্টির রূপ বদলাল। অধরে টেপা হাসি বিস্তৃত হল। বলল: শীঘ্রী আমার একটা লাল টকটকে, মিষ্টি বৌঠান আসছে। মা বলে, মা-লক্ষ্মী এলে বিশ্বরূপের সব খেপামি কেটে যাবে।

বিশ্বরূপ একটু গম্ভীর হল। একটা ভারী নিঃশ্বাস পড়ল। কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বলল: পৃথিবীতে যারা ধরা বাঁধা পথ ছেড়ে হঠাৎ

অন্যপথ ধরে, লোকে তাদের খেপা বলে। নিজের স্বার্থপরতার কথা তারা ভাবে না বলেই লোকের চোখে তারা খেপা। নিজের সুখটাকে বড় করে দেখে পৃথিবীর আর সকলের দুঃখ যন্ত্রনা আর্ত্তি যারা ভুলে থাকে তাদের সকলের মধ্যে কেমন একটা নিষ্ঠুরতা আর আত্মদৈন্যের গ্লানি আছে। সেই আত্মগ্লানিতে আমার চিত্ত পীড়িত। অদ্বৈতাচার্যের কথাগুলো আমার জীবনের ধ্যানমন্ত্র হয়ে উঠল। সত্যিই'ত মানুষের কাজে যদি না লাগলাম, তবে মানুষ হয়ে কেন জন্মালাম; বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে যেমন একজন মানুষ, তেমনি এক একটি মানুষ নিয়ে দেশ, ভূগোল আর ইতিহাস। যাকে ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয় তাকে কখনও বা মধুর, আবার কখনও বা নিষ্ঠুর হতে হয়। মুখ চাওয়া চাইয়ি করতে গেলে তার চলে না। তাকে একটু নিষ্ঠুর নিরাসক্ত ও নির্বিকার হতেই হবে।

নিমাই মুগ্ধ চমক নিয়ে বিশ্বরূপকে দেখতে লাগল। দু'চোখে বিস্ময়ের দীপ জ্বেলে বিমর্ষ গলায় নিমাই আবেগ গাঢ় স্বরে বলল : দাদা আমরা সবাই পেয়ে হারাই। দুঃখ কষ্ট যা পাবার আমরা নিজেরাই নিজেদের দিই। আর সেজন্য একটা অজুহাত তৈরী করি। এই-ই হয়। সংসার বড় মায়ার জায়গা। আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখে তার বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছিল। সহসা তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। এক অসহায় কান্নার দুরন্ত বেগ দমন করতেই যেন সে ছুটে গেল বাড়ীর দিকে।

খুব প্রত্যুষে পাখির ডাকে নিমাইয়ের ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে সে প্রথমে বিশ্বরূপকে খুঁজল। শয্যা শূন্য। এদিক সেদিক উঁকি দিল, কিন্তু কোথাও তাকে দেখল না। দ্বার খোলা। বুকের ভেতরটা তার হাহাকার করে উঠল, চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার এই শূন্যতা যে কতখানি এই মুহূর্তে নিমাই টের পেল। নিমাইয়ের বুকের মধ্যে ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠল একটা ব্যথা। ব্যথায় কয়েকমুহূর্ত নিশ্চল হয়ে কাটল তার। তারপরেই আর কালহরণ না করে গঙ্গার ঘাটে ছুটল।

দৌড়, দৌড়, দৌড়। কানের দুপাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরোচ্ছে। মনে হল বাতাস যেন বিশ্বরূপের গলায় বলছে, নিমাই এমন করে ছুটিস না ভাই। বিধাতার কাজের যোগ্য হতে হয় নব নব দুঃখ বরণের কঠিন মূল্য দিয়ে। মহাপৃথিবীর বিশাল প্রাঙ্গনে যার নিমন্ত্রণ ছোট গৃহকোণ কখনও তার জন্যে নয়।

বিধাতা তার নিজের কাজের জন্যে কিছু কিছু মানুষকে ছন্নছাড়া করে। রাজার ঐশ্বর্য, সুখ, বিলাস, আনন্দ, সিংহাসন, মায়া, মোহ, মমতা দিয়ে সিদ্ধার্থকে শক্ত করে বেঁধেছিল, তবু তাকে ধরে রাখতে পারল না পিতা শুদ্ধোধন। অনেক দুঃখের মূল্যে সার্থক হয় মহৎকার্য। বিশাল পৃথিবীর অবারিত প্রান্তর, অরণ্য, নদী, পর্বত, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—তোর সাধ্য কি আমাকে দৌড়ে ধরার।

নিমাই ঐ কাকভোরে গঙ্গার ঘাটে অদ্বৈতাচার্যকে ছাড়া আর কাউকে দেখল না। অদ্বৈতাচার্য প্রতিদিনের মত আজও এক কোমড় জলে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে তদ্গতচিত্তে জলদগম্ভীর স্বরে সূর্যস্তব পাঠ করছিল। প্রিয়শিষ্য বিশ্বরূপ আজ তার সঙ্গী না হওয়ার জন্যে কোন চিত্ত চাঞ্চল্য নেই। তিনি ধীর স্থির শান্ত নিরুদ্বিগ্ন।

উন্মাদ বাতাস ছুটে এসে নিমাইয়ের চুলগুলো এলেমেলো করে দিল। নিমাইয়ের দিশেহারা ভাব। যে প্রত্যাশাটা গঙ্গার ঘাটের সীমায় আবদ্ধ ছিল, দমকা বাতাসে কি করে যেন তার সব আশাটুকু উড়িয়ে নিয়ে গেল। দুঃসহ দুঃখ মনে অবাধে বিস্তার লাভ করল। এক অসহায় কান্না তার বুক ঠেলে উঠে এল। চোখের পাতা ভিজে গেল।

গঙ্গার ঘাটে কয়েকমুহূর্ত নিশ্চল হয়ে কাটল তার। তারপরেই সে দৌড়তে লাগল। আর্তস্বরে কাঁপাগলায় প্রাণপণে চিৎকার করে ডাকল: দাদা! দাদা! দাদা! তার সেই আকুল করা ডাকে বাতাস উতলা হল, নদী চঞ্চল হল। প্রতিধ্বনি যেন নিমাইয়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বহুদূর থেকে পুনর্বার উচ্চারণ করল: দা-আ-দা-আ-আ। দা-আ-দা-আ-আ-আ!

নিমাই কতপথ কত গ্রাম কত প্রান্তর পার হয়ে গেল। তবু বিশ্বরূপের দেখা পেল না। অবশেষে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গৃহে ফিরল। একটা দারুণ কষ্টে ও দুঃখে তার হৃদয় ব্যথিত ও মথিত হতে লাগল। প্রভাতের নিস্তব্ধ গ্রাম, নিস্পন্দ বনজঙ্গলের গাছপালা, বৃক্ষ যেন তার দুঃখে শোকস্তব্ধ। আত্মীয়, বান্ধব প্রতিবেশীর মত সসঙ্কোচে তাদের সমবেদনা জানাতে পথের ধারে সারি সারি নিস্পন্দ হয়ে তারা দাঁড়িয়ে। কেবল, গঙ্গাই নির্বিকার আর উদাসীন। তার অশান্তিও নেই, দুঃখও নেই। দুর্ভাবনাও নেই। কারো জন্যে কষ্ট নেই। সমবেদনা প্রকাশের গরজও নেই। অফুরন্ত চলার আনন্দে মত্ত হয়ে গর্বিত নদীর মত কলহাস্যে চলেছে

মহাসমুদ্রের অভিসারে। পথে হাঁটতে হাঁটতে নিমাই আরো দেখল সচল প্রাণীকুল, কীটপতঙ্গ, গরু ছাগল, কুকুর মার্জার প্রভৃতি অবলা প্রাণীদের জীবনে কোন দ্বন্দ্ব কিংবা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা নেই। দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, বেদনা শুধু মানুষের জন্যে। প্রিয়জনকে হারানো এবং তার বিরহের জন্য মানুষ কত বেদনা দুঃখ ও কষ্ট পায়, কত অশান্তি আর যন্ত্রণাভোগ করে।

সকালের রোদ তেতে উঠলে নিমাই বাড়ী ফিরল। বাবা মার কথা ভেবে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা অসহনীয় দুঃখ বোধ নিবিড় বেদনায় মিশেছিল। কিছুতেই নিজেকে একটা হারানোর দুঃসহ কষ্ট আর দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারছিল না। বাবা-মা যদি প্রশ্ন করে—বিশ্বরূপ কোথায়?—কি উত্তর সে দেবে? বুকটা ব্যথায় টনটন করতে লাগল। দাঁত টিপে সে অবরুদ্ধ কান্নার কামড়ে ধরল।

পা টিপে টিপে আঙিনায় প্রবেশ করল নিমাই। আঙিনায় পা দিয়েই বুঝতে পারল। জননী শচী এবং পিতা জগন্নাথ মিশ্র এখনও বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের খবর জানে না। বিশ্বরূপ সত্যিই তাদেব ছেড়ে যেতে পারে এ তারা স্বপ্নেও কল্পনা করেনা। তাই পরম নিশ্চিন্তে এবং নিরুদ্বিগ্নে প্রাত্যহিক গৃহকর্মে জননী ব্যাপৃত।

সদর দরজার মুখে নিমাই সোজা টান টান হয়ে দাঁড়াল। মুখে গভীর চিন্তা ও শোক থমকে আছে। পরণে একটা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি ছাড়া পায়ে কিছু নেই। এই পোষাক এবং শোকে থম থমে মুখখানা যে তার মুখের রঙ ও আকৃতি বদলে দিয়েছে এটা বালক হলেও নিমাই অন্তরের মধ্যে টের পাচ্ছিল। এই অবস্থায় জননীর সামনে কেমন করে দাঁড়াবে, কি উত্তর দেবে ভেবে স্থির করতে পারল না। ভিতরকার একটা দুরন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।

আঙিনার মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ। শচীমাতা গলায় আঁচল জড়িয়ে দুহাত বুকের কাছে জোর করে একমনে তুলসী মাহাত্ম্য মুখস্থের মত আওড়ে যাচ্ছিল। একবার নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। বিরক্তিতে? অভিমানে? কে জানে? কিন্তু এই তাকানোটা তীরের মত বিঁধল নিমাইয়ের শরীরে।

পাঠ শেষ হলে শচী ঘট ভর্তি জল তুলসীর মূলে একটু একটু করে ঢালতে লাগল। মৃতের চোখের মত একজোড়া স্থির নিশ্চল চোখ চেয়ে

ছিল শচীর দিকে। সে চোখ নিমাইয়ের। শচী তাকে লক্ষ্য করল না। শচীর দুই চোখ পতনমুখী জলের উপর স্থির। বলল ঃ কত বেলা হল বলত ? তবু দু'ভাইয়ের কোন হুঁশ নেই। সেই কোন সাতসকালে সূর্যি উঠার আগে গঙ্গায় গেছিস আর এখন ফেরার সময় হল ? বাড়ীতে আমরা যে দুটি প্রাণী আছি, আমাদের যে উদ্বেগ দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা আছে সেকথাটা গঙ্গায় নামলে আর মনে থাকে না। গঙ্গা যদি মা'র থেকে বেশি প্রিয় হয় তাহলে সেখানেই কুঁড়ে বেঁধে বাস কর। বাড়ীতে আসারও দরকার হবে না। গঙ্গায় সাঁতার দেবার অনেক সময় পাবি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ বিশ্বরূপ কোথায় ? তার কি বাড়ী ফেরার এখনও সময় হয়নি ? তাকে খুঁজতে তোর বাবা গেছে আবার অদ্বৈতাচার্যের টোলে।

নিমাইয়ের বুকের ভেতর একটা বাঁধ কেটে যাচ্ছিল। বুকে ব্যথা করছিল। বুকের ভেতর থেকে জমা করা কান্নাটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে সহসা বেড়িয়ে এল ঃ মা ! বিপুল পৃথিবীর আরো নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার আর্ত্তস্বর সব কিছু ছাপিয়ে ঝংকারে বাজল শচীর বুকে।

শচী চমকে উঠল। একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল তাকে। হাতের মুঠোটা শিথিল হয়ে জলশূন্য পিতলের ঘটটা পড়ে গেল। দু'চোখ তার বিস্ময়ে বিস্ফারিত। বুকের ভেতর তার ধুকপুক শব্দ। শচী কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমাইয়ের দিকে। চুপ করে বুকের কাঁপুনি ভোগ করতে লাগল, তবু সাহস করে বিশ্বরূপের কথাটা নিমাইকে জিগ্যেস করতে পারল না। ভাসা ভাসা দুই চোখ তার অসহনীয় নিবিড় বেদনায় আর্ত্ত। একটা বোবা জিজ্ঞাসা যে তার বুকের খাঁচায় আটকে আছে অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিমাই তাকে টের পেল। তার নিজের ভেতরেও এক প্রলয় বাতাসে ভেঙে পড়ছে প্রতিরোধের দ্বার। কি করবে নিমাই ? তার ভেতরকার বুদ্ধিমান বিবেচক মাতৃভক্ত বালক মনটি হঠাৎ এক যুক্তিশীল আচরণ করল। বলল ঃ মা দাদা আমাদের মতন সাধারণ মানুষ নয়। সে অনেক বড় একটা কিছুকে অনুভব করে। আমাকে সব সময় বলত এই অভাগা বাংলাদেশের জন্যে তার কিছু কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু এই নবদ্বীপ ধামে বসে কখনই করা তা সম্ভব নয়। তাই, বৃহৎ এক ভারত ভূমি দেখার জন্যে তোমাদের কাউকে না বলে চলে গেল। অনুমতিতে যদি বাধা হয়, তাই অনুমতি নিল না। মা তুমি অমন করে কেঁদ না। কাঁদতে নেই। দাদার তাতে অকল্যাণ হবে। নিজের দেশকে

নিয়ে তার অনেক আকাংখা আর স্বপ্ন। দাদাকে ঈশ্বর এই সামান্য সংসারে বেঁধে রাখার জন্যে পাঠায়নি। তুমিও নিজের অজান্তে সাধ করে তার নাম রেখেছিলে বিশ্বরূপ। তোমার সেই বিশ্বরূপ, আজ যথাযথ বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। এর চেয়ে আনন্দের খবর কি হয়? এতবড় আনন্দের সংবাদ শুনেও তুমি কাঁদবে? কান্না এখন তোমাকে মানায় না মা। তুমিত আর সাধারণ জননী নও। তুমি বিশ্বরূপের মা। বিশ্বের জননী।

নিমাইর কথাশুনে শচীর কান্না বাঁধা মানল না। দু'চোখের কোণ ছাপিয়ে জলের ধারা নামল। কান্না চাপতে গিয়ে হিক্কার মত গলা থেকে একটা শব্দ বার হল। হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। নিমাই অসহায়ের মত জননীর কান্না দেখতে লাগল। তারও চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ধরা গলায় গম্ভীর স্বরে বলল: মা আমরা যা যা করছি তার কোন মূল্য নেই। এই দুঃখ বেদনা; কষ্টে শুধু শক্তি ক্ষয় হয়। এটা ভালবাসা নয়। স্নেহ নয়? এটা মায়েদের পাগলামি। দাদা বলে, মা হয়েছে বলেই সন্তানের উপর তার ষোলো আনা অধিকার? তাকে দেশের দরকার নেই? দশের প্রয়োজন নেই? ছেলে বুকে আগলে বসে থাকাটা আমাদের মায়ের রীতি। ছেলেকে তাদের পুতুল ভাবে। স্নেহ মায়া মমতার নামে মায়েরা সন্তানের শত্রুতা করে। তাকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে দেয় না।

বালক নিমাইর মুখে কথাটা শুনে শচী ভীষণভাবে চমকে উঠল। যেন একজন বড় মানুষ কথাটা বলছে। কানে কথাটা ঢুকল কিন্তু মস্তিষ্কে কোন ছাপ ফেলল না। নিমাইকে বুকের আরো কাছে টেনে এনে তার মুখের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল শচী। নিমাইও ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা টের পাচ্ছিল। মায়ের সঙ্গে সেও হাউ হাউ করে কাঁদল। দুটি রক্তস্রোত যেন পরস্পরকে চোখের জলে সমবেদনা জানাতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সদর দরজায় গলা খাঁকারির শব্দ পাওয়া গেল। শব্দটা খুবই চেনা। কিন্তু তাকে দেখামাত্র শচীর বুক ঠেলে সজোরে কান্না বেরিয়ে এল। ও গো, আমার বিশ্বরূপকে এনে দাও। বাছা আমার অভিমান নিয়ে বিবাগী হয়ে চলে গেছে।

সদর দরজায় চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ মিশ্র। প্রস্তরীভূতপ্রায় তার অবস্থা। অঙ্গনে পা দেয়ার শক্তি নেই। শরীর অবশ। মন অনুভূতিশূন্য। জগন্নাথ মিশ্র কিছুক্ষণ বিবশ হয়ে চেয়ে রইল। আপন মনে কষ্টে কয়েকবার

মাথা নাড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল খুব ধীরে। তারপর ভেজা গলায় বলল : আমি জানতাম, ও যাবে। তবে, এত তাড়াতাড়ি করবে সেটাই বুঝতে পারিনি।

জগন্নাথ মিশ্র চোখ বুজে শরীরের গভীরে অবসাদ টের পাচ্ছিল। আপনা হতে দু'চোখের পাতা বুজে এল। চোখ বুজতেই বিশ্বরূপের দেবদূতের মতন পবিত্র মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল সামনে। বুকটা থর থর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আর বোজা দুই চোখের কোল টস্‌টস্‌ হয়ে উঠল জলে। আত্মবিস্মৃতের মত দু'খানা হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলল : বিশ্বরূপ আয় বাবা, আমার শূন্য বুকে আয়।

প্রাঙ্গণ ভর্ত্তি পাড়া পড়শীর সবাই চাপা স্বরে নানা রকম কথা বলছিল। সকলের চোখে করুণা আর সহানুভূতির ভাব। একজন প্রবীণ ব্যক্তি জগন্নাথের ভাব বিহ্বলতাকে লক্ষ্য করে বলল : বিশ্বরূপের আর দোষ কি পণ্ডিত? ও'ত ছেলে মানুষ। ওই অদ্বৈতাচার্যই ওর মাথাটা খেয়েছে। নিজেও পাগল, অন্যকেও পাগল করছে।

জগন্নাথ মিশ্র সম্বিৎ পেয়ে ভীড়ের মধ্যে প্রবীণের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে করুণ মুখে মাথা নেড়ে বলল : ও আমার সন্তান, কিন্তু অন্য পরিমণ্ডল থেকে আসা। বড্ড অচেনা, বড্ড অন্য-রকম। অদ্বৈতাচার্যকে দোষী করলে অধর্ম হবে।

জগন্নাথ নিজের কষ্টটাকে সামলে নিয়ে খুব শান্তভাবে শচীর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল : কেঁদে আর কি করবে? অনেক অনু-ভূতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে মোহমুক্ত করার পেছনে বিশ্বরূপের কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে। আমাদের স্নেহ-মমতা দিয়ে তার স্বরূপকে বোঝার ক্ষমতা নেই বলে, মনে হচ্ছে, সে বড় নিষ্ঠুর, ভীষণ স্বার্থপর। আবেগ দিয়ে সব সময় সত্যকে বোঝা যায় না। ছেলে বড় হয়েছে। তার নিজস্ব মতামত, নিজস্ব চরিত্র তৈরী হয়েছে। আমি তুমি কি করতে পারি বল?

॥ দুই ॥

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের বেশ কিছু দিন পর জগন্নাথ মিশ্রের বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীতে অদ্বৈতাচার্য পদার্পণ করল। তাকে দেখে জগন্নাথের বহুকালের অশান্তি একটু শান্তি পেল। অদ্বৈতাচার্যকে নিয়ে তার নিজের সঙ্গে ঝগড়া চলছিল। দ্বন্দ্ব বিশ্বরূপকে নিয়ে। নিজের অজান্তে সেও আর পাঁচজনের মত বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের জন্য অদ্বৈতাচার্যকে দায়ী করল। বিশ্বাস যত দুর্বল হোক মনের অভ্যন্তরে তার শিকড় গেড়ে বসেছিল। অদ্বৈতাচার্যই দায়ী এই অভিযোগটা ভাললাগার এক অনুভূতিতে ঝংকৃত হত বুকে। নিজের এই ভাল লাগার কাছে সব যুক্তি তর্ক হার মেনে যেত। বুকের ভেতর থেকে উৎসারিত এই আবেগ দুরন্ত এবং দমনে অসহায়। কিন্তু এই অনুচিত মুগ্ধতার জন্য পরক্ষণেই যুক্তিশীল মন ক্ষত বিক্ষত হত। মস্তিষ্ক পাপে বিদ্ধ হত। নিজের ভেতরে গ্লানি অনুভব করত। তৎসত্ত্বেও শচীর মুখোমুখি হলে তার সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায়। সমবেদনার সমুদ্র উথলে উঠে বুকে।

অদ্বৈতাচার্যের দর্শনে জগন্নাথের বুকের মধ্যে এক শিহরিত আনন্দের ঢেউ দিয়ে গেল। মনেতে জমে উঠা ক্ষোভ, দুঃখ অভিমান ঝগড়া সব জল হয়ে গেল। অশান্ত হৃদয় যেন শান্ত হল। বুকটা হাল্কা লাগল। মনে হল, সে এক বিশাল মহীরূহের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে আছে। এক অপরূপ মুগ্ধতা নিয়ে জগন্নাথ অদ্বৈতাচার্যকে দেখতে লাগল।

অদ্বৈতাচার্যকে জগন্নাথ অনেকদিন ধরে দেখছে। কিন্তু আজকের দেখাটা একটু অন্যরকম। এরকম অদ্ভুত অনুভূতি তাকে দেখে আগে কখনও হয়নি। এ যেন নতুন চোখে দেখা। অদ্বৈতাচার্যের চেহারার মধ্যে ঋষিসুলভ এই উজ্জ্বলতার মধ্যে কোথাও যেন একটা অদ্ভুত মাধুর্য লুকনো আছে। আচার্যের চাহনি, স্মিত হাসি অদ্ভুত সুন্দর। শিশুর মত সহজ সরল দৃষ্টি। নিষ্পাপ মুখখানি প্রতিমার মত অপরূপ। কি গভীর শান্তি, আর পরিপূর্ণতায় ঢলঢলে। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতরে জগন্নাথ টের পেল তার

বুকের গভীরে সেই টাটানো ব্যথাটা আর নেই। বেশ আরাম লাগছে। স্বস্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে। জগন্নাথের মনে হল সাধু পুরুষের সান্নিধ্যই সুখের। রোগ, শোক, তাপ বেদনার নিরাময় হয়। সুন্দর হয় অনুভূতি। অদ্বৈতাচার্য না এলে এই অনুভূতির স্বাদ সে টের পেত না। সৌন্দর্যের মত শ্রদ্ধারও একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। একজন মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্গে তার শ্রদ্ধাবোধের বোধহয় এক ধরনের গভীর যোগাযোগ আছে। শ্রদ্ধাহীনতা মানেই মৃত্যু। শ্রদ্ধা জীবনীশক্তির এক অন্যতম লক্ষণ। একজন মানুষের শরীরে সুস্থতা এবং অন্তরের মুগ্ধতার পরিমাপ করা যায় তার শ্রদ্ধা-বোধ দিয়েই।

নিজের চিন্তায় জগন্নাথকে অন্যমনস্ক দেখাল। ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মত স্থির অপলক চোখে সে অদ্বৈতাচার্যের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখ টান টান করে অবাক স্বরে উচ্চারণ করল: পণ্ডিতপ্রবর অবশেষে তুমিও এলে? বল, কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ঈশ্বর এত বড় শাস্তি দিলে?

অদ্বৈতাচার্য সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল: জগন্নাথ তোমার এ কি চেহারা হয়েছে? ক'দিনেই তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। তোমার চোখে কালি পড়েছে, মণি দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। চাহনি অস্বাভাবিক। মুখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি। তোমাব অবস্থা দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। তোমার জন্যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। নিজের উপর এই অত্যাচার আর অবিচার করে তুমি কাকে শাস্তি দিচ্ছ? এই করলে কি ছেলে ফিরে পাবে?

জগন্নাথ অদ্বৈতাচার্যের প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারল না। কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে অদ্বৈতাচার্যের বুকের ভেতরটা সহজেই দেখতে পেল। এক মুহূর্ত চুপ করে জগন্নাথ ভার ভার গলায় বলল: সব বুঝি সব জানি। তবু এ অবোধ পিতৃহৃদয় কোন শাসন মানে না। বিশ্বরূপ আমার কত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। পিতা হয়ে আমি কেমন করে নিশ্চিন্ত সুখে দিন কাটাই? এই দৈহিক কষ্টটুকু করে তার শূন্য স্থানটি ভরিয়ে রাখি। এ যে আমার কতবড় সুখ তা তোমায় বোঝাতে পারব না। তবু আমার স্নেহ-মমতা কোন মূল্য দিল না বিশ্বরূপ। জীবন থেকে সব আনন্দ ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তার মনটা এমন পাষাণ করে গড়ল কে?

অদ্বৈতাচার্য কোন জবাব দিল না। গভীর সমবেদনায় আর্দ্র হল তার মন। জগন্নাথের মনের অবস্থাটা টের পেয়েই বোধ হয় তাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করার জন্যে উদাস গলায় বলল : প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে যে কত অনাবিষ্কৃত দেশ আছে মানুষ নিজেও বোধহয় সব খোঁজ রাখে না। বিজ্ঞানীর মত নিজেকে সে নিরন্তর অন্বেষণ করে চলেছে। মানুষের নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবণতার রহস্যময় আকর্ষণ এবং তাকে আবিষ্কার করার এক নাছোড় নেশায় সে যে কখন কি করে তা নিজেও জানতে পারে না। নিজের ইচ্ছার মধ্যে অসীম আনন্দে বেঁচে থাকার আকাংখাই মানুষের স্বধর্ম। প্রত্যেকেই তার নিজের ভেতর লুকনো মেরু জয়ের অভিযাত্রী। বিশ্বরূপও তার নিজের পথের নিঃসঙ্গ নিঃসহায় এক অভিযাত্রী। তার কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করছ কেন? বিশ্বরূপ তোমাকে শুধু আঘাত দিয়েছে আর আমাকে যে ফকির করেছে। আমার কত আশা কত স্বপ্ন সে চুরি করে নিয়ে গেছে জান? আমার বুকটা সে মরুভূমি করে দিয়েছে।

জগন্নাথ মিশ্রের মুখে সহসা কোন কথা জোগাল না। দুই চোখ তার জলে টস টস করছিল। স্থির চোখে সামনের দিকে চেয়ে আয়তক্ষেত্রের মত আঙিনা দেখছিল শূন্য চোখে। নাভিমূল থেকে উঠে আসা কান্নাকে দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট বজ্রের মত এঁটে থেকে ভিতরকার সব যন্ত্রণা শব্দকে আটকে রাখল। কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপর নীচু ও অদ্ভুত করুণ গলায় বলল : এক অচেনা, অজানা, অনিশ্চিত পথে এইভাবে চলে যাওয়ার জন্যেই মনটা কোন যুক্তি মানছে না।

অদ্বৈতাচার্য খুব মলিন একটু হেসে কয়েকবার মাথা নাড়ল। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : জগন্নাথ, বিশ্বরূপ তোমার পুত্র, আমার এক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র। তার এভাবে যাওয়াটা আমারও খুব লেগেছে। বিশ্বাস কর, তাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। সে শুধু দিগ্বিজয়ী মহা পণ্ডিত হবে না, তাকে দেশের ও দশের একজন করে তুলব। আজ বাঙালীর বড় দুর্দ্দশা। হিন্দু ধর্মের দুর্দ্দিন। সমাজ-সংসার ব্যাভিচারে পূর্ণ। আমাদের সমাজে, সংসারে, ধর্মে, কৃষ্টির উপর আঘাত এসে পড়েছে। ঘরে-বাইরে আমরা আক্রান্ত। সুলতানের হাতে হিন্দুর হিন্দুয়ানি বিপন্ন। পাষণ্ডেরা নারীর সম্ভ্রম কেড়ে নিচ্ছে। হিন্দুকে জোর করে ধর্মচ্যুত করছে। অপরদিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধরা ম্লেচ্ছাচারে সমাজ কলুষিত করে তুলছে। এই অপসংস্কৃতির হাত

থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষার এক মহান সংকল্পের বীজ আমি তার মধ্যে বপন করেছিলাম। কিন্তু আমার সব আশা আকাংখা ধুলিসাৎ করে দিয়ে সে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। তাই'ত বলছি জগন্নাথ, তুমি শুধু পুত্র হারিয়েছ, আমি হারিয়েছি একসঙ্গে সন্তান এবং মহানায়ককে।

জগন্নাথ গভীর এক নিঃশ্বাস ফেলল। চোখের উপর ভেসে উঠল বিশ্বরূপের ঢলঢলে মুখখানি। জানলার গরাদে মাকড়সা অদ্ভুত দ্রুততায় জাল বুনে চলেছে। দক্ষিণের হাওয়া বয়ে নিয়ে এল রাখালের আড়বাঁশির সুর। আঙিনায় পায়রারা গদ গদ স্বরে কি বলে যাচ্ছে? ভালবাসার কথা? মায়ার কথা? ভোগের? আনন্দের? বাঁচ এবং আনন্দ কর? দুঃখের কোন মানে নেই? জীবন মানে অনন্ত আনন্দ? কে জানে? পায়রারা সুখী প্রাণী। নির্বিকার এবং আত্মসুখী। উড়ে উড়ে বেড়ায়, রমণ করে, সন্তান পালন করে আর বুকুম বুকুম করে। এর বাইরেও যে একটা পৃথিবী আছে তার খোঁজ খোপের পায়রা জানে না। নির্জন দুপুরে পায়রার অবিশ্রাম বুকুম বুকুম ডাক জগন্নাথের চারদিকে নেমে আসে। তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। জগন্নাথের সহসা মনে হল, পায়রার জীবনের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু বিশ্বরূপ বাইরের দুনিয়ার লোক। কীই বা বয়স, তবু স্নেহের বন্ধন কেটে উধাও হয়ে বেরিয়ে পড়েছে কোন মহৎ কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায়।

জগন্নাথ বেশ কিছুক্ষণ অদ্বৈতাচার্যের সম্মুখে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ভেতরটা তার ব্যথিয়ে উঠল। ক্লান্ত শ্বাস ফেলে বলল: যা আশা করা যায়, যা ঘটা উচিত তার উল্টোটাই বাস্তবে ঘটে যায়। এর কারণ মানুষের জীবন এতই বিঘ্নসংকুল এবং পরিবেশের ভেতর সে এতই অসহায় যে সব কিছু উত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকাই কঠিন। মানুষের প্রত্যাশা তার কাঁধে বোঝার মত চাপে।

নিমাই এসব কথোপকথনের সময় এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সব কথাই মন দিয়ে শুনছিল। অদ্বৈতাচার্য কথার মধ্যে একবার আড়চোখে তার দিকে তাকাল। অদ্বৈতাচার্য এর আগেও নিমাইকে দেখেছে বহুবার। কিন্তু আজ যেন নিমাই তার মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করল। নিমাইর কমনীয় মুখশ্রী, নিষ্পাপ দেবশিশুর মতই পবিত্র আর ঢলঢল। মুখশ্রী বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল, ভারী সুন্দর মিষ্টি গড়ন। গৌর তনুতে জ্যোৎস্নার লাবণ্য। ভাসা ভাসা টানা দুই চোখে যুগান্তরের স্বপ্ন জড়ানো! চমকানো বিস্ময়ে

অদ্বৈতাচার্যের দুই চোখ তার চোখের উপর স্থির হয়ে রইল। বালকের চোখে তদ্‌গত দৃষ্টি যা সাধকদের থাকে। বুকের মধ্যে কেমন একটা চুম্বক আকর্ষণ টের পেল। সহসা এক অজানা স্পন্দনে তার হৃদয় মথিত হতে লাগল। একটা চোরা আনন্দের শিহরণ তাকে বার বার ছুঁয়ে গেল, যা দৈনন্দিন নয়, স্বাভাবিকও নয়। অপ্রত্যাশিত। বালকের সরল পবিত্র মুখের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বলল: বিশ্বম্ভব, তুমি কিছু বলবে মনে হচ্ছে?

নিমাই ঢোঁক গিলে অস্ফুট স্বরে বলল: আমি? আমি বলব?

নিশ্চয়ই বলবে। ছোটদের মতামতকে আমি বড়দের মতই মূল্য দিই। অনেক সময় ছোটরা বড়দের চেয়ে জটিল কথা সহজ করে বলতে পারে। বিশ্বরূপের মুখে তোমার অনেক গল্প শুনেছি।

অদ্বৈতাচার্যের প্রশ্নে নিমাই স্তম্ভিত হয়ে গেল! একটা শিহরণ আর ভয় খেলে গেল তার শরীরে। এমনভাবে যে তার মত কেউ জানতে পারে এটা ভাবতেই তার শরীর বার বাব পুলকিত হল। তাই কয়েকমুহূর্ত দিশেহারা হয়ে চেয়ে থাকল অদ্বৈতাচার্যের মায়াবী দৃষ্টির দিকে। নিমাই উজ্জ্বল মুখে বলল: আচার্য সব সময় দাদার কথা মনে পড়ে। দাদা বলত, সুখী সুন্দর এক সমাজ উপহার দেবার জন্যে রামচন্দ্র মায়ের মমতা, পিতার স্নেহ, ভ্রাতার অনুরোধ, প্রজাদের প্রার্থনা, সিংহাসনের আকর্ষণ ঐশ্বর্যের মোহ, ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিল। মাতার আকুল অনুনয়, পিতার শত অনুরোধেও বিচলিত হয়নি রামচন্দ্র। কোন কিছু তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারিনি। কর্তব্য বড় নিষ্ঠুব। দাদাব কথা হল; সত্যের জন্য মানুষকে অনেক ব্যক্তিগত দুঃখ যন্ত্রণা কষ্ট ভোগ করতে হয়। রামচন্দ্র অন্যকে কষ্ট দিয়েছে, নিজেও অনেক কষ্ট করছে এবং সয়েছে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থও রাজার ঐশ্বর্য ত্যাগ করে, বহু সংযম ও ক্লেশ স্বীকার করে মানুষকে সত্যের আলো এবং মুক্তির পথ দেখিয়েছে। বড় ত্যাগ মহৎ চিন্তা মনটাকে প্রসারিত করে দেয় বহুদূর পর্যন্ত। আমারও তাই মনে হয়।

অদ্বৈতাচার্যের দুই চোখে বিস্ময় ও মুগ্ধতা। স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বলল: বিশ্বম্ভর তুমি এই সব কথার অর্থ বুঝতে পার?

নিমাই বলল: আচার্য পাঠশালার বিদ্যে নিয়ে এই সব কঠিন কথার রহস্য ভেদ করতে পারি নে। দরকার আছে বলে মনে হয় না। ফুলের সৌন্দর্য যেমন নয়ন আকর্ষণ, মনকে প্রলুব্ধ করে তেমনি দাদার বাণী আমাকে মুগ্ধ করে

আকর্ষণ করে, হৃদয়কে দ্রব করে। আমার বুকের ভেতর কেমন একটা উথলে উঠার ভাব হয়।

* বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপের কথার মর্মার্থ তুমিই বুঝতে পেরেছ। তোমার উপ-লব্ধিই সার্থক।

আচার্য আমার মাথার উপরে ছাদ। ছাদ থাকলে কি সূর্য দেখা যায়? সূর্যের আলো দেখে সূর্যের শক্তি সম্পর্কে একটা কিছু কল্পনা করা যায়। সূর্য যদি দেখতে হয় তা হলে ঘরের ছাদের বাইরে এসে তা দেখতে হবে। শুধুমাত্র সূর্যোদয়ের সময় তা দেখা যায়।

নিমাইয়ের কথায় জগন্নাথ চমকে তাকাল তার দিকে। বুকের ভেতরটা তার রিণ রিণ করে উঠল। ভয়ে আতঙ্কে তার মুখের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল। চোখের চাহনিতে কি গভীর মায়া। কত ছলছলে আর করুণ! ভরে ভয়ে উচ্চারণ করল: নিমাই, তুমি এখন যাও। আমরা একটু সুখ দুঃখের গল্প করব।

নিমাই চলে গেল। অদ্বৈতাচার্যের স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। বলল: জগন্নাথ তুমি দুর্লভ ভাগ্যের অধিকারী। বহু জন্মের পুণ্যফলে তুমি এমন রূপবান, সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র লাভ করেছ। ভগিনী আমার রত্নগর্ভা। বিশ্বম্ভরও শুভলক্ষণযুক্ত। ওর কপালে রাজটীকা আছে।

আহ্লাদে জগন্নাথের বুকের ভেতব উথলে উঠার ভাব। কিন্তু দুরন্ত আতঙ্কে ও শঙ্কায় তার বুকের ভেতরটা খিল ধরা যন্ত্রণায় টাটাচ্ছিল। জগন্নাথ নিজেও জানে শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী নিমাইয়ের জন্মলগ্ন এবং রাশিচক্র বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখেছে, নিমাই সাধারণ মানুষ নয়। অপাপবিদ্ধ দুর্মর সাহসী, তেজী, বিশ্বজয়ী এক অসাধারণ মানুষ। মহাপুরুষের সব লক্ষণ পাওয়া গেছে তার জন্মপত্রিকায়। সেই মানুষ বোধ হয় অদ্বৈতাচার্যের স্বপ্নেই বাস করে। নিমাইকে দেখেই আচার্য তার স্বপ্নের পুরুষটিকে চিনতে পেরেছে। তাই হয়ত অদ্বৈতাচার্যের সর্বাঙ্গ দিয়ে এত খুশির উজ্জ্বল দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে।

জগন্নাথ মিশ্রের মুখের থমথমে ভাব লক্ষ্য করে অদ্বৈতাচার্য বলল: জগন্নাথ তোমার এই পুত্রটিকে আমার টোলে দাও।

* নিমাইয়ের কোষ্ঠীর নাম বিশ্বম্ভর

জগন্নাথের বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। বুক জুড়ে তার প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠল। সে কিছু সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। উচিত অনুচিতের বোধ লুপ্ত হয়ে গেল। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বেশ জোরের সঙ্গে বলল : না। ছেলে আমি মুর্খ করে রাখব। পাঠশালায় যা শিখেছে ঐ ঢের। কি হবে লেখাপড়া শিখে, একজনকে পণ্ডিত করতে গিয়ে'ত শুধু দুঃখই পেলাম। কাজ নেই পড়াশুনা শিখিয়ে।

অদ্বৈতাচার্যের দুই ভুরুর মধ্যস্থল কুঁচকে গেল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর এবং থমথমে গলায় বলল : এ তোমার অভিমানের কথা। মানুষ বিধিলিপির দাস। তুমি আমি নিমিত্ত। বিশ্বম্ভরকে তুমি আমার কাছে দাও।

ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত টান টান হয়ে দাঁড়াল জগন্নাথ। দু'চোখে তার দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। রাগে আর অভিমানে তার মুখের রূপান্তর ঘটল। আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে বলল : না। তোমার কাছে আর ছেলে পাঠাব না। হাঁ তুমি তোমার মন্ত্রণায় বিশ্বরূপ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তুমি আমাকে ভিখারী করেছ। তোমাকে আর বিশ্বাস করে ঠকব না।

অদ্বৈতাচার্য এ কথায় কেমন যেন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কথা না বলে দুটি চোখ পেতে রাখল জগন্নাথের মুখের উপর। তারপর খোলা জানালার দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে থম থমে গম্ভীর গলায় বলল : জগন্নাথ বিধাতা তোমাকে সৌভাগ্যবান করেছে। বিশ্বরূপ তোমার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। সে তোমার ছেলে এ এক মস্ত বড় ভুল ধারণা। তুমি যাকে সন্তান বলে জান আসলে সে মহাকালের জটিলসৃষ্টি লীলার ফসল। সে তো কেবল তোমার কতকগুলো আকাংখার সমষ্টিমাত্র নয়, কিংবা তোমাব গৃহের কোন সম্পত্তি নয়। সে জাতির সম্পদ। এই মহৎ চিন্তায় বিশ্বরূপের হৃদয় বিশ্বের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। এতে দোষ কি? একটি সংসারের দুঃখ থেকে একটি দেশ ও জাতির দুঃখ অনেক বৃহৎ। জাতির সৌভাগ্য ফেরানোর জন্যে যদি একটি সংসারকে অজস্র দুঃখ কষ্ট বরণ করতে হয় তা-হলে দোষের কিছু নেই! এরকম আত্মদান সেই পরিবারের গর্ব এবং গৌরবের। অথচ তোমার প্রাণে আপন সন্তানের ত্যাগ ও তার বিরাট আদর্শের জন্যে কোন গর্ব নেই। আশ্চর্য তোমার ব্যবহার। বিশ্বরূপের মত করেই তার জগৎটাকে দেখতে

হবে, তোমার মত করে নয়। বিশ্বরূপকে গৃহে নয়, বিশ্বের খোলা প্রাঙ্গনেই তাকে মানায়। সেখানেই সে বেশী সুন্দর। আমার শিক্ষা তাকে সুন্দর করেছে, এক মহামানব করেছে।

জগন্নাথ কোন কথা বলল না। জগন্নাথ যে চুপ করে রইল তার কারণ একটাই। ভিতরে ভিতরে প্রতিক্রিয়ার বদলে শুরু হয় বিচার বিশ্লেষণ, সমাধানের চেষ্টা। ভীষণ অবাক হয়ে সে চেয়ে থাকে অদ্বৈতাচার্যের দিকে। চোখে পলক পড়ে না। কেমন অদ্ভুত লাগল। একটা সিরসিরে ভাব। বুকের মধ্যে এক পরিপূর্ণ আনন্দে তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে লাগল পুলকে, গৌরবে, বিস্ময়ে, আনন্দে, বিরহে। জগন্নাথের মাথায় সন্তান কার— জটিল প্রশ্নের ঘোর। এতবড় মহাপ্রাণ কি করে তার ঔরসে শরীর ধারণ করল? কোথা থেকে পেল প্রাণ? সে রহস্য তো তার অধিগম্য নয়। তা'হলে এ ছেলে তার একার এ কথা ভাববার কোন হেতু নেই। জগন্নাথের খুব আশ্চর্য লাগে যে সন্তান তার শরীর থেকে জাত, তার মাথা স্ফুলিঙ্গ, তার ঔরস থেকে প্রাপ্ত এক প্রাণ তবু তার এই ছেলেটি তার মত নয়। অন্য রকম।

এ রকম একটা চিন্তায় জগন্নাথ অন্যমনস্ক। অদ্বৈতাচার্যের অধরে জয়ের হাসি। মৃদুকণ্ঠে বলল: মা বাবার অনেক স্নেহ আদর পেয়েছে, সেই জন্য বিশ্বরূপ এমন করে সব দেবার জন্যে প্রস্তুত। জগন্নাথ মন স্থির করে বিশ্বম্ভরকেও আমার চতুষ্পাঠীতে পাঠিও। আজ উঠি।

মুখের কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শচী মাথার ঘোমটাকে টেনে দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। কোন ভূমিকা না করে বলল: সেকি এত বেলায় গৃহস্থের বাড়ী থেকে না খেয়ে কেউ যায়?

অদ্বৈতাচার্য হাসি হাসি মুখে শচীর দিকে তাকাল। শচী এই কয়দিনে খুব রোগা হয়ে গেছে। অনেক কান্নার চিহ্ন পড়েছে চোখের কোলে। চুলে এলোমেলো ভাব। পোশাকে পারিপাট্য নেই। তবু শচীর ধারাল মুখখানা পিপাসার্তের মত মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল অদ্বৈতাচার্য। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: আমার ব্রাহ্মণী তা হলে উপোস করে থাকবে। তোমার পরিতৃপ্তি তার শুধু কষ্টের কারণ হবে। তার শুকনো মুখখানা আমার চোখে ভাসবে। স্বস্তি পাব না খেয়ে। অন্য একদিন হবে বোন।

শচী খানিকক্ষণ ঠোঁট টিপে মৃদু মৃদু হাসল। মাথা নেড়ে অদ্বৈতের

কথাগুলো মেনে নিল। তারপরে খুব দ্রুত তার মুখের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল। হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। থমথমে গম্ভীর গলায় অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল : আমার বিশ্বরূপ কোথায় ? সে কেমন আছে ?

অদ্বৈতাচার্য একটু হতভম্ব হয়ে গেল। চোখ বুজে ব্যগ্র মনে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে বলল : খুব সামান্যই তার কথা জানি।

শচীর কণ্ঠস্বরে যুগপৎ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল। ব্যাকুল স্বরে বলল : কি জেনেছ তার নামে ?

অদ্বৈতাচার্য নির্বিকারভাবে বলল : বিশ্বরূপ গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়ায় গিয়ে সন্যাস গ্রহণ করেছে। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবার পর তার নাম হয়েছে শঙ্করারণ্য পুরী। সে এখন দাক্ষিণাত্যের পথে। লোকনাথ পণ্ডিত তার শিষ্যত্ব নিয়ে তার সঙ্গে সেবকরূপে আছে।

শচী চোখ বুজল। কষ্টে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হল। অবদমনে অসহায় মুখখানি বিকৃত দেখাল। সারা শরীরে গভীর অবসাদ টের পাচ্ছিল। মৃত্যু শোকের আকুলতা স্পর্শ করে গেল তাকে। এর মধ্যে আশ্চর্য এক গর্ববোধ তার অভ্যন্তরটা টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু চোখ বাধা মানল না।

অদ্বৈতাচার্য অপরাধীর মত আকুল গলায় ডাকল : ভগিনী !

আচার্য !

অত চোখের জল ফেলছ কেন ?

আচার্য আমি'ত বেঁচে আছি এখনো। চোখে তাই জল আসে। আসবে না ? আমি যে মা !

জগন্নাথ মগ্নতা ভেঙে টান টান হয়ে দাঁড়াল। আর দুই আঁখিতে জল টসটস করছে। জলভরা চোখে অদ্বৈতাচার্যের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভেজা গলায় বলল : নিমাইয়ের মা, বেঁচে থেকে আমার কিন্তু বুকের জ্বালায় কোথাও কোন আগুন জ্বলে উঠল না। আমি কি নিভে গেছি ? পণ্ডিত, বাকী জীবনটা আমি কাটাব কি নিয়ে ?

অদ্বৈতাচার্য বলল : তোমার নিমাইকে নিয়ে আবার শুরু করবে জীবন।

জলভরা করুণ চোখে জগন্নাথ একবার অদ্বৈতাচার্যের দিকে আর একবার শচীর দিকে তাকাল। গদগদ স্বরে বলল : নিমাইকে আমি আর কাছ ছাড়া করব না। তাকে চতুষ্পাঠীতে দেব না। লেখা পড়া শেখা ভীষণ খারাপ।

কেন যে বিশ্বরূপকে লেখাপড়া শেখাতে গেলাম ?

অদ্বৈতাচার্য মৃদু ভৎসনা করে বলল : তুমি পুরুষ মানুষ। এত ভেঙে পড়লে চলে ? শোক, দুঃখ যত প্রশ্রয় দেবে, পেয়ে বসবে। তুমি একটু শক্ত হও।

অদ্বৈতাচার্য আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে। আমিও শান্ত হতে চাই। কিন্তু পারছি কৈ ?

চিন্তিত জগন্নাথ হুঁকোয় ঘন ঘন টান দিতে লাগল। তারপর একটু কেশে নিয়ে হুঁকোয় একটা আলগা টান দিয়ে শচীর আর্জির জবাবে বলল : বিদ্বান হয়ে তোমার ছেলে করবে কি ? পণ্ডিত হয়ে আমি কি আমার দারিদ্র্য ঘোচাতে পেরেছি ?

নিমাই শচীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। শচীর শাড়ীর প্রান্ত নিয়ে সে অস্থির-ভাবে আঙুলে পাকাতে লাগল। কখনও বা হাতে জড়াল। জগন্নাথের কথা শুনে নিমাই বেশ একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিল। ভেতরটা অসহায় আক্রোশে জ্বালা করছিল। বুকের ভেতব দুরন্ত উত্তেজনা আর প্রবল উৎকণ্ঠার খামচা খামচি শুরু হয়েছিল। মনের মধ্যে তার সংঘাত যত তীব্র হতে লাগল তার সর্বাঙ্গ তত ঘন ঘন প্রকম্পিত হতে লাগল চাপা রোষে এবং প্রতিবাদে। শচী তাব উদভ্রান্ত উত্তেজনায় এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন নিজের শরীরেব মধ্যে টের পাচ্ছিল। নিমাইয়ের ফর্সা ও সুন্দর মুখে সত্যিকারে এক আতঙ্ক ফুটে উঠল। মায়ের মনটা সন্তানের অবস্থা দেখে ছটফট করে উঠল। বেশ একটু ব্যথিত হয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে শচী স্বামীকে বলল : সে'তো তুমি বললে। কিন্তু ছেলেকে সেকথা কে বোঝাবে ?

তুমি পারবে ?

জগন্নাথ একটু রাগত স্বরে বলল : নবদ্বীপে ক'টা বামুনের ছেলে চতুষ্পাঠীর দোর পর্যন্ত গেছে ?

শচী শান্ত গলায় বলল : কে গেল আর না গেল তার খোঁজ'ত আমার দরকার নেই। আমার ছেলের ভবিষ্যৎ এবং তার চরিত্র গঠনের কথা আমাদের ভাবতে হবে বৈকি ?

জগন্নাথের চোখে মুখে উত্তেজনা ফুটে উঠল। গোল গোল চোখ করে বলল : ভেবেই বলেছি। মোটামুটি বিষয় আশয় যা আছে তাতে তোমার

ফুঁসতে ফুঁসতে কাঁপা গলায় বলল : তোমার উত্তরটা ছেলের যে পছন্দ নয় তা বুঝতে পারলে'ত। সত্যিই পছন্দ হওয়ার কথা নয়। এ তোমার জুলুম। ছেলের চলে যাবে। কষ্ট হবে না। খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে। আমাদের মত সাধারণ মানুষের এই যথেষ্ট।

শচী ঝংকার দিয়ে বলল : খেয়ে পরে পশুও বেঁচে থাকে। মানুষের চিন্তা ভাবনার জগৎ একটু আলাদা। মানুষ ও পশুর তফাৎ এখানেই। পণ্ডিতের ছেলে মূর্খ হয়ে থাকবে, একথা তুমি চিন্তা করতে পারলে? নিমাইব মত মেধাবী প্রতিভাবান ছেলে মূর্খ হয়ে থাকলে তোমার গৌরব বাড়বে না। লোকে তোমার নিন্দা করবে।

কে বললে তোমার ছেলে মূর্খ? সুদর্শন পণ্ডিত তাকে হাতেখড়ি দিয়েছে, তার পাঠশালায় পড়েছে, তারপর বিষ্ণু পণ্ডিতের কাছে রীতিমত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ নিয়েছে। এর পরে তাকে কি আর মূর্খ বলা যায়?

এভাবে কথার উত্তর এড়িয়ে যেও না। পড়াশুনায় নিমাইর মেধা এবং প্রতিভা আছে। বাবা হয়েছ বলে ছেলেকে নিয়ে যা খুশি করতে পার না। নিজের স্বার্থ ও সুখের কথা ভেবে যে বাপ সন্তানের কিসে মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়, উন্নতি হয় দেখে না, সে বাপের পদবাচ্য নয়। বিশ্বরূপ বলত সন্তান বাবা মা'র খেলার পুতুল নয়।

বিশ্বরূপের কথায় জগন্নাথ একটু থমকে গেল, দুই চোখ মোটা মোটা করে হুঁকোটা ঠোঁটের উপর শক্ত করে চেপে ধরে গুড়ুক গুড়ুক করে শব্দ করতে লাগল। শরীরের পেশীতে তার উত্তেজনার চিহ্ন প্রকট হল। বেশ কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে হুঁকো টানল। তারপর মুখ তুলে গলায় স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলল : এই সংসারে কর্তা আমি। কর্তার কথা মেনে চলাই সংসারের রীতি। নইলে শৃঙ্খলা থাকে না। তোমারও উচিত স্বামীর কথা শোনা। ছেলেকে বাধ্য করা।

নিমাই দৌড়ে চলে গেল। শচী নিমাইর চলে যাওয়ার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। নিমাইর নীরব প্রস্থান শচীকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। নিমাইর শান্ত গম্ভীর থমথমে মুখে উদাস উদাস ভাব, দুরন্ত অসহায়তা শচীর বুক মোচড়াতে লাগল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। টানা টানা চোখ দুটিতে ক্রোধের ঝিলিক যেন ক্রমে জিজ্ঞাসায় জ্বল জ্বল করে উঠল। রাগে খেতে পরতে দাও বলেই এই সব কথা মুখে এল। কিন্তু আমরা কেউ বানের

জলে ভেসে আসিনি। সংসার সকলকে নিয়ে। সংসারে আমার ভালমন্দ বলার একটা অধিকার আছে। বাড়ীর কর্তা বলে তুমি যা খুশি করতে পার না। তোমার অন্যায় সিদ্ধান্তকে আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকার নেই। নিমাইকে চতুষ্পাঠীতে পাঠাতে তোমার বাধা কোথায়, ভয়-বা কিসের?—বুঝি না।

শচীর প্রবল অভিযোগের সামনে জগন্নাথ অসহায় হয়ে পড়ল। একটু হতভম্ব হয়ে গেল। তাকে চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাল। একটু ভাবিত হয়ে শচীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বিরস মুখে হাতের হুঁকোটি দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: বিশ্বরূপ, পণ্ডিত হয়ে সংসারকে অসার জ্ঞান করেছে। নিমাইও করবে।

শচী বিরক্ত হয়ে বলল: এ তোমার অসার যুক্তি। নবদ্বীপে কত পণ্ডিত। কৈ—তাদের কেউ'ত সংসারকে অসার জ্ঞান করে চলে যায়নি? তুমি হারানোর আশংকায় কাতর।

তোমার অনুমান যথার্থ। কিন্তু আমার আশংকটাও সত্য।

তাই যদি হয় তা-হলে তুমি ধরে রাখতে পারবে? যা ঘটবার তা তুমি আমি শত চেষ্টা কবেও রুখতে পারব না। কেবল শক্তিক্ষয় হবে। তুমি যেমন বাবা, আমিও ত মা। সন্তানের কিছু হলে মায়ের যত লাগে বাপের তত নয়। উৎকণ্ঠায়, দুর্ভাবনায় আমাব বুক ফাটে কিন্তু তার সুখের পথে উন্নতির পথে কাঁটা হতে চাই না। শুধু কর্তব্য সাধনের জন্যে আমাদের উভয়কে নব নব দুঃখ বরণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের ছেলে দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত হবে—এই গর্ব কি কম! তুমি অমত কর না।

জগন্নাথ একটু বিস্ময় ভরে চেয়ে বলল: ঠিক আছে। আমাকে কিছুদিন ভাবতে দাও।

শচী একটা ঝামটা মেরে বলল: এতে ভাবার কি আছে? তুমি এত বোঝ, এটুকু বোঝ না মূর্খ হয়ে বেঁচে থাকা অভিশাপ। মূর্খেরে তো কন্যাও দেবে না কোন জন।

জগন্নাথ তর্ক করল না। মৃদু গলায় শুধু বলল: 'পড়িয়াও আমার ঘরে নাহি কেনে ভাত'?

শচীও তা জানে। কিন্তু জগন্নাথের মুখে কথাটা তার ভাল লাগল না। বুকের ভেতর তার একটু দুরু দুরু করছিল। নিমাই তার গর্ভজাত পুত্র বটে,

তবু যেন একজন অচেনা অজানা মানুষ। নিমাইকে নিয়ে তার চিন্তা হয়। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ এখনও বলছি তোমার মত বদলাও। আমার বড্ড ভয় করছে। ছেলে তোমার মতই জেদী, একগুঁয়ে। পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের উপর রাগ করে হয়ত চলে যাবে। এ আমি দিব্যি করে বলছি। পড়াশুনা করতে দাও না বলে ছেলে একদণ্ড বাড়ী থাকে না। সারাদিন বাইরে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। এখানে ওখানে দুষ্টুমি করে। স্নানের ঘাটে সকলকে জ্বালাতন করে। তার দুরন্তপনায় পাড়াপড়শি অস্থির হয়ে পড়েছে। এরপর যখন শুনবে তুমি ওকে অনুমতি দাওনি তখনি বেঁকে বসবে। ওকে ঘরে ফেরান দায় হবে। মা হয়ে ছেলের এতবড় সর্বনাশ চোখে দেখার চেয়ে মরণ ভাল। আমি বরং নিমাইকে নিয়ে বাপের বাড়ী যাই। তুমি তোমার জেদ নিয়ে থাক।

জগন্নাথ সভয়ে একবার কেঁপে উঠল। পায়ের তলায় ভূমিকম্প হতে লাগল! বুক উথাল পাথাল করে উঠল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

তখনি কক্ষের অভ্যন্তরে বাসনপত্তর ছুঁড়ে ফেলার শব্দ হল। কাঁসার বাসন মাটিতে আছাড় খেয়ে ঝন্ ঝন্ করে অনেকক্ষণ বাজল। কক্ষের দিকে তাকিয়ে শচী বলল ঃ ঐ শুরু হয়ে গেছে তার তাণ্ডব। এ-ত সূচনা। এরপর ভাঙবে চুড়বে ছিঁড়বে-কত কি হবে? এতেও যখন হবে না তখন উপোস করে আমাকে জব্দ করবে। এখন কি করবে, তুমি ভাব। কোনদিন শুনবে ছেলে বাড়ী ফেরেনি।

জগন্নাথের বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। একটা উৎকণ্ঠিত কষ্ট কাঁটার মত খচখচিয়ে উঠল বুকের অভ্যন্তরে। সেখানে নানারকম মিশ্র অনুভূতির তরঙ্গ। একটা যন্ত্রনাকে ঘিরে পাক খেতে লাগল। মনের কষ্ট চেপে দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বলল ঃ বেশ আমি ওকে পড়াব অনুমতিই দিলাম। কিন্তু অদ্বৈতাচার্যের টোলে কিছুতেই নয়। বিশ্বরূপের কচি মাথাটা অদ্বৈতাচার্য'ই বিগড়ে দিয়েছে। তাই, ওখানে আর নয়। নিমাই বরং গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতেই পড়াশুনা করুক। আমি গঙ্গাদাসকে ডেকে বলব।

জগন্নাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ কিন্তু আমার সম্পর্কে ওর ভুল ধারণাটা যে ভাঙা দরকার। কী করব বলতে পার?

শচীর মুখে খুশি খুশি ভাব ফুটল! মৃদু হেসে বলল ঃ অনুমতির কথাটা তুমি নিজে মুখেই ওকে বল। তা-হলেই ওর সব অভিমান জল হয়ে যাবে।

॥ তিন ॥

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ থেকে নানারকম ব্যামোয় ভুগছিল জগন্নাথ। ইদানীং সে শয্যশায়ী। রোগে রোগে বিছানার সঙ্গে শরীরটা তার মিশে গেছে। নির্বাক দুই চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পড়াশুনায় নিমাইয়ের প্রশংসা দিন দিন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার অসাধারণ মেধা, বিদ্যাবত্তা, প্রতিভা, যে কোন জটিল বিষয়ের সহজ সরল সমাধান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিশোর নিমাই এখন নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজের কৌতূহলের পাত্র। তাকে ঘিরে কত অদ্ভুত গল্প পাড়াপড়শীর।

রোগ শয্যায় জগন্নাথের কানেও সে কথা পেঁছয়। বুকটার মধ্যে কেমন উথলে উঠা ভাব হয় তার। খুব বেশীক্ষণ সে ভাব স্থায়ী হয় না। নীলাম্বর চক্রবর্তীর গণনার কথা হঠাৎ আনন্দের মধ্যে তার অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। যতই সহজ থাকার চেষ্টা করুক, আতঙ্কে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে উঠত। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বোধ করত। নীলাম্বর চক্রবর্তীর গণনা মিথ্যে হয় না। বিশ্বরূপ সম্পর্কে যা যা বলেছিল, সব ফলেছিল। নিমাইয়েরও ফলবে। নিমাই সব মায়া মোহ কেটে সন্ন্যাসী হবে। এই সহজ সিদ্ধান্ত শরীরের কোষে কোষে যে এত যাতনা দিতে পারে, জানা ছিল না। ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের থেকেও তা দুর্দম আর শক্তিময়ী, কারণ যুগপৎ একটা ব্যথা আর ভয় তাকে তীব্রভাবে বিদ্ধ করে রেখেছিল। নিমাই সন্ন্যাসী হবে এই কথাটা সে ছাড়া আর জানে না। শচীও নয়। পাঁচকান করতে নীলাম্বর চক্রবর্তীকে সে নিষেধ করেছিল। আজ চোদ্দ বছর ধরে সে একা তার ভার বহন করে চলেছে। শচীর মুখের দিকে তাকালে দুঃখটা বুকের ভেতর টনটনিয়ে উঠে। কথা বলতে গেলে চোখ ভিজে যায়। উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক যেন একখণ্ড ভারী একটা পাথর, তার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে আছে।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে জগন্নাথ নিজের মনে কত কি ভাবে। বিধাতাকে তার বড় রসিক আর নিষ্ঠুর মনে হয়। তিনি এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিয়ে নেন। এই মায়ার খেলার কি দরকার ছিল তাঁর ?

যত দিন যায় একটা অশুভ কিছু ঘটার আশংকা মনে প্রবল হয়। প্রতি-মুহূর্তে তাকে হারানোর আশংকা, অজ্ঞাত একটা ভয়ের মত তার মস্তিষ্ক জুড়ে নেমে আসতে থাকে, ঘিরে আসতে থাকে। অভূতপূর্ব রহস্যময় এবং বুকের মধ্যে একটা ভয়ের আশংকার চমক ও জিজ্ঞাসা এক সঙ্গে তাকে কেমন বিভ্রান্ত করে তোলে, যদিও জগন্নাথ অবিচলিত ও শান্ত থাকার চেষ্টা করে। তারপ অবস্থা ফাঁসীর আসামীর মত কয়েদখানায় বসে মৃত্যুর প্রহর গোনা। ঔরস-জাত সন্তানের প্রতি স্নেহ মায়া ভালবাসা এবং দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি যুগপৎ এই বোধেব দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জগন্নাথ অস্থিব হয়ে ভাবে আর বলে: নিমাইয়ের সন্ন্যাস বেশ আমি দেখতে পারব না। তার আগে তুমি আমাকে তুলে নাও। শচীর সহিষ্ণুতা মনোবল আমার নেই। আমি দুর্বল, ভীরু, আবেগপ্রবণ। নিমাইয়ের বিচ্ছেদ আমি প্রাণ থাকতে সইতে পারব না।

বাবা! তুমি ঘুমুচ্ছ?

নিমাইয়েব গলা পেয়ে জগন্নাথের তন্ময়তা ভঙ্গ হল। একটা স্বস্তি পেল মনে। আকর্ণ বিস্তৃত দুই চোখে একটা খুশির ঝিলিক খেলে গেল। মুখ টিপে একটু মলিন হাসল। বলল: আয়, কাছে বোস।

নিমাইয়ের দুই চোখে কৌতূহল চিক চিক করে। জিজ্ঞাসা করল: আজ কেমন বোধ করছ?

জগন্নাথ একটু বিব্রত হল। হাসি হাসি মুখ করে বলল: আমার জন্যে তোর খুব ভাবনা হয় না'রে?

জগন্নাথের জিজ্ঞাসার অবকাশেই নিমাই শয্যার একপাশে বসল। পিতার গায়ে হাত দিল। তাপ মাপল। মাথায় হাত দিল। চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিল। আঙুলগুলো মুটকে দিল। আর জগন্নাথ একটা আরামের মধ্যে ডুবে গিয়ে দুই চোখ বুজে তার স্নিগ্ধ সাহচর্য সেবার সুখ তৃপ্তি উপভোগ করতে লাগল। বিবর্ণ মলিন মুখে এক অনাবিল প্রশান্তি ফুটে উঠল। কিন্তু বোজা চোখের পাতায় জল টসটস করছিল।

নিমাই চমকে উঠে। জগন্নাথের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল: বড্ড কষ্ট হচ্ছে তোমার? মাকে ডাকব?

জগন্নাথ মাথা নাড়ল। শচীও সেই সময় ঘরে ঢুকল। মানুষের ছায়া দেখে নিমাই পিছন ফিরে খোলা দরজার দিকে একবার তাকাল। বলল: বাবা, মা এসেছে।

জগন্নাথের দিকে এগিয়ে গেল শচী। শিয়রের পাশে থমকে দাঁড়াল। চোখের তারায় যে অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। জগন্নাথেরও চোখও শচীর চোখের উপর স্থির, অপলক। কতকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল। হঠাৎ জগন্নাথের ঠোঁট কাঁপল। হাসির আভাস ফুটল অধরে। বলল : আজ ভাল আছি।

শচী চমকাল না। অবাক বিভ্রান্ত স্বরে বলল : কতকাল পর তোমার মুখে শুনলাম ভাল আছ।

জগন্নাথ হাসল। শচীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে পারল না। জগন্নাথ একটু দ্বিধায় প্রশ্ন করল : কেন, জিজ্ঞেস করলে বলত?

শচীর মস্তিষ্কে 'কেন' এই প্রশ্ন বিদ্ধ হয় এবং মুগ্ধ আবেশের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে কথাটা তার আবেগেই ধ্বনিত হয়। বলল : ভয় পাই। ভয় হয়, কি শুনতে কি শুনবো।

জগন্নাথ একটু হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার ভুরু একটু কুঁচকে গেল, ঠোঁটও একটু টিপে ধরল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ব্যথিত স্বরে বলল : এইযে অদ্বৈতাচার্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত এল—কেন এল, কি বলল—এসব জানতে কৌতূহল হয় না?

শচীর এই মুহূর্তের অভিব্যক্তি তাকে সুন্দর অধিকতর সুন্দর করে তুলল। বলল : হয় বলেইত, কাজ ফেলে এমন করে ছুটে আসি। হাঁ গো, দাদামনি (অদ্বৈতচার্য ছিলেন শচীদেবীর খুড়তুতো ভাই) কি বললে তোমায়?

জগন্নাথের মুগ্ধতা নামল দুই চোখে। অজস্র কথা একসঙ্গে জেগে উঠে হুড়মুড় করে অতিবেগে তার ঠোঁটের কাছে নেমে আসে। সেই অদ্ভুত আনন্দে আর আবেগে রোজকার দেখা জগন্নাথ বদলে গেল হঠাৎ। শচীর দিকে একবার ফিরে তাকাল তারপরে আবার নিমাইর দিকে। স্থির দৃষ্টি একরকমভাবে নিমাইর দিকে নিবদ্ধ থাকে। ধীর স্বরে বলল : ওরা দু'জনে শুধু তোমার মেধা, গ্রহণ ক্ষমতা, অভিনব বিশ্লেষণ এখন নবদ্বীপের আলোচনার বিষয়। পণ্ডিত চূড়ামনি গঙ্গাদাস বলল তার সুদীর্ঘ কালের অধ্যাপনায় তোমার মত কীর্তিমান, মেধাবী, প্রতিভাবান ছাত্র পায়নি। কিশোর বয়সে তুমি যেভাবে ব্যাকরণের দুর্বোধ্য সূত্র-টীকা এবং বেদান্তের জটিল দুরূহ তত্ত্ব আয়ত্ত করেছ এবং নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করছ তা শুধু ক্ষণজন্মা ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব বলে অদ্বৈতাচার্য মনে করেন। শিষ্যের এহেন কৃতিত্বে নৈপুণ্যে গঙ্গাদাস গর্বিত। তোমার দেয়া ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের যথার্থতা ও সম্ভাব্যতা নিয়ে যে

নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং সকলেই একবাক্যে তোমার ব্যাখ্যা অনুমোদন করেছে। তুমি নবদ্বীপের গর্ব বাঙালীর স্বপ্ন। রোগশয্যায় এর চেয়ে প্রীতিকর সুখকর আনন্দজনক খবর আর কি হতে পারে? মরবার আগে এই কথাগুলো শুনে বড় তৃপ্ত হলাম। আজ আমার বড় সুখের দিন।

কথাগুলো বলে জগন্নাথ চোখ বুজল। বোজা চোখের পাতার নীচে জল টস টস করছিল। নিমাইর সমস্ত অনুভূতি জুড়ে উত্তেজিত আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ নিমাইয়ের অনুভূতিকে ছুঁয়ে গেল। ওষ্ঠযুগল বিস্ফারিত করে সে হাসল। পণ্ডিতের বাড়ীর ছেলে আমি। আমার যা কিছু তাও এই পরিবার থেকে পাওয়া। তোমার সম্মান এবং মিশ্র পরিবারের গৌরবের কোন কাজ যদি করে থাকি তবে সে গৌরব আমার শিক্ষাদাতা আচার্যের আর আমার জনক জননীর আশীর্বাদ।

জগন্নাথ যেন উদ্গত অশ্রু চেপে বলল: দুঃখের সমুদ্র মন্থন করে এই অমৃত যখন আনলি বাপ, আর দুদিন আগে আনলি না কেন? আমার যে দিন শেষ হয়ে এসেছে। তোর এত যশ, খ্যাতি, কৃতিত্ব শুনে আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

কথাটা বলেই জগন্নাথ সম্বিৎ পায়। দু'চোখে তার আতঙ্ক ফুটে উঠে। মাথা নাড়ায়। নিজের কথাটা সংশোধন করে বলল: না, না, আমি আর বাঁচতে চাই না। কি নিয়ে বাঁচব? আমি সে দৃশ্য সইতে পারবো না। তার চেয়ে মরণ অনেক ভাল। জগন্নাথের কথা আটকে গেল। কোথায় যেন একটা দুরন্ত অসহায়তা আছে যা সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ভয়ংকর যন্ত্রণায় তাকে আঘাত করল।

সেই মুহূর্তে নিমাই যেন এক দুরন্ত কষ্টে আর্ত্তনাদ করে উঠল। বাবা বাবা, এসব কি বলছ তুমি? তোমায় কখনও উতলা হতে দেখিনি। কিন্তু আজ যেন তুমি কিসের ভারে ভেঙে পড়েছ, যা অসহনীয় মনে হচ্ছে, কি যেন একটা তুমি লুকিয়ে বেড়াচ্ছ? সত্যি করে বল তোমার কি হয়েছে?

জগন্নাথ গভীর আবেশে দুখানা হাত তার বুকের উপর চেপে ধরে বলল। নিমাই আমাকে কথা দে বাবা আমাকে একবার ছুঁয়ে বল আমাকে ছেড়ে যাবি না। বল রুগ্ন বাবাকে সন্ন্যাসী হয়ে কষ্ট দিবি না। বল?

নিমাই শান্তভাবে দৃঢ়স্বরে বলল: আমি কোনদিনই তা করব না। সন্ন্যাসী হওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। তোমার কষ্ট হয় এমন কোন কাজ আমার দ্বারা হবে না।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর জগন্নাথ মারা গেল। তখন অপরাহ্ন। গরীবের বাড়ীতে শোকের কান্না সহজে যায়না। বড় দীর্ঘস্থায়ী হয়। গরীবের সংসারে মৃত্যু মানে পরিজনহীনতা শুধু নয়, আরো কিছু। জগন্নাথের মৃত্যুতে শচী ও নিমাই অভিভাবকহীন হল। দুঃসহ একাকীত্বের মধ্যে তারা টের পেল জগন্নাথহীন সংসারের অনিশ্চয়তা। এবং অসহায়তা কতখানি গভীর এবং সুদূর প্রসারী।

শচীর মত নিমাইর কিন্তু শোকের উচ্ছ্বাস ছিল না। কিন্তু মৃত্যুজনিত দুঃখ শোক তার বুকে এক প্রগাঢ় যন্ত্রনার থাবা গেড়ে বসল। না কোন ব্যথা জ্বালা নয়, কেবল একটা শূন্যতায় বুকটা খাঁ খাঁ করে। মনটাও যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

তবু সময় এমনি যে জলের মত গড়িয়ে যায় বোঝাব আগেই। মিশ্র-পরিবারের শোকও তরল হয়ে গেল। দর্শনার্থী হিতাকাংখীদের ভিড়ও কমতে সুরু করল। ক্রমে ফিকে হয়ে এল শোক। বাঁচার নিয়মেই সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। নিজের জন্যে যদি নাও বাঁচে অন্যের জন্যে তাকে বাঁচতে হবে দায়িত্বে কর্তব্যে অনুরাগে ভালবাসায়। এত প্রীতি ভালবাসার সখ্য, সহানু-ভূতি, চোখ কাড়া সব দৃশ্য কানভরা সব সুর এত চারধারে যে বেশিদিন সরে থাকা যায় না। মনটাও শোকের একঘেয়েমির ক্লান্তিতে বিষণ্ণতায় হাঁফিয়ে উঠে। মুক্তির আকাংখা মনের বন্ধ দরজাকে একদিন খুলে দেয়।

মিশ্র পরিবারে আবার তার স্বাভাবিকতা ফিরে এল।

ক'দিন হল নিমাই বিদ্যানগরের গঙ্গাদাসের টোলে গেছে। সেখান থেকে রোজ নবদ্বীপে ফেরে না। বিদ্যানগরে টোল বাড়ীতেই থাকে। তিন চার দিন অন্তর বাড়ী আসে।

শচি এখন গৃহ মধ্যে একা। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগে। সময় তার কাটতে চায় না। বিছানায় উপুর হয়ে হাতের উপর মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে থাকে। কত এলোমেলো ভাবনা যে ভাবে তার ঠিক নেই।

সংসারে এমনিতে অভাব দারিদ্র লেগে আছে। জগন্নাথের মৃত্যুতে সেই

দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশা শুধু বাড়ল। পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীই এখন ভরসা। কিন্তু তিনি নিজেও বৃদ্ধ হয়েছেন। কদিন আর টানতে পারবেন? নিমাইর পড়াশুনার কোনরকম ব্যাঘাত না হয় তার সব ব্যবস্থাই তিনি করেছেন। তবু শচীর সংকোচ হয়। শচীর দ্বিধা সংকোচ এবং আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আহত অভিমানে বলল: বাবা মায়ের কাছে কি মেয়ে কখনও পর হয়? বিয়ের পর মেয়ে পর ঘরে হয়ে গেল বলে বাপের কর্তব্য কি শেষ হয়ে যায়? রক্তের সম্পর্ক স্নেহ মমতার বন্ধন বলে কিছু কি নেই? মেয়ের হয়ত বাপের দরকার থাকে না কিন্তু বাপত তার সত্তাকে বিছিন্ন করতে পারে না। মেয়ের কাছে বাবা পর হয়ে যায় বাপের কাছে হয় না। মা হয়ে নিমাইকে তুই আলাদা কবে দিতে পারবি? নিমাই তোকে ভুলতে পারে মায়া মোহত্যাগ করতে পারে কিন্তু তুই পারবি না। নিজের মুখের খাবার তার মুখে তুলে দিস কোন সুখে? আমার চোখের সামনে না খেয়ে শুকিয়ে থাকবি এটা চোখে দেখা যায়? কোন পাষাণ বাপে পারে? অবুঝ হতে নেই মা। বাপের ধনের উপর তোরও অধিকার। নিজের অধিকারে তুই তোর প্রাপ্য নিবি। এ দায় নয়, অনুগ্রহ নয় রক্তের দাবি, জন্মগত অধিকার।

শচী কথা বলতে পারল না। স্থানুব মত দাঁড়িয়ে রইল। কয়েকমূহুর্ত্ত। পিতার চোখের মনির মধ্যে কি দেখল শচীই জানে! তবু হাত বাড়িয়ে দিতে লজ্জায় তার মাথা কেটে গেল। চোখেও জল এল। পিতার বুকের উপর তার মাথাটা নত হয়ে এল।

কোন সাড়া না দিয়ে নিমাই ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এদৃশ্য কল্পনাতীত। শচী এখনো বিছানায় শুয়ে হাতের উপর মুখ গুঁজে শুয়েছিল। থেকে থেকে তার সর্বাঙ্গ ফুলে উঠেছিল!

শচী কাঁদছিল অঝোরে।

কেঁদে কেঁদে নিজেকে নিঃশেষ করতে লাগল।

অস্ফুট মা ডাক কানে আসতে শচী ভীষণ চমকে উঠল। চকিতে দাঁড়াল সে। সামনের এক গোছা চুল এসে পড়েছিল চোখের উপর। মুখের আধখানা তাতে ঢাকা পড়ল। চুলের ফাঁকে মুখ আড়াল করে গলার স্বরে হাসি টেনে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল: ও-মা। বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। চোখ মুছল।

নিমাই দাঁড়িয়ে রইল। ঈষৎ বিমূঢ় দৃষ্টি। এরকম একটা দৃশ্য বা পরি-

স্থিতির কথা সে কল্পনাও করেনি। সারাপথ ভাবতে ভাবতে আসছিল মাকে দেখে প্রথমে কি বলবে? মা হঠাৎ তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে হল তাই ছুটে এলাম। কিন্তু এরকম আবেগময় বাক্য তার মুখে আসে না। বড় নাটুকে মনে হয়। কিন্তু মা'তো তাকে হঠাৎ দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, একটা উদ্বেগ বোধ করবে। তাই ওসব কিছু না করার কথাই চিন্তা করে ঘরে ঢুকল।

দেয়ালের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল: আজ'ত তোর আসার দিন না। তবু চলে এলি? শরীর ভালত! নিমাই চুপচাপ দেখল শচীর বিব্রতা ভাব।

মনের ভেতরটা তোমার জন্যে বড় হু হু করছিল। বড় ফাঁকা আর শূন্য লাগছিল। তাই আচার্যর অনুমতি নিয়েই ফিরে এলাম।

শচী এই সময়টুকুর মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে উটল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল: হাত মুখ ধুয়ে আয়। আমি খাবার আনছি।

নিমাইর দৃষ্টিটা শচীর মুখের উপর থেকে নড়ল না। তার চোখ দুটো কৌতুক হাসি হাসি দেখাচ্ছিল। আর তেমনি সহজ সরল ভাবে বলল: তুমি এভাবে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলে কেন?

শচীর অস্বস্তির একশেষ। তবু হেসে বলল: আচ্ছা চোখ তো তোর। আমি চট্ করে সন্ধ্যেটা দিয়ে আসছি।

নিমাই তার প্রশ্নের জবাবটা পেল না বলে একটু ও নড়ল না, তাই আবার প্রশ্ন করল: কাঁদছিলে কেন বললে না'ত?

শচী ফাঁপরে পড়ল। নিমাইয়ের প্রশ্নের কি জবাব দেবে? ভাবতে ভাবতে বেশ একটা মানানসই জবাব মুখে এসে গেল। হাসি মুখে বলল: এতবড় একটা ফাঁকা বাড়ীতে একা থাকি। ভীষণ একা আর শূন্য লাগে। কথা বলার মানুষ পর্যন্ত নেই। তাই একা থাকতে থাকতে আমি কেমন হাঁফিয়ে উঠি। আমার কেমন কান্না পায়। যে দিকে তাকাই শুধু শূন্য। বুকের ভেতরটা আমার হু হু করে। বিশ্বরূপের কথা মনে হয়; কানের পর্দায় বাজে: নিমাই! "তুমা সমর্পিল আমি প্রিয় জগন্নাথে।" অমনি কেমন একটা আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠে। কান্নায় দু'চোখ ভিজে যায়। কাঁদতে কাঁদতে শূন্য কুম্ভের মত ভরে উঠে ভেতরটা।

শচীর জবাবটা ভাল লাগল নিমাইয়ের। তবু মা যে বড় কিছু একটা গোপন করল নিমাই তার অনুভূতিতে টের পেল। মুখে তার চেপা হাসি।

চোখে মুগ্ধতা। নামাবলীর ভেতর থেকে হাতটা ধীরে ধীরে বার করে জননীর সামনে মেলে ধরল। বলল : গ্যাখত এতে কি আছে? এর জন্যেই আসা।

শচী বিস্ময়ে হাত পাতল। নিমাইয়ের চোখে চোখ রাখল। তারপর পুটুলিটা খুলল। চোখে মুখে তার বিস্ময় ঝলক দিয়ে উঠল। অবাক স্বরে বলল : এত মোহর! কে দিল? কোথা থেকে পেলি?

অনির্বচনীয় হাসির স্নিগ্ধ ছটায় নিমাইয়ের মুখখানি আরো অপরূপ দেখাল। বলল : ঈশ্বর দিয়েছেন।

ঈশ্বর।

ঈশ্বর নয়তো কি?

মুকুন্দের চণ্ডীমণ্ডপে কয়জন ছাত্র নিয়ে টোল খুলেছি। এই মোহর হল তার আগাম রোজগার।

শচীর দুই চোখ আনন্দে জ্বল জ্বল করে উঠল। অকারণে চোখটা ভিজে গেল। মোহর-কটা বুকের উপর চেপে ধরল। চোখ বুজে এল আরামে, তৃপ্তিতে, সুখে উল্লাসে। চোখের পাতা জলে ভিজে টস টস করতে লাগল। কিছুক্ষণ কাটল এইভাবে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বলল : তোর পড়ার কি হবে?

তুমি কিছু ভেব না। সে আমি ঠিক করে যাব।

শচীর ঠোঁটে মৃদু কম্পন হতে লাগল। বুকও তোলপাড় করছিল। জীবনে মাঝে মাঝে এমন এক অবস্থার বোধ হয় সৃষ্টি হয় সকল মায়ের অন্তরে। ছেলে রোজগার করতে শিখলে মায়ের মনে ইচ্ছে জাগে তাকে সংসারী করার। শচীরও তেমন একটা দুরন্ত ইচ্ছে হল। মুচকী হেসে নিমাইকে দুম করে বলল : নিমাইরে আর একা থাকতে পারছি না। এবার একটা বিয়ে কর বাপু

নিমাইর ভিতরটা কিরকম থরথর করে কেঁপে উঠল। সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল! বিপন্ন লজ্জায় অপ্রস্তুতভাবে হাসল। চোখ নত করে বলল : কি আশ্চর্য! এত অভাব দারিদ্য দুঃখের মধ্যেও কথাটা তোমার মনে এল।

শচী একটু অপ্রস্তুত হয়ে নিমাইর দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : আমি তো এতে লজ্জার কিছু দেখছি না। নিমাই স্তম্ভিত।

বিয়ের কথাটা কি আশ্চর্য। এই শব্দটার ভেতর যে কত সুধা আছে কত

মাধুর্য আছে কি তীব্র আবেগ আর বিপুল উন্মাদনা আছে। ভাল লাগার মোহ লুকনো আছে নিমাই তার অনুভূতির ভেতর এই প্রথম টের পেল। ভাষা কত বলবতী, কি তীব্র তার বেগ কত গভীরে সে পৌঁছতে পারে কত অজানাকে স্পর্শ করে তার অভিজ্ঞতা জননীর বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্ন থেকে পেল। এই বিস্ময়ের ঘোর কাটল না নিমাইর। কথাটা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

হঠাৎ যেন কোন অন্ধকারের ভেতর থেকে তার পনেরো বছরের তারুণ্য বেরিয়ে এল। কি আশ্চর্য সেই শারীরিক অনুভূতি! দেহের কোষে কোষে যেন মৃদঙ্গ বাজছে। শান্ত স্থির স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে বিয়ের কথাটা একটি লোষ্ট্রপাতের মত শরীর ও মনকে ঘিরে মৃদু কম্পিত তরল বলয় সৃষ্টি করতে লাগল। শিহরণের আবর্ত এখন তার মন জুড়ে গভীর সুখের উল্লাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নিমাই চোখ বুজে বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে রইল। বুকের ভেতর দপ করে একটা স্মৃতির দীপ জ্বলে উঠল। একটা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে মুখ তার খুব চেনা। নদীর ঘাটে ন'বছর বয়স থেকে দেখে আসছে। সে মুখ লক্ষ্মীর। পণ্ডিত বল্লভাচার্যের মেয়ে। কিন্তু ঐ বয়সে লক্ষ্মীকে ভাল করে লক্ষ্যই করেনি সে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। নিমাইর মনে হল যে সে তারই অপেক্ষা করে আছে। সেও যেন তার ডাক শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে।

নিমাই কল্পনায় লক্ষ্মীকে দেখতে লাগল।

অভদ্র। অভদ্র। একঘাট স্নানরত মানুষের নানারকম কলরবের মধ্যে লক্ষ্মীর ঝংকার শোনা গেল। তারপরেই সে ডাকল ; মা। মা! ওমা॥

নিমাই তার কল্পনার মধ্যে লক্ষ্মীর অস্তিত্বের স্পর্শ টের পেল। লক্ষ্মী স্নান সেরে তার শাড়ী বদলে ঘাটে যখন ভিজে ছাড়া কাপড় ধুচ্ছিল, নিমাই মজা করার জন্যে পিছন থেকে ভিজে খোঁপাটা এক টানে খুলে দিয়ে তার সামনেই সজোরে লাফিয়ে পড়ল। জল ছিটকে তার পরনের শুকনো শাড়ীটা ভিজিয়ে দিল। সে ডুব সাঁতার দিয়ে পালাল মাঝগঙ্গায়। মাথা তুলে লক্ষ্মীর মা ডাকটা শুনতে পেল। আর তখন তার হাসি লাগল। বল্লভাচার্য গৃহীণী ডাইনে বাঁয়ে খুঁজল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। ভীষণ মজা লাগল।

রাত্রে ঘুম এল না নিমাইর। সে শুধু আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। এই অনুভূতির উৎস কোথায় তার শরীরে, না মনে ভেবেও কিনারা খুঁজে পেল না। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা প্রশ্নে নিমাইকে অস্থির করল। এ তার হল কি?

এমন কেন হয়? এটা বোধ হয় সম্পূর্ণ অনুভবের ব্যাপার। তাই মনটা এমন কানায় কানায় ভরে গেল তার। প্রতিমুহূর্ত্ত তার মনে হতে লাগল যার চিন্তা এত আনন্দের তার সান্নিধ্য কত না মধুর। এই ভাল লাগার আবেগের মুগ্ধতায় তার ভিতরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে দেখতে লাগল। কিশোরী লক্ষ্মীর ঢল ঢল মুখশ্রী দীঘল কাজল টানা টানা চোখ আর তন্বী দেহের অপরূপ লাবণ্য।

সকাল বেলাতেই কাকতালীয় ভাবে স্বপ্নের রাজকন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। দেখা হওয়াটা নিমাইর কাছে খুবই আশ্চর্যের। লক্ষ্মী তার সমবয়সী সঙ্গিনীদের সঙ্গে স্নান সেরে গঙ্গা থেকে ফিরছিল। হঠাৎ সমবয়সীদের মধ্যে তাকে দেখে নিমাই কেমন যেন হয়ে গেল। কি যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল তার মন। বুকের ভেতরটা তার থর থর করে কেঁপে উঠল। রাস্তার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল চিত্রার্পিতের মত।

লক্ষ্মীও নিমাইকে দেখে একটু চমকে উঠেছিল। বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গিনীদের সে বুঝতে দিল না অন্তরের প্রতিক্রিয়ার। নিমাইর রকমসকম দেখে সঙ্গীরা হাসল খিল খিল করে কিন্তু লক্ষ্মী হাসতে পারল না। বুকের ভেতর তার এক অবোধ রহস্যময় অনুভূতির ছায়ার মত প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল। মনের অস্থিরতা চাপা দেবার জন্যে কয়েক পা গিয়ে আঃ করে আর্ত্ত চিৎকার করে সেখানেই বসে পড়ল। বসতে গিয়ে কোমর থেকে কলসীটা কাত হয়ে গেল। বক বক করে বেশ খানিকটা জলে জায়গাটা প্লাবিত হল। লক্ষ্মী দু'হাতে পায়ের পাতা সজোরে চেপে ধরল। তীব্র যন্ত্রণার অস্থিরতা প্রকাশ করতে সে মুখ বিকৃত করে এধার ওধার মাথা আন্দলিত করল, কয়েকবার। আসলে কাঁটা ফোটার ব্যাপারটা ছিল তার ছলনা। সমবয়সীদের ফাঁকি দিয়ে সে কাঁটা বাড় করার মাথা হেঁট করে নিমাইকে দেখতে লাগল। সঙ্গীদের কেউ তার চাতুরী টের পেল না। তারা বরং তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল। তন্ন তন্ন করে খুঁজল কাঁটাটা।

সেই হল সময়। লক্ষ্মীর দুচোখ নিমাইর মুখের উপর। তার শান্ত, মুর্ত্তি, চোখ ধাঁধানো রূপ, দীর্ঘ দেহ তুলি দিয়ে আঁকা চোখ, মুখ, ঘন কালো মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণ চুল, সুঠাম সুন্দর চেহারার দিকে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল। চতুর্দশী লক্ষ্মীর বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। বিস্ময়ে আনন্দে তার হৃদয় কানায় কানায় ভরে গেল। মুগ্ধতা তার অন্তরে শ্রদ্ধা ও অনুরাগে

রূপান্তরিত হয়ে গেল। লক্ষ্মীর সর্বাঙ্গে শিহরণ বয়ে গেল। কেমন একটা উদ-ভ্রান্ত উত্তেজনায় কাঁপ ছিল তার অভ্যন্তরটা। এরকমটা কিন্তু আগে কখনও হয়নি।

নিমাই দৃশ্যটা দেখতে লাগল। তার মুখে হাসি, চোখে ঝকঝকে দৃষ্টি। একটা খুশি খুশি ভাব বিদ্যুৎ চমকের মত সমস্ত চেতনা জুড়ে স্ফুরিত ঝংকারে বাজছিল। নিমাইর বুকে প্রেমের নির্ঝর, চোখে কি গভীর মায়া আর করুণা।

সবাইকে ফাঁকি দিয়ে এ ভাবে নিমাইকে দেখার বিড়ম্বনা লক্ষ্মীকে বিব্রত ও অসহিষ্ণু করল। ছদ্ম বিরক্তি এবং রাগ দেখিয়ে বলল ঃ তোরা যা। অনেক খোঁচা খুঁচি হয়েছে, এবার একটু রেহাই দে। আর কষ্ট বাড়াস না। এমনিতে কষ্টে আছি। তোরা বাপু চলে যা। টাটানিটা একটু কমলে আমি আস্তে আস্তে যাব।

লক্ষ্মীর কথাগুলো বাতাস যেন বয়ে আনল। নিমাইর বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল। এক রহস্যময় আকর্ষণে সে দেখতে লাগল লক্ষ্মী মাথা নাড়ছে, আবার হাসছেও। তার বিব্রত দৃষ্টি যেন তার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে আছে। অমনি শিহরণ খেলে গেল। বুকের ভেতর তীব্র খুশির কলধ্বনি বাজতে লাগল। খুব আস্তে নিজের মনেই বলল ঃ ইস, কি সুন্দরী আর কি দুষ্টু।

নিমাই যেন একটা স্বপ্ন দেখছিল। লক্ষ্মীর দুই হাত কলসীর উপর মৃনাল দণ্ডের মত ঝুলছে। পিঠভর্তি তার এলো চুল" নিতম্ব ছুঁয়ে আছে। আট-পৌরে ভিজে শাড়ীখানা এলোমেলো ভাবে চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে আছে। খালি পা। পা দুটো কি নিটোল আর কি সুন্দর। গভীর কালো দুই চোখে তার কি সম্মোহন। একবার তাকালে আর ফেরানো যায় না। মায়াবী দৃষ্টি তার সমস্ত মনটাকে টানছিল। আর বিচিত্র এক শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল সে।

নিমাই যন্ত্রচালিতের মত লক্ষ্মীর সামনে এসে দাঁড়াল। তার ছায়ার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মী ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠল। সমবয়সীরা মজা পেল। এ ওর গা টিপে ইসারা করল। ফিস ফিস করে নিজেদের ভেতর কি বলাবলি করে ভীষণ জোরে একসঙ্গে হেসে উঠল সবাই। নিমাইর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে লক্ষ্মীকে বলল ঃ এবার তো রাগ হওয়ার কথা নয়। পা টা একটু ছড়িয়ে বস। বেচারার পা টা একটু ছুঁতে ইচ্ছে করছে।

অন্য একজন রঙ্গ করে বলল ঃ পায়ে ধরে সাধা

নামটি তার রাধা।

মেয়েটি বড় সুন্দর অর্থপূর্ণ হাসল। চোখে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

অমনি আর একটি মেয়ে চোখ টানটান করে মুখ নেড়ে বলল : না হয়। একটু কৃষ্ণের মত পায়ে হাত রাখল। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

নিমাই তাদের কোন কথাই গায়ে মাখল না। এক অনাবিল আনন্দে তার হৃদয় মন টৈ-টুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। সব কিছুই তার মধুর লাগছিল। মনে হল এরা যেন শ্রীরাধার সেই সখী বিশাখা ললিতা চন্দ্রাবতী। নিমাই খুব মজা পেল। অসংকোচে বলল : এতে সত্যিই লজ্জার কিছু নেই। একটু হাত দিয়ে না হয় ছোঁব। ব্যথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দেব।

লক্ষ্মীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কেমন একটা লজ্জায় কুঁকড়ে গেল সে। বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। একটা দারুণ ভয় আর অজানা অস্বস্তিতে সে চমকানো স্বরে স্বগতোক্তি করল। ছিঃ।

লক্ষ্মীর সংকুচিত অভিব্যক্তি নিমাইর সারা শরীর জুড়ে ঝংকারে বাজতে লাগল। একটা স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি তার মুখখানি উদ্ভাসিত করল। পলকহীন বিস্ফারিত দুইচোখে নিমাই তাকিয়ে ছিল। মুগ্ধ দুই চোখের চাহনি কান্তিময় হল অনুরাগে। স্ফুরিত অধরে নিমাইর কৌতুকের হাসি। সঙ্গিনীদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে সহজ ভাবে পরিচ্ছন্ন গলায় বলল : জয়দেবের কৃষ্ণ রাধার পা ধরে ধন্য হয়েছে। তোমাদের সখি'ত সামান্য কাঁটার ব্যথায় মূর্চ্ছা যায়, মুখ ভার করে ঘাড় বাঁকিয়ে বসে শুধু যদি নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চোখ মুখ রাঙা করে, সোনার অঙ্গ যদি কালি করে ফেলে তা হলে কৃষ্ণপ্রাণ নিমাইর তা কখনও সহ্য হয়? তার প্রাণ কখনও স্থির থাকে? নিমাইকেও তার পায়ে হাত দিতে হবে। বিনয় যে বৈষ্ণবের ধর্ম! বৈষ্ণবের কাছে ছোট বড়, স্ত্রী পুরুষ নেই। সকলে সমান। সখী জ্ঞানে লক্ষ্মীর পায়ে হাত দেয়া কোন লজ্জার কাজ নয়। অপমানেরও না।

নিমাইর গলায় এতটুকু কুণ্ঠা নেই। কথাটা বলে সে লক্ষ্মীর দিকে অপলক চেয়ে রইল। এই দেখার মধ্যে রাখা-ঢাকা কিছু ছিল না। গোপনীয়তারও কোন চেষ্টা নেই। নিজের কাছে ভাল লাগা ও মুগ্ধতা একসঙ্গে তার মুখের ও চোখের রূপ বদলে দিল। কেমন একটা খুশী আর গৌরব বোধ জাগল মনের ভেতর। মুখে প্রেম নিবেদন না করলেও একটা অব্যক্ত জবাব তার দুই চোখে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

লক্ষ্মীরও সেই অবস্থা। তথাপি একটা নারীসুলভ লজ্জা ও সংকোচ গভীর

ভাবে নাড়া দিল তার অন্তরে ও বাইরে। আচ্ছন্নের মত বসনটা টেনে দিল বুকের উপর। ফুর ফুরে বাতাসে তার চুল উড়ছিল। লক্ষ্মীর মনের অতলেও ঝড় উঠল। দুই হাঁটু জড় করে তাতে থুতনির ভর রেখে শূন্য চোখে মাটির দিকে চেয়ে রইল। নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা তার নেই। নিমাই তার জীবনে এক পরম প্রাপ্তির স্বাদ এনে দিল। আত্মদানের আবেগে থর থর করে কাঁপছিল তার বুক।

স্লথ পায়ে মাটি মাড়িয়ে নিমাই একেবারে তার সুমুখে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য উজ্জল অথচ দ্বিধাভরে চোখে তার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কি যেন খুঁজল। সখীরা স্তব্ধ। নির্বাক। তারা একবার নিমাইকে আর একবার লক্ষ্মীকে দেখছিল।

নিমাই লক্ষ্মীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। মদির বিহ্বল চোখ রাখল তার মুখের উপর। মধুর গলায় প্রশ্ন করল : তোমার কোথায় কষ্ট ?

লক্ষ্মীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। তার বুকের ধক ধকানিটা শুরু হল এসময়। কথাটা শরীর ও হৃদয় জুড়ে দামামার মত বেজে যাচ্ছিল। নিমাইর ফর্সা শরীর লোমহীন বুকের কোমল পেলবতা মাথায় কুঞ্চিত কেশরাশির অনির্বচনীয় শোভা, শান্ত, সৌম্য মূর্তির এক তীব্র চৌম্বক আকর্ষণ। লক্ষ্মীকে যে তার দিকে প্রবলবেগে টানছিল তা টের পেল। একটা অস্বস্তি পার হবার জন্যে হাসিতে মুখখানি সলজ্জ করে নিমাইর চোখে চোখ রাখল।

দুটি অনুরাগদীপিত হৃদয়ের লুব্ধ অন্তর এই আমন্ত্রনের যেন অপেক্ষায় ছিল। উভয়ের চোখে এক অপার্থিব মুগ্ধতা নামল। দুটি হৃদয়ই নতুন আবেগে নতুন অনুভূতিতে শূন্য কলসীর মত ভরে উঠতে লাগল।

ওদের মধুর মিলনের মাঝখানে কখন যে ঘটক ঠাকুর বনমালি এসে দাঁড়াল তা কেউ টের পেল না। আড়াল থেকে সব দেখে বনমালি শুধু মুচকি হাসল। তারপর গুণগুণ করে কৃষ্ণ নাম করতে করতে চলে গেল তাদের অগোচরে।

সুযোগ হাত ছাড়া করল না বনমালী। ঠিক সময়েই সে শচীর কাছে সম্বন্ধ নিয়ে হাজির হল।

॥ চার ॥

কুমারহট্টের বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী এলেন অদ্বৈতাচার্যর গৃহে। অদ্বৈতাচার্য ছিল তার গুরু ভাই। উভয়ে মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষিত। সেই সূত্রেই অদ্বৈতাচার্যের বাসগৃহ নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে তার যাওয়া আসা ছিল। ঈশ্বরপুরী এবার বহু বর্ষ পরে নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে পদার্পণ করল। অদ্বৈত ছিল ভীষণ অতিথি বৎসল এবং বন্ধু বৎসল। ঈশ্বরপুরীর আদর যত্নের কোন ক্রটি করল না অদ্বৈতাচার্যের গৃহিণী সীতা।

কয়েকদিন শাস্ত্রালোচনা করে কাটল তাদের। ঈশ্বরপুরীর আগমন বার্তা পেয়ে বহু পণ্ডিত ও বিদ্বোৎসাহী ব্যক্তি এলেন অদ্বৈতাচার্যের গৃহে। প্রতিদিন বিপুল লোক সমাগম হতে লাগল সেখানে। ঈশ্বরপুরীর সরল ব্যাখ্যায় শ্রোতারা আপ্লুত হল।

এসব আলোচনায় অদ্বৈতাচার্য কোনদিন উপস্থিত ছিল না। এর কোন বাস্তব মূল্য আছে বলে তার মনে হল না। তাত্বিক আলোচনা হল পণ্ডিতদের জ্ঞান বিলাসিতা। এর মধ্যে সর্ব সাধারণের কোন মঙ্গল কিংবা কল্যাণ নেই। আধ্যাত্মিক আদর্শ শ্রোতাদের মনটাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দেয়; কিন্তু মহৎ কর্মের মধ্যে তাদের টেনে আনে না। কিংবা কোন গৌরবময় সংগ্রামে উদ্দীপিত করে না মানুষকে। অথচ এই ধর্মের কি বিপুল শক্তি। কিন্তু সেই ধর্ম আজ মন্দিরে, পুঁথিতে, মতবাদে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে। জীবনের সঙ্গে জীবন্ত না হয়ে উঠলে ব্যর্থ হয় ধর্মের উদ্দেশ্য। ধর্ম চেতনা আজ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়ে ভালর চেয়ে জগতের ক্ষতি করছে বেশি। ধর্মবোধের সঙ্গে মনীষা, বুদ্ধি এবং তেজের সংমিশ্রণ ঘটছে না বলেই শতসহস্র মানুষের মনের ও দেহের জড়ত্ব ঘুচছে না।

অদ্বৈতাচার্যের মাথায় দেশ-কাল-পরিস্থিতির চিন্তা। এই দুর্ভাবনাটা তার বুকে এক প্রগাঢ় যন্ত্রণায় সূত্রপাত করেছিল বহুদিন আগে। এখন ক'দিন হল আবার সেরকম যন্ত্রণা হচ্ছে। শ্বাসকষ্টের মতও লাগছে যেন একটু। মনটা অস্থির। অদ্বৈতাচার্য ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। আর

ভাবতে লাগল। ভাবনার কি শেষ আছে? তবু ভাবতে ভাল লাগে। কিছুতেই চিন্তা করে যে পায় না। তবু বিশ্লেষণ চলে মনে। আপন মনে ভাবতে ভাবতে মাথা নাড়ে একটু আধটু বিড়বিড় করে।

দেশ-কাল-পরিস্থিতির চিন্তাটা তাকে ছেয়ে ফেলেছে। অস্বস্তিকর যন্ত্রণার মধ্যে যন্ত্রবৎ হাত-বাড়িয়ে ঘরের বন্ধ জানলাটা খুলে দিল। গঙ্গার বুক থেকে এক ঝলক শীতল বাতাস এল হু-হু করে। খোলা জানলার দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল: আমিই কেবল একা। কেন? এই নিঃসঙ্গতা আর কতকাল? আর কতদিন তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে?

ঈশ্বরপুরী খুব সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। অদ্বৈতাচার্য তার আগমন টের পেয়ে তাকাল। দুজনেই জিজ্ঞাসু চোখে দুজনকে দেখল। নিঃশ্বাস ফেলল। কুঞ্চিত ভুরু সটান হল ঈশ্বরপুরীর। ক্ষীণ একটু হেসে প্রশ্ন করল বিড়বিড় করে আপন মনে বলছিলে কি?

বিড়বিড়? বলে অদ্বৈতাচার্য অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তার চুল এলোমেলো। চোখের চাউনিটা কেমন লক্ষ্যহীন।

ঈশ্বরপুরী অবাক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। অদ্বৈতাচার্যের কাছ ঘেঁষে বসল।

ঈশ্বরপুরী মুগ্ধ চোখে দেখছিল অদ্বৈতাচার্যকে। মৃদু হেসে বলল: এবার তোমার অনেক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হল। তুমি হতাশার শিকার হয়েছ।

হতাশা? কিসের হতাশা?

হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধারের তোমার সেই স্বপ্ন, পরিকল্পনা কোথায় গেল? তোমার সেই দীপ্ত তেজের চিহ্নমাত্র নেই। তোমার বুকের আঁগুণ কি নিভে গেল? অথচ, আমাদের মধ্যে তুমিই ছিলে সবচেয়ে আশাবাদী। অবশেষে, তুমিও হতাশ হলে? বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে তুমি কেমন ঝিমিয়ে পরেছ।

চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। দক্ষিণের হাওয়া এল হু-হু করে অদ্ভুত এক হাহাকারের শব্দ নিয়ে। শেয়াল ডেকে উঠল। অদ্বৈতাচার্য একটু চমকে উঠল বটে। কিন্তু কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না। তার ভিতরে এক অফুরন্ত কৌতূহলই তাকে এক ধরণের সাহস দিল। থমথমে গম্ভীর মুখে অদ্বৈতচার্য ঈশ্বরপুরীর দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কিন্তু তার দৃষ্টি ঈশ্বরপুরীর উপর

ছিল না। সে কল্পনায় অন্য একটি মুখ দেখছিল। সে মুখ গৌরসুন্দরের। বিশ্বরূপের অনুজ বিশ্বম্ভরের। নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়ে সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। দুই চোখ বিস্ফারিত হল আনন্দে, প্রত্যাশায়। বিশ্বম্ভরের চেহারা যেমন সুন্দর তেমনি বুদ্ধিও তার ঝকঝকে। চালচলন কথাবার্তাও একটু স্বতন্ত্র। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা স্বাস্থ্যবান বুদ্ধিদীপ্ত এক তরুণ।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। অদ্বৈতাচার্যের দুই চোখের তারায় হঠাৎ আলোর ঝলক লাগল। মুখেতে হাসি হাসি ভাব। মৃদু স্বরে বলল: বারবার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু হবে। সত্যিই এবার কিছু ঘটবে জীবনে। একটা মোড় নেবে শীঘ্রী। মহাকাল যেন একজনের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। সে শক্তি ধীরে ধীরে নানা স্তরের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে সম্পূর্ণ মানব হয়ে দাঁড়াতে আরও কিছুকাল সময় নেবে। আমি শুধু তার অভ্যুদয়ের দিকে তাকিয়ে আছি। আমার বৈকুণ্ঠের নারায়ণকে আসতেই হবে পাপী, তাপী, পতিত অধমকে উদ্ধার করতে। তিনি এসেছেন। কেবল নিজের স্বরূপ বিস্মৃত। পরিবেশই তাকে পথের সন্ধান দেবে, তাকে ঠিক সময়ে কালের প্রহরী করে গড়ে তুলবে। ঈশ্বরপুরী শুধু জেনে রাখ মহাকাল খুব সংগোপনে আর সতর্কভাবে তার আগমনের পটভূমি প্রস্তুত করছে।

ঈশ্বরপুরীর দুই চোখে গভীর বিস্ময়। অবাক স্বরে বলল: অদ্বৈত তোমার কোন কথাই আমার বোধগম্য হল না। এই রহস্যময় কথার কোন মানে হয় না।

অদ্বৈতাচার্যের উজ্বল চোখের কৃষ্ণবর্ণ দুটি তারা যেন ঝিক করে হেসে উঠল। আর তাতেই অপরূপ দেখাল তাকে। একটু ভেবে বলল: ঈশ্বরপুরী শুধু একটা উপলক্ষ্য আর ক্ষেত্র দরকার তার আবির্ভাবের। বস্তু বিশ্বের তরঙ্গ এসে লাগলেই তার বিস্মৃতির বাঁধ ভেঙে যাবে। স্বরূপ সচেতন হবে। আর তখনই আমার বৈকুণ্ঠপতি দরিদ্র, নীচ, পতিতের উদ্ধারে ব্রতী হবেন। নইলে, তিনি কিসের দীনবন্ধু?

ঈশ্বরপুরী সংশয়ে পড়ল। হাঁ করে কিছুক্ষণ অদ্বৈতের দিকে চেয়ে থেকে অবাক স্বরে বলল: বটে। তোমার সেই প্রতিদিনকার দেখা ও জানা অসাধারণ মানুষটি কে? এত কাছে ছোঁয়ার মধ্যে থেকেও তার বিরাট ব্যক্তিত্বকে আমরা কেউ চিনতে পারলাম না; তুমি বল কি?

অদ্বৈতাচার্য চোখ বড় বড় করে মাথা নাচিয়ে বলল: সে তোমার শুনে

কাজ নেই।

স্মিত মুখে অদ্বৈতের মুখের দিকে চেয়ে ঈশ্বরপুরী প্রশ্ন করল : থাককে না কেন ?

অদ্বৈতাচার্য বলল : আমার চোখে সে অসাধারণ। তার সম্পর্কে আমি যাই ভাবি না কেন, লোকে কি বলে সেত যাচাই করে দেখতে হবে।

ঈশ্বরপুরীর বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে অনেক কিছু ভাবল। নবদ্বীপে এসে যাদের দেখেছে তাদের কথা এবং মুখ মনে করতে লাগল। কিন্তু কারো মধ্যেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে কোন বিশেষ গুণ সে দেখতে পেল না। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। অপ্রতিভ হয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল। সেই সময় হঠাৎ গঙ্গায় দেখা ধারাল এক ব্যক্তিত্বশালী যুবার দীর্ঘ গৌরতনু, আজানুলম্বিত হস্ত, তীক্ষ্ণ নাসিকা, আকর্ণ বিস্তৃত টানা টানা আঁখি ভ্রমর সদৃশ ভুরু, কুঞ্চিত কেশরাশি এবং প্রতিমার মত দুর্জয় অপরূপ মুখশ্রী তারই দুই চোখের তারায় ভেসে উঠল। ভরা যৌবন তার চেহারাকে ভারী বিশিষ্ট করে তুলেছিল। নির্বাক বিস্মিত দৃষ্টিতে ঈশ্বরপুরী সেই যুবককে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। মুখে তার অনির্বচনীয় হাসি ফুটল। স্নিগ্ধ ও স্মিত মুখে অদ্বৈতাচার্যের দিকে চেয়ে থেকে বলল : মনে হচ্ছে, সেই ব্যক্তিটি আমিও চিনি।

অদ্বৈতাচার্য বিস্মিত হয়ে বলল : চেনো ? কি রকম চেনো ?

ভালই চিনি।

কি মুশকিল ! কিভাবে চিনলে বলবে'ত ?

সব কি তোমায় শুনতে হবে ?

হবে। আমার জানাটা যাচাই করতে হবে না ?

ঈশ্বরপুরী প্রশ্নটা অদ্বৈতের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তার মনের কথাটা জানার জাল ফেলল। বলল : আমি কার কথা মনে করেছি বলে তোমার মনে হয় ?

অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরপুরীর মতলব টের পায়। নিস্পৃহভাবে বলল কী জানি !

ঈশ্বরপুরি অপ্রতিভ হল। বিব্রত হয়ে বলল : তবে শোন। গঙ্গার ঘাটে আমি এক দুর্বিনীত, উদ্ধত, দাম্ভিক, নাস্তিক, তরুণ পণ্ডিতের নাম শুনেছি। চোখেও দেখেছি। যুবক শুধু সুদর্শন নয়, তার ব্যক্তিত্ব, তেজ সাহস দৃঢ়তা বাগচাতুর্য দৃপ্ত ভঙ্গী আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। শুনেছি, ঐ বয়সে সে

সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণও নাকি অভিনব। নবদ্বীপে পণ্ডিতেরা তাকে সমীহ করে। মুগ্ধ হয়ে তার কথা শোনে। যুবকের কথা যত শুনি ততই বিস্ময় বাড়ে। অবাক লাগে। ঐ যুবক মানুষের অন্তর বাইরে নাড়া দেয়ার এত শক্তি কোথায় পেল? সকলকে বশে রাখার সমীহ করার এই তেজ তাকে দিল কে? তার ব্যক্তিত্বকেই বা এমন আলাদা করে চেনানোর প্রয়োজন হল কেন? মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেবার এই চরিত্রগুণত তার। ভেতরেই সৃষ্টি হয়েছে। এই দুর্লভ গুনত সব মানুষের থাকে না। কোন কোন মানুষের হয়। তারা ক্ষণজন্মা ব্যক্তি। তাইতো বিশ্বম্ভর কে জানিনা। তবে তাকে দেখলে তার কথা শুনলে মনে হয়, কোন মহাশিল্পী যেন লক্ষ্যের অগোচরে তিল তিল করে তাকে মহা উদ্দেশ্য সাধন করতেই যেন গড়েছে।

বিস্ময়ে ও আনন্দে অদ্বৈতাচার্যের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক অদ্ভুত সুখের উল্লাসে তার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। প্রবল শ্বাসের সঙ্গে তীব্রস্বরে কথাগুলো বেরিয়ে এল। ঠিক-ঠিক! তোমার দেখায় কোন ভুল নেই। আমার অনুমানের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলন তোমার ভাবনা। আমিও ভাবি এত মানুষ'ত আছে তবু সর্বাগ্রে বিশ্বম্ভরের কথা মনে হয় কেন? তার এই ব্যক্তিত্ব শূন্যে তৈরী হয়নি। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থার ভেতরে বিকশিত হয়েছে। ব্যক্তিত্ব দেশ-কাল নিরপেক্ষ হয়ে গড়ে উঠে না। বিশ্বম্ভর নিজেও বোধ হয় জানে না মহাকাল তাকে দিয়ে কি করতে চাইছে? কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভিতরের একটা শক্তি তাকে দিয়ে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা করে নিচ্ছে।

অথচ তুমি তার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছুই করনি।

ঈশ্বরপুরীর অভিযোগ শুনে অদ্বৈতাচার্য থমকে গেল। কথাটা তীরের মত বিদ্ধ করত তাকে। বেশ কিছুক্ষণ বিমর্ষ চোখে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর একটা শ্বাস ফেলে গম্ভীর গলায় মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করল, হুম্। অভিযোগটা মনের ভেতর কয়েকবার নাড়াচাড়া করে প্রশ্ন করল— একেবারেই করিনি কিছু?

হুঁ করেছ বৈকি? শ্রীবাসের রুদ্ধগৃহে রাত্রদিন নাম সংকীর্তন করছ। কিন্তু একবারও ভাবছ না সে নামকীর্তন নরনারায়ণের কানে পৌছবে কেমন করে? তুমি ভাল করেই জান কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে আদর্শহীন,

ধর্মহীন। সব দিক দিয়ে তারা নীতিভ্রষ্ট। ভুবন মঙ্গল হরিনামে তাদের চিত্ত ভরে না। কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না রসনায়। তুমি তার উন্মাদনা আনার জন্যে যদি দ্বার বন্ধ করে কৃষ্ণনাম কর তাহলে জনতার জীবনকে তা অভিনব গৌরবে উদ্ভাসিত করবে না। নামকীর্তনকে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তাকে অভয় করে তুলতে হবে। কিন্তু তুমি সে কাজ বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একাজের তোমার সবচেয়ে বড় সহায় এবং সম্বল হতে পারবে বিশ্বম্ভর! নেতৃত্ব দেয়ায় শক্তি আছে তার। বোধ হয় সেই পারে নতুন চেতনা, নতুন বিশ্বাস আর প্রত্যয় জাগাতে।

ঈশ্বরপুরীর কথাগুলো অদ্বৈতের প্রাণে এক আনন্দ ও বিশ্বাসের গাঢ়তায় দাগ কাটল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে পারল না। বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে চোখ রেখে বলল : তোমার কথাই ঠিক। আমি একটা অভিমান নিয়ে তার কাছ থেকে দূরে সরে আছি। এটা আমারই ত্রুটি।

অদ্বৈতের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল। দু'চোখের পাতা গভীর বেদনায় সুনিবিড় হয়ে উঠল। একটা তীর বিদ্ধ যন্ত্রনায় বুকটা টাটাতে লাগল। মৃদু কণ্ঠে বলল : বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করলে জগন্নাথ মিশ্র আমাকেই দায়ী করল। তার পালানোব সব দোষ আমার। আমি তার চোখে চির অপরাধী হয়ে থাকলাম। আমাকে কোনদিন সে ক্ষমা করেনি। আমার উপর রাগ করে সে বিশ্বম্ভরকে আমার টোলে পড়তে দিল না। আমার সান্নিধ্য থেকে যাতে দূরে থাকতে পারে সেজন্য ছয় ক্রোশ দূরে বিদ্যানগরে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে তাকে পড়তে পাঠাল। অথচ বিশ্বম্ভরকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন ছিল। ব্যাপারটা বড় আত্মসম্মানে লাগল। প্রাণপণে আমি তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। তার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে নবদ্বীপের টোল বন্ধ করে দিলাম। এখনত শান্তিপুরের বাড়ীতেই বেশি কাটাই।

ঈশ্বরপুরী নিরুত্তাপ গলায় বলল : আমি জানি। কিন্তু নিন্দুকে অন্য কথা বলে।

আমিও শুনেছি। নবদ্বীপের মানুষ বলে বিশ্বম্ভরের প্রতিভা, মনীষা পাণ্ডিত্য, গৌরব, খ্যাতির আমি ঈর্ষা করি। তাকে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবি। তার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাজয়ের আশংকা করেই নাকি দূরে দূরে

থাকি। মুখোমুখি হওয়ার ভয়েই নাকি তাকে এড়িয়ে যাই। এরকম কত আজগুবি কথা শুনতে হয়। এসব মিথ্যে রটনা শুনে নিমাই কি ভাবে—এই কথাটা চিন্তা করলে লজ্জা পাই।

ঈশ্বরপুরী একটু হাসল। অদ্ভুত সে হাসি। মৃদুস্বরে বলল : বাতাসের গন্ধ শুঁকে মানুষের মনোভাব টের পেতে হবে। বিশ্বম্ভরের চরিত্র ব্যক্তিত্ব যদি তুমি জেনে রাখ তা-হলে এরকম কোন সংশয় প্রকাশ করা শোভা পায়?

অদ্বৈতাচার্য কি বলবে ভেবে পেল না। লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে গেল। কানের দু'পাশ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। শরীরের কোষে রক্তস্রোত কি যেন উষ্ণ প্রস্রবণের মত গড়িয়ে পড়ল। লজ্জায় অদ্বৈতাচার্য নিঃশব্দে মাথা নাড়তে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে এক লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : তোমার কথা শুনে লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। দুঃখ অনুতাপের কষ্টে বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস কর বিশ্বম্ভর সম্পর্কে আমার কোন সংশয় নেই। বাতাসে বাতাসে যে কথাটা ছড়িয়ে যাচ্ছে তা আমার মত তার কানে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। এই মিথ্যে রটনার আতঙ্ক আমাকে সংকুচিত করে। আমিই লজ্জা পাই। আশা করব আমার কথার তাৎপর্যটা তুমি বুঝতে পেরেছ।

ঈশ্বরপুরী তর্ক করল না। অবাক দৃষ্টিতে অদ্বৈতাচার্যের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে বলল : তা হলে, আমার বুঝতে ভুল হয়েছে। কিন্তু এতে তোমার সংকোচের কিছু নেই। যারা সত্যের ও আদর্শের পূজো করে তাদের গায়ে কিছু কলঙ্ক লাগে। সে কলঙ্ক তাদের গৌরবের। তাতে হৃদয়ের ঐশ্বর্যই প্রকাশ পায়।

। পাঁচ ।

নিমাই এখন শিক্ষার্থী নয় ; নিজেই শিক্ষক। ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘের দেহ বিধাতা যেন প্রকৃতির লাবণ্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য্য এবং নমনীয়তা দিয়ে গড়েছে। কোথাও এতটুকু বাহুল্য নেই। কি সুন্দর মিষ্টি চেহারা আর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাদানের সময় হাসির আভায় উজ্জ্বল দুই চোখে এক

স্নিগ্ধ মমতা ঝরে পড়ে। ছাত্রদের মুগ্ধ বিস্মিত অপলক দুই চোখে পলক পড়ে না মোটে। বুকের ভেতর তাদের শিক্ষক সম্পর্কে কেমন একটা উথলে উঠার ভাব জাগে। নিজের মনের সঙ্গে তখন তারা কথা বলে নিঃশব্দে।

নিমাইর টোলের সুনাম এবং অধ্যাপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। নিমাই সুবক্তা। ছাত্ররা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তার পাঠ শোনে! নিমাইর বক্তব্য এত সুন্দর এবং মর্মস্পর্শী যে ছাত্ররা অভিভূত হয়ে যায়। তার অধ্যাপনার সুনামে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চাভিলাষী অনেক তরুণ শিক্ষার্থীও তার টোলে আসে। নিমাইর পড়ানো শেষ হলে ছাত্ররা কেমন হয়ে যেত। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফেরার মত একটা কষ্টকর অবস্থা হত তাদের। তারা প্রশ্ন করতে ভুলে যেত। বোবা বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত এক দুরন্ত বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায়।

শিক্ষার্থীদের মুগ্ধতা, চমৎকারিত্ব, অভিভূত আচ্ছন্নতার দিকে তাকিয়ে থাকতে নিমাইর বুকটা গর্বে ফুলে উঠত। অধ্যয়ন আর অধ্যাপনার ভেতর নিঃশব্দ সময়ের মত দিনটা কেটে যেত। তাতে বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট। কিন্তু চমক কিংবা উত্তেজনা ছিল না।

গৃহবধূ লক্ষ্মী প্রিয়া এবং বিধবা জননীকে নিয়ে নিমাইর এখন সুখের সংসার। নিস্তরঙ্গ জীবন সমুদ্রে সংসার তরীটা ভাসিয়ে যেন বসে আছে।

ইদানীং মনের ভেতর এক ধরণের ক্লান্তি এবং কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু কষ্ট সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তবে, চরম পূর্ণতা থেকেও জীবন সম্বন্ধে এ রকম এক দৃষ্টি ভঙ্গী জন্মায়। কিন্তু তার অপূর্ণতার যন্ত্রণার উৎস কোথায় নিমাই বুঝতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে শুধু একটা অশান্তি ঝুলে থাকে। মুখের ভাব বিধুর হয়ে আসে। মনে কষ্ট হয়। তখন নিজের অজান্তে দেশ-কাল পরিস্থিতির অনেক কথাই এলোমেলো ভাবে মনে আসে। নিজের ধর্ম নিজের মত করে নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের উপর যে আঘাত আসছে তাকে রোধ করার জন্যে কিছু করা দরকার। কিন্তু কেউ কিছু করে না। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য।

অথচ ভগবানের পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ছোট বড় বলে কিছু নেই। সব মানুষ এক। তবু সমাজে সেই সমতা কোথায়? তার পরিবেশ গড়ে উঠছে না কার স্বার্থে? দেশের শাসক আর সমাজ রক্ষকের স্বার্থে? আচমকা নিজের মনেই কথাগুলো বলল। ভাবল আরো বেশি। এরা ধর্মপ্রাণ মানুষকে বোকা

বানানোর অস্ত্র করেছে ধর্মকে। এই অস্ত্রটি ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করার মোক্ষম দাওয়াই হল জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করা। এ হল একটা আদর্শ। কিন্তু কি করলে যে এটা যথার্থ বাস্তব হয়ে উঠে। তাই নিয়ে নিমারই যত চিন্তা। নানারকম স্বার্থের সংঘাত হিন্দু-অহিন্দু সম্পর্কে। জাতিগত সংঘাতের চেয়ে ধর্মীয় সংঘাত এখন প্রবল। রাজায় প্রজায় সংঘাত প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু উচ্চবর্ণ-নিম্ন বর্ণের বিরোধ আছে। হিন্দু-অহিন্দু আছে, শাক্ত-বৈষ্ণব আছে, জমিদার-প্রজায় আছে, ভক্তে-পাষণ্ডে আছে। সুতরাং, এ রকম ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে তোলা, ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করা এক দুরূহ কাজ। বড় কঠিন ব্যাপার। তবু সময় ও সুযোগের নিপুণ নির্বাচন অনেক সময় জীবনধারাকে বদলে দেয়। অকস্মাৎ এক বিরাট জীবন স্রোতের অংশ হয়ে উঠে মানুষ। মানুষের জীবন ধর্ম হল মিলিত হওয়া, সরে থাকা নয়। কিন্তু কিসের মন্ত্রে মানুষ মিলতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে ধর্মে নয়, প্রেমে মানুষ সুন্দর হয়, মহান হয়। চিন্তার আকস্মিকতায় নিমাইর সহসা মনে হলো সবার উপর মানুষ সত্য এই আদর্শের আলো যদি মানুষের উপর পড়ে তা'হলে হয়ত মানুষের জীবন এক নতুন প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত হতে পারে। কিন্তু তার জন্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা, সততা নিষ্ঠা এবং ত্যাগ চাই। সবাকার সামনে মিলিত হওয়ার এই অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হলে ত্যাগে দুঃখে, বেদনায় বীর্যে তারা প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করে মহান সাহসে বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু সেই পরিবেশ কি সত্যিই কোনদিন হবে? কিন্তু সেই মানুষটি কে? নিমাই নিজের মনে মনে বলল, লোকের চোখে সার্থক পুরুষ সে। তার খ্যাতি যশ, হৃদয় বন্ধনের ক্ষমতাই তার সার্থকতার সরঞ্জাম।

মানুষের স্বপ্ন, কামনা, আকাংখা এবং প্রত্যাশা পূরণেব সংকল্প নিজেকে উৎসর্গ করার আগে নিমাই নিজের ইচ্ছা ও প্রবণতার চেহারাকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ঘটনার আকস্মিকতায় তার এক সুযোগ সৃষ্টি হল।

কাহার পাড়ায় বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান হতে মিয়াপুরে চাঁদকাজীর মসজিদে জড় হয়েছিল। দুস্থ দরিদ্র যে সব হিন্দু মুসলমান হ'ত তাদের জন্যে চাঁদকাজী মিয়াপুরে একটা পৃথক পল্লী করেছিল।

ধর্মান্তরের সংবাদ শুনে দুক্রোশ পথ ভেঙ্গে নিমাই গেল সেখানে। ধর্মান্তর ঠেকাতে নয়, জীবনকে দেখতে, মানুষের অন্তরের প্রতিক্রিয়া বুঝতে। দেখে লজ্জা ও ক্ষোভে মাথা নত হয়ে গেল। এমন যে হতে পারে নিমাই

স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। অথচ তার চোখের সামনেই সব ঘটল। সে একজন তার দর্শক। সাক্ষীও বটে। মনের মধ্যে তিল তিল করে যে ক্ষোভ, রাগ, দুঃখ, বেদনা, বিদ্বেষ, পাহাড়ের মত জমে স্তূপাকৃতি হয়েছিল, সেই পাহাড়েই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে গেল কাহারপাড়া লোকদের অন্তরে।

মসজিদের চারদিক খোলা। গাছপালার সুনিবিড় ছায়ায় ঢাকা প্রাঙ্গন। সামনে ধু-ধু করা দিগন্তলীন মাঠ। দূরে স্বচ্ছ তোয়া, পূণ্য সলিলা গঙ্গা।

নিমাই চুপি চুপি একটা গাছের নীচে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে মসজিদের অভ্যন্তর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। সকরুণ বোবা দৃষ্টিতে নিমাই তাকিয়েছিল। কাহার পাড়ার প্রত্যেকটি মুখ তার চেনা। প্রত্যেকের মুখের উপর একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল। বিহ্বল দুই চোখে একটা বিষণ্ণ ভাব। মুখে কষ্টের ছাপ। বড় অসহায় আর উদভ্রান্ত লাগল তাদের। প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ভেতরকার দুঃখ, অসহায় আর আত্মগ্লানি তাদের মুখে চোখে ফুটে বেরোচ্ছে। তাদের কষ্টে নিমাইর বুকের ভেতরটা গেল। আর কেউ না জানুক, সে জানে, হিন্দুরা এদের উপর কোন দিন সুবিচার করেনি। চিরদিন তাদের কাছ থেকে অবহেলা, ঘৃণা, আদর, অবজ্ঞা, বিতৃষ্ণা পেয়ে এসেছে তারা। তাদের জন্যে কারো প্রাণে এক ফোঁটা সহানুভূতি পর্যন্ত নেই। জগাই মাধাই—জলুম, অত্যাচার তাদের ছোট্ট তৃপ্তিটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। পেটভরা ক্ষুধা, বুকভরা আত্মগ্লানি আর হিন্দু ধর্মের উপর অভিমান নিয়ে তারা বাপ-ঠাকুর্দার ধর্ম ত্যাগ করল। তাদের নীরব অশ্রুবর্ষণ আর দীর্ঘশ্বাস যেন হাহাকারের মত বাজতে লাগল তার বুকের ভেতর।

কাহার পাড়ার সর্দার ধর্মদাস কখন যে নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল নিমাই জানে না। হঠাৎ তার ডুকরে কেঁদে উঠার শব্দে নিমাই চমকে উঠেছিল। বুকভাঙা কান্না গিলে গিলে বলল: ঠাকুর সেই এলে, আর একটু আগে এলে না কেন! শুধু বাবুরা আর বামুনেরা চাইলেই আমরা হিন্দু থাকতে পারতাম। তোমার মত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে যদি কেউ চাইত তাহলে আমরা বাপ ঠাকুর্দ্দার ধর্ম খোয়াতাম না। জাতও নষ্ট করতাম না। বুকের ভেতর থেকে উত্তরটা দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলের সঙ্গে বেরিয়ে এসে বিপুল পৃথিবীর নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

নিমাই স্তব্ধ। বিস্মিত। অভিভূত। নিজেকে তার অত্যন্ত ক্লান্ত ও

বিষণ্ণ লাগল। একটা কিছু তার ভিতরটাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিল। অনড় এক পুতুলের মত সে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বৃদ্ধ ধর্মদাসের জবানবন্দীর কোন উত্তর তার জানা নেই। বোধহয় ঐ কথার কোন উত্তর হয় না। তাই কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে। ভিতরকার অস্থিরতা আর উৎকণ্ঠাকে চাপা দেবার জন্যে বহুক্ষণ পর সে কথা বলল। হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বিষণ্ণ গলায় বলল : না ধর্মদাস তুমি ভুল করনি। এ অনুশোচনা তুমি করছ কার জন্যে? তোমাদের কে আছে? তোমরা একা, ভীষণ একা। তোমরা নিরুপায়, অসহায়। তোমার হিন্দু ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাক এটা কেউ চায়নি। অথচ মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার কোন বিকল্পও কিছু ছিল না। মুসলমান ধর্ম নিলে তোমাদের মঙ্গল হবে ভেবেইত নিয়েছ। তাহলে দুঃখ কিসের? সব ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষ সুন্দর হোক, মানুষের মঙ্গল হোক। তুমিও মুসলমান হয়ে এ রকম একটা কিছু বোঝাতে চাইছ। কিন্তু তোমাদের চাওয়ার ভাবটা একটু অন্য রকম। তাকে বোঝাব মত মানুষ দু'একজনই আছে। ধর্মদাস লম্বা শ্বাস ফেলল। উৎকণ্ঠা ভয় শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। থমথমে গলায় বলল : ঠাকুর, তোমার মত কটা মানুষ থাকলে পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত। কোন দুঃখ থাকত না।

নিমাইর চোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল। চমকেও উঠেছিল একটু। কিন্তু নিমাইর বুকের ভেতর একটা কষ্ট পাক খেয়ে খেয়ে উপরের দিকে উঠে এল। জীবনে এই ধরণের আঘাত নিমাই পায়নি কখনও।

পশ্চিম আকাশ সবে লাল হচ্ছে। আম, জাম, কাঁঠালের ডালে ডালে পাখিরা উড়ে এসে বসতে শুরু করছে।

মিয়াপুরের মসজিদে সায়াহ্নের আজান উঠল সহসা। আজানের মূর্চ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে কাহাড় পাড়ার লোকেরা সব জড় হল। আলখাল্লা পরা বৃদ্ধ মৌলভীকে অনুকরণ করে তারাও নামাজ পড়ল।

গাছের ডালে ডালে পাখিরা উড়ে এসে বসতে শুরু করেছে রাতটা কাটাবে বলে। ঠিক নামাজ পড়ার মতই মাথাটা পালকের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে মাথা গোঁজ করে বসে রইল।

নিমাই আর দাঁড়াল না। সুতীব্র একটা কষ্টে, দুঃখে, আত্মগ্লানিতে তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। স্পর্শকাতর মনটা তার সবচেয়ে বেশি কষ্ট

পাচ্ছিল। ব্রাত্য কাহারও হিন্দু। এক ধর্মের লোক, এক জাতের মানুষ, তবু এক বর্ণের সঙ্গে আর এক বর্ণের কোন স্থায়ী সম্পর্ক নেই। ধর্ম, জাত, বর্ণ এসবই একটা সংস্কার মাত্র। এই সংস্কারটা যত দিন থাকবে ততদিন বিবেকের ভেতর অবশ্য সব সাপ, বিছে অলক্ষ্যে তাদের কামড়াতে থাকবে। অন্যের পক্ষে তা কখনও জানা সম্ভব নয়। নিজের ধর্ম, নিজের মন করে করতে না পারার দুঃখ যতদিন মনে থাকবে ততদিন হিন্দুর সঙ্গে তাদের লড়াইটা শেষ হবে না। বিদ্বেষের বিষ বংশ পরম্পরায় বয়ে বেড়াবে। হিন্দুরা চিরশত্রু হয়ে থাকল তাদের।

হেঁটে চলেছে নিমাই। তার মুখ শুকনো। চুল এলোমেলো। চাউনিটা যেন লক্ষ্যহীন। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব।

পথে যেতে যেতে সাদা দাড়িওয়ালা আলখাল্লা পরা মৌলভীর মুখে ধারাল হাসিটা তাকে অপমানে বিদ্ধ করছিল। ধর্মদাসের ছেলেমানুষের মত অসহায় কান্নাটাও সে ভুলতে পারছিল না। ধর্মকে ত্যাগ করে ধর্মদাস নিজেকে বড় একা আর নিঃস্ব মনে করছিল। কোন অঙ্গ হঠাৎ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষ যে রকম পাগলের মত করে ঠিক তেমনই একটা উন্মত্ত বিহ্বলতা তাকে বড় ব্যাকুল করে রেখেছিল। ধর্মটা ধর্মদাসের সত্তার সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, ওটাকে ছিঁড়তে গেলে তাকেই খুন করা হয়, এই সত্যটাকে নিমাই মর্মে মর্মে টের পেল।

ধর্মদাস ধর্ম হারিয়ে আজ কি একা? ধর্মহীনরা মানেই কি একাকীত্ব, ও পরিজনহীনতা? অন্তত নিমাইর তাই মনে হল। উচ্চবর্ণের হিন্দুর ঔদাসীন্য নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, বৈরিতা, অন্য একবর্ণের হিন্দুর মৃত্যুর পথ করে দিচ্ছে, হিন্দুই হিন্দুর অস্তিত্ব ও বিপন্ন করছে, গোটা হিন্দু ধর্মের ধ্বংসের পথ নিয়ে যাচ্ছে—এই কথা কি তাদের একবারও উদয় হয় না।

ক্লান্ত লাগছিল নিমাইর। এক ক্রোশ পথ একটানা হেঁটেই মনে হতে লাগল এবার পড়ে যাবে। তার শরীর টলছে। অসহ্য যন্ত্রণা স্নায়ুতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মনের এই দুঃসহ যন্ত্রণার কাছে দেহের নিদারুণ যন্ত্রণা কিছুই নয়। কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর বিশ্বরূপের মুখখানা ছবির মত তার চোখের তারায় ভেসে উঠল। বিশ্বরূপের কথাগুলো তার কানের পর্দায় অশ্রুত রাগিনীর মত বাজতে লাগল। নিমাই! প্রত্যেক মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে হলে তার নিজস্ব পরিচয় তৈরী করে নিতে হয়। তার জন্য দাম যা

লাগুক। বিনা মূল্যে এ জীবনে কি আর মেলে বল? দাম দিতে ভয় পাস না। নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে কোনদিন কোন অবস্থায় আপোষ করিস না।

কেউ যদি সে বিশ্বাস কেড়ে নিতে আসে তাহলে রুখে দাঁড়াতে ভয় পাবি না। কোন মানুষকে নষ্ট করে দিতে পারে না অন্য কেউ, যদি সে নিজে না নষ্ট হয়। স্বপ্নের মধ্যে শুনছিল নিমাই, হারবি না কখনও। হেরে যাওয়া মানুষ, মানুষই নয়।

বিশ্বরূপ অন্তর্ধানের রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিমাইকে কথাগুলো বলেছিল। বিশ্বরূপের কোন কথাই সেদিন বালক নিমাই বোঝেনি। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল তার দিকে। কিন্তু কথা গুলোর চুম্বক আকর্ষণ এবং ভাল লাগার এক মুগ্ধতা তাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর সে বলল: তোমার এসব কথার মানে কি? আমি'ত এর কোন হেতুই খুঁজে পাচ্ছি না।

আবছা অন্ধকারের ভেতরেও নিমাই বিশ্বরূপের হাসি হাসি মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল। বিশ্বরূপ শান্ত। বার দুই ঢোক গিলে গম্ভীর গলায় বলল: বড় হলে সব টের পাবি।

নিমাই খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। বলল: তার মানেটা কি?

বিশ্বরূপ একটু হেসে বলল: কিছু নয়। তোমার কিছু করার নেই। পরিবেশই করে নেবে। মানুষের অবতারী অন্য গ্রহ থেকে আসে না, পরিবেশ থেকে উঠে আসে। সেই পরিবেশটা খোলা চোখে দেখ এবং জান।

নিমাই মৃদু একটু হেসে বলল: তোমার কথাগুলো এত সহজ যে ভিতরে গিয়ে টনটন করে লাগে।

বিশ্বরূপ খুব সহজ ভাবে বলল: নিমাই আমরা যে পরিবেশে বাস করি সেটা মানুষের সমাজ নয়। জঙ্গলের বলতেও লজ্জা হয়। এখানে ধর্ম নেই, সত্য নেই, বিবেক নেই, বিচার মনুষ্যত্ব কিছু নেই। এই সেই সমাজের বাসিন্দা আমরা। এই অচল অনড় সমাজের মধ্যে থেকে আচার্য অদ্বৈত এর পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তা যে কোনদিন আর সম্ভব হয়ে উঠবে না বুঝতে পারলাম হরিদাসের লাঞ্ছনা, নিগ্রহ আর নির্বাসনের দণ্ড দেখে। আমি পরাজয় মেনে নিয়েছি। পালিয়ে যাব এই সমাজ থেকে। সমাজের বাইরে গিয়ে নিজের সত্তাটুকু আঁকড়ে বাঁচা নয়, এক মহান আদর্শে বড় হয়ে বাঁচার পরিবেশ যদি কোনদিন করতে পারি সেদিন বিজয়ীর মত নবদ্বীপে

ফিরব।

বুঝতে না পারার সেই গহণ বিষণ্ণতার মধ্যেও সত্যিকারের একটু আনন্দ অস্ফুট হয়ে ফুটল নিমাইর অধরে। সস্নেহে বিশ্বরূপের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু মাথাও নাড়ল। তারপর প্রশ্ন করল: দাদা হরিদাসের কি হয়েছিল?

বিশ্বরূপ আচ্ছন্ন গলায় বলল: সে একটা গল্প। আমাদের দানবীয় সমাজের নিষ্ঠুর বলি। তবু এই সমাজের উপর তার কোন বিদ্রোহ নেই। হিন্দু ধর্ম এবং দেব-দ্বিজের উপর তার কোন রাগ নেই। অসীম তার সহিষ্ণুতা। মানুষের সমাজের মধ্যে থেকে সে বাঞ্ছিত সুফল আনবে। এই বিশ্বাস নিয়ে সে সমাজের মানুষকে সুন্দর করার এক ব্রত নিয়েছে। যারা এই সমাজকে নোংবা করেছে, বিষিয়ে তুলেছে তাদের সব বিষটুকু সে পান করেছে অমৃত পাওয়ার লোভে।

বিশ্বরূপের ঐ সব কথায় নিমাইর মন ছিল না। হরিদাসের গল্প শোনার জন্যে তার ভেতরটা আকুল হয়েছিল। আস্তে আস্তে অস্ফুট গলায় বলল: তুমি হরিদাসের গল্প বল।

হরিদাসের সেই জীবনবৃত্তান্ত নিমাইর মনে উদয় হল। পথে অবাধে বিস্তার লাভ করল মনে।

যশোহর জেলার বুড়ন গ্রামের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে হরিদাস। পিতা সুমতি ঠাকুর, মাতা গৌরী দেবী। জন্মের অল্পকাল পরেই মাকে হারাল সে। অসহায় দুগ্ধ পোষ্য হতভাগ্য শিশু যাতে শ্রীহরির করুণা ও কৃপায় সর্ব বিপন্মুক্ত হতে পারে সেজন্য সুমতিঠাকুর তাকে গৃহ দেবতা শ্রীহরির পদে সমর্পণ করে নামকরণ করলেন হরিদাস।

কিন্তু হরিদাস বড় দুর্ভাগা। কিছুদিন পর পিতাও তার মায়া কাটাল। তার আপন জন বলতে আর কেউ রইল না। সে একা। দুঃখী। অসহায়। স্বজনহীন। পরিচর্যা এবং প্রতিপালন করার মানুষ পর্যন্ত নেই।

অবশেষে, শ্রীহরির কৃপায় একজন দয়ালু মানুষ তাকে কোলে তুলে নিল। কিন্তু সে হরিদাসের কেউ নয়। তার জাতের লোকও নয়, ধর্মেরও নয়। সে এক বিধর্মী দয়ালু মুসলমান। আম্বুয়ার অধিকারী মলয় কাজী। হরিদাস মুসলমানের অন্ন জল গ্রহণ করলে হরিদাস আর হিন্দু থাকতে পারে না এটা জেনেও কোন হিন্দু প্রতিবেশী হরিদাসকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল না। এমন

কি তল্লাটের জমিদারও নিঃসহায় শিশুর পাশে দাঁড়াল না। শেষ সহায় হল না। কিন্তু অসহায় শিশু হরিদাসের হিন্দুত্ব নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে জোর তর্ক চলল। বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু সে তর্ক মানুষের কুসংস্কার, বিশ্বাস, লোকাচার প্রথাকে ঘিরে। এই জীবনে হরিদাসের হিন্দু ধর্মে ফেরার আর পথ ছিল না কোন।

হরিদাস যত বড় হতে লাগল ততই তার ভেতর কোথায় যেন একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল। নিশিদিন তন্ময় হয়ে কি ভাবে। আর দূরে হিন্দু মন্দিরের চুড়োর দিকে চেয়ে কেমন যেন আনমনা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে দূরে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলে, শ্রীহরি আমাকে তুমি এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছ। একদিকে আমার ধর্ম, অন্যদিকে আমার কৃতজ্ঞতা আমাকে দোটানায় ফেলেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। ধর্ম আমাকে তোমার দিকে টানছে আর কৃতজ্ঞতা বিধর্মী পালিতা পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যে আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ঠাকুর তুমি আমায় পথ বলে দাও। তোমাকে আমার সেবার অধিকার দাও। তোমাতে আমার মতি হোক।

অর্ধচেতন অবস্থার মধ্যে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল: মানুষের জীবন মানুষকে কোথায় না কোথায় নিয়ে যায়। রাজাকে ভিখারী করে, ভিখারীকে রাজা। যোগীকে ভোগী করে, ভোগীকে করে যোগী। এই'ত জীবন। জীবনের সঙ্গে, এই জীবনের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে তার নতুন জীবনের সূচনা।

হরিদাসও তার নতুন জীবন সুরু করল। কিন্তু তার আগের ঘটনা বড় অদ্ভুত। নিমাইর স্মৃতি তোলপাড় হল। কল্পনায় লোক মুখে শোনা সেই গল্পের এক জীবন্ত দৃশ্য সে দেখতে লাগল।

হরিদাস নিস্পন্দ মূর্তির মত বসে আছে। দু'চোখ বোজা। গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেছে তার কোন হুঁশ নেই।

কাজী কোথাও তাকে পেল না। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে মন্দির যাওয়ার রাস্তার ধারে তাকে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে দেখল। খুব অবাক হল কাজী। মুগ্ধ চোখে বেশ কিছুক্ষণ দৃশ্যটা দেখল। কিছুক্ষণ বোধ হয় সে মানুষ ছিল না। পাথর হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই তার বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল। চেতনার ভেতর সত্তার ভেতর ইসলাম ধর্মের উদারতা, মহানুভবতা,

সাম্য মৈত্রী ও করুণার এক পবিত্র অনুভূতি জন্মাল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মনে মনে সে কয়েকবার আল্লাহকে স্মরণ করল। নিজেকে তার একজন সেবক ভাবল। সে আর হিন্দু নয়। দপ করে রক্তের মধ্যে জ্বলে উঠল প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষের আগুণ। বিরক্তিতে ঘৃনায় ক্রোধে ভেতরটা অশান্ত হল। একটু উত্তেজিতও হল।

মলয় কাজীর চার চৌকো মুখখানা নির্দয় দেখাল। ক্রোধে দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে জমা হল। কয়েক পা এগিয়ে এসে হরিদাসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকল : হরিদাস। উত্তর না পেয়ে তার কণ্ঠস্বর আরো উচ্চ গ্রামে উঠল—হরিদাস! এবার বাজখাঁই গলায় ডাকল : হরিদাস।

হরিদাসের নিথর স্তব্ধতা তাতেও ভঙ্গ হল না। মলয় কাজীর বুকের ভেতবটা কেঁপে উঠল। হঠাৎ নিদারুণ একটা হীনমন্যতায় আর অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চিত্ত। একটা অপরাধ বোধে তার চোখ ছলছল করে উঠল। দু'হাতে কাজী বালক হরিদাসের মুখখানা নিজের মুখের খুব কাছে তুলে ধরল। স্নেহ মায়ায় কাঁপতে কাঁপতে জ্বর গ্রস্ত রোগীর মত ডাকল : হরিদাস। আমাব হরিদাস।

স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল হরিদাস। অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর তার দুই চোখে। মুখে স্নিগ্ধ হাসিব লাবণ্য। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগার চমকানো বিস্ময়ে হরিদাস গদ গদ স্বরে ডাকল : বাপজান।

হরিদাস। মলয় কাজীর বুকের স্নেহের সমুদ্র উথলে উঠল। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় তাব বুকের ভেতরটা কাঁপছিল। আর্ত গলায় বলল : এ তুমি কার ধ্যান করছিলে বাপ?

হরিদাসের মুখে চোখে এক অপার্থিব মুগ্ধতা নামল। ঝকঝকে হাসি হেসে বলল : আমার হরির। তাঁর দাস যে আমি।

ছিঃ! তুমি আর হিন্দু নও। হিন্দুর ঠাকুরকে ধ্যান করার কোন অধিকার নেই। মলয় কাজীর মৃদু স্বরে ভৎর্সনা থমথম করে উঠল।

একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতায় ভিতব থেকে হরিদাস হাসল। মৃদু কণ্ঠে বলল : বাপজান। ধর্ম কোন বাহ্য আচরণ নয়, মনের ব্যাপার। ঝড়ে গাছ ছিন্ন মূল হতে পারে কিন্তু মাটির গভীরে তার মূল থেকে যায় ঠিকই। হাজার খোঁড়া খুঁড়িতেও তাকে একেবারে তুলে ফেলা যায় না। ধর্ম ব্যাপারটা

তেমনি রক্ত সংস্কার এবং মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে লেগে আছে। ধর্ম কোন ঠুনকো জিনিস নয়। ছোঁয়া ছুঁয়িতেও নষ্ট হয় না। ধর্মের গোঁড়ামিতে যারা ভোগে এই শুচিবায়ু গ্রস্ততা তাদেরই। ধর্ম মানুষেব মধ্যে দেয়াল তুলে দিয়েছে। ধর্মের গোঁড়ামি মানুষকে সংকীর্ণ করেছে। তাকে মানুষ হয়ে উঠতে দেয় নি। এই ক্ষোভ মহাপ্রাণ কবীরের প্রাণেও ছিল।

তুর্কের মসজিদে খুদা, হিন্দুর মন্দিরে রাম রন অহরহ ;
মন্দির মসজিদ যেথা কিছু নাই, সেথা কার আধিপত্য কহ !

হরিদাসের ভাবপ্রবণতা মলয় কাজীকে বিব্রত করে। একটু ভয়ও করে তার, ভুরু কুঞ্চিত ও সটান হয়। ভেতরের এক অফুরন্ত কৌতূহলই তাকে ঐ ভয়ের মুখে এক ধরনের সাহস দিল। মৃদু মাথা নাড়িয়ে বলল : ওরা, আর তুমি এক নও।

হরিদাস সরল চোখে অবাধ বিস্ময় নিয়ে মলয় কাজীর দিকে চেয়ে বলল : বাপজান সুফী শাহ লতিফের গানটা ফকিরদের মুখে শুনতে শুনতে মুখস্ত হয়ে গেছে।

নামাজ রোজা হাঁ—
নিশ্চয়ই তারও মূল্য আছে
কিন্তু অন্য বর্তিকাও যে আছে
তার আলোতে আমি প্রিয়তমকে দেখি—
সে আলো প্রেমের আলো।

আমার শ্রীহরি সেই প্রেমের আলো বহন করে এনেছে ভুবনে। তিনি বিভেদ জানেন না, জাত মানেন না। তিনি কোন সম্প্রদায়ের নয়, তিনি সকল মানুষের প্রাণ, আত্মার আত্মা। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান নেই। সকলকে মানুষের অধিকাব নিয়ে এক হয়ে বাঁচতে শেখানোর আর এক নাম প্রেম। প্রেমের বন্ধনে মানুষ ধার্মিক হয়ে উঠে। আমার শ্রীহরির প্রেম মানুষকে সুন্দর করে, মহান করে। সব ধর্মের স্থায়ী পরিচয় হল এটা।

মলয় কাজী এ কথায় বিরক্ত হল। ভীষণ ভয় পেল। হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। ভয় ও আতঙ্কে তার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পেল। বলল : ওরে নির্বোধ, ও কথা বলতে নেই। এ কথা কাজীর কানে গেলে আর রক্ষে নেই। একে মা মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ। লোকটার হিন্দুয়ানি দেখলে

নির্দয়, নিষ্ঠুর হতেও ইতস্তত করে না। তোরও প্রাণ যাবে। আমারও কাজিগিরি শেষ হবে।

কথাটা চাপা থাকেনি। হরিদাসের হরি ভক্তির আধিক্য দিন দিন বৃদ্ধি পেল। মলয় কাজী কাজিগিরি বিপন্ন হওয়ার ভয়ে, আশংকায় বড় কাজী গোরাই কাজীকে হরিদাসের কৃষ্ণ ভক্তির কথা জানাল।

হরিদাসের কোন ভয় নেই। কৃষ্ণ নামে সে বিভোর। মলয় কাজীর অন্ন জল আর স্পর্শ করে না। ভিক্ষা করে খায়, আর গাছ তলায় শোয়।

সব কথা শুনে গোরাই কাজী ক্রোধে জ্বলে উঠল। সেপাই পাঠিয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

হরিদাসের নামে গোরাই কাজীর ভেতরটা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে যাচ্ছিল। তাকে দেখা মাত্র রাগে শরীর রি-রি করে উঠল। কিন্তু হরিদাসের কোন ভাবান্তর নেই। কাজীর দিকে নির্বিকার ভাবে, নির্ভয়ে নিরীহের মত চেয়ে রইল। হরিদাসের দুই চোখে বিভোর বিহ্বলতা। গোড়াই কাজীর অবাক লাগল। স্তব্ধ বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। গোরাই কাজীর ভেতরটা তেতে উঠল। বারংবার মনে হতে লাগল, সে কাজী। ধর্মের রক্ষক। ধর্মের প্রতি কারো কোন রূপ আনুগত্যহীনতা সে সহ্য করবে না। কাজীর মুখে ধীরে ধীরে একটা কঠোরতা ফুটল। গম্ভীর গলায় বলল ঃ হরিদাস, তুমিত অবুঝ নও। কেন বুঝছ না তুমি আর হিন্দুয়ানির বিলাসিতা তোমাকে মানায় না। তোমার অতীতকে এত সহজে ভুলে গেলে।

পিতা মাতাহীন এক নিরাশ্রয় নিঃসম্বল হিন্দু শিশুকে দেখাশোনার ভার কোন হিন্দু নেয়নি। তোমার দুর্দ্দিনের বন্ধু এবং আশ্রয় এক দয়ালু মুসলমান। তার সেবায় পরিচর্যায় তুমি বড় হয়েছ। পৃথিবীর আলো দেখেছ। যে মুসলমানের অন্ন জলে আশ্রয়ে তুমি মানুষ, সেই উদার মুসলমান ধর্মের প্রতি তোমার অবহেলাকে আমি বরদাস্ত করব না। তোমার মধ্যে সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধও যদি থাকত তাহলে তুমি এসব কাজ করতে না। অথচ, তুমি ভাল করে জান, হিন্দু আর কোনদিন তাদের সামনে তোমাকে ফিরিয়ে নেবে না। তোমাকে কোন হিন্দুরা আশ্রয় দেবে না। এসব জেনেও হিন্দুধর্মের করুণা ভিক্ষা করতে তোমার লজ্জা হল না? আশ্চর্য তোমার কৃতজ্ঞতাবোধ।

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে গোরাই কাজী পুনরায় ভৎ'সনা করে বলল : কথা বলছ না কেন? হিন্দু ধর্ম রক্ষণশীল। তাদের ধর্মে বেরোনোর পথ খোলা। কিন্তু ঢোকার পথ বন্ধ। যে দরজা তোমার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে, আর তা তোমার প্রবেশের জন্যে কোন হিন্দুই খুলে দেবে না। মুসলমান ধর্মের উদারতা হিন্দু ধর্মে কোথায়? তুমি যাই কর, আর ভাব, মুসলমান ধর্মই তোমার গতি, তোমার আশ্রয়, তোমার শেষ অবলম্বন।

হরিদাস নীরবে সব শুনে হাসল। মৃদু স্নিগ্ধ সে হাসি। বলল : মহামান্য কাজী! অধীনের ধারণা, ধর্ম কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ধর্ম কতকগুলো বাহ্য আচরণ নয়। ধর্ম হল মনের ব্যাপার। ধর্মকে ধরে রাখার জন্যে মানসিক শক্তি, অচল বিশ্বাস আর ভক্তি চাই।

কাজীর অধরে ক্রুর হাসি ঝলকে উঠল। অধর যুগল কেঁপে উঠল। দুই ভুরুর মধ্যে কুঁচকে গেল। চোখের দৃষ্টি ঘাতকের মত নিষ্ঠুর হল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর মাথা নেড়ে বলল : তাই বুঝি। একটু থেমে থমথমে গম্ভীর গলায় বলল : বেশ তোমার অচলা ভক্তি আর বিশ্বাসকে পরখ করে দেখার জন্যে বাইশ বাজারে বাইশ ঘা করে বেত মারা হবে তোমাকে। কাজীর রাজ্যে হিন্দুয়ানি করার ভয়ংকর শাস্তি দেখে লোকেও কিছু শিখতে পারবে।

শুরু হল কাজীর নির্দয় প্রহার। সাধারণত তিন-চার বাজারে প্রহৃত হলে মানুষ মারা যায়। কিন্তু হরিদাসের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। পিঠে যত বেত্রাঘাত পড়ে ততই উচ্চৈস্বরে হরিনাম কীর্তন করে। প্রহারের যন্ত্রণা আর আর্তিকে হরিনামের মধ্যে নিঃশেষে টেনে দিয়ে সে তার বিশ্বাসের শক্তি আহরণ করে। আর তাতেই সে বেঁচে উঠে।

নিমাই হাঁটছিল নিস্তব্ধ পল্লীর ধুলো বালি ভরা পথ দিয়ে। মিহি ধূলোর গুঁড়োয় ভরে গিয়েছিল তার পা দুখানি। একটু একটু করে আঁধারে মলিন হল চরাচর। নিমাইকে অন্ধকারে কেমন ভূতুরে অচেনা দেখাচ্ছিল।

মাথার উপর চৈত্রের নীল আকাশ ধু ধু করছে। পূর্বদিকে শুধু একটা সন্ধ্যা তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় গোটা আকাশটাকে নরম উজ্জ্বলতায় ভরে দিয়েছে। ধ্রুবতারা চিরদিন পথ-ভোলা পথিককে পথ দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু নিমাইর পথের নির্দ্দেশ ঐ উজ্জ্বল তারার কাছে নেই বলে চলতে চলতে মনে হল নিমাইর। জীবনে এমন

দিশেহারা কখনও বোধ করেনি আগে।

হরিদাসের প্রহার দৃশ্যের কাল্পনিক ছবি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তার যন্ত্রণাকাতর মুখ, বেদনাময় চোখ দুটোর কষ্টের আর্ত্তি নিমাই কল্পনেত্রে দেখতে পাচ্ছিল। তার সেই কান্না থরো থরো মূর্তি, নিমাইর চোখ দুটো জলে ভরে ছিল। বিষণ্ণ হয়ে উঠল নিমাইর মুখখানা। নিজের মনের ভেতর ডুবে গিয়ে শুনতে পেল হরিদাসের যন্ত্রণামথিত মৃদু আর্ত্তস্বর। তোমাদের মারেই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমি মরব না, নতুন করে বেঁচে উঠব।

নিমাইর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। বিশৃঙ্খল হয়ে গেল তার চেতনা। পথে যেতে যেতে সহস্রবার উচ্চারণ করল ঃ হরিদাস জীবনে বাঁচার মানেটা তুমি নিজে আবিষ্কার করেছো সাহসের সঙ্গে। মনের সাহসটাই সাহস। সেই সাহস আজকে আমরা হারিয়ে বসে আছি। তাই প্রতিদিন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশব্দে মরছি। সে মৃত্যুর জন্যে কান্না নেই, অনুশোচনা নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। কি সুন্দর মৃত্যু। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে নিমাই বাড়ী এসে পৌঁছল।

তার পায়ের শব্দ পেয়ে লক্ষ্মী ফিরে তাকাল উঠোনের দিকে। নিমাইকে দেখা মাত্র সে কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ফুলে ফুলে!

নিমাই নিজের ঘরে যেতে যেতে বলল ঃ তোমরা শুধু কাঁদতে পার নয়, কাঁদতে ভালোবাস। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য!

লক্ষ্মী এমনিতে উৎকণ্ঠায় ভুগছিল। নিমাইর এভাবে বলাটা তার মনে ভীষণ বাজল। কিছুক্ষণ জল ভরা চোখে তার চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকল। তারপর শ্লথ পায়ে মাটি মাড়িয়ে তার পিছু পিছু ঘরে ঢুকল। দরজার কাছে পৌঁছিয়ে আগে সেটা ভাল করে ভেজিয়ে দিল। তারপর তিক্ত গলায় বলল ঃ তুমি কেমন ধরণের মানুষ বলত? সারাদিন কোথায় থাক কি কর, কিছু বলে যাওয়া গরজ বোধ কর না? দুটো মানুষ যে পথের দিকে চোখ পেতে এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে সে কথাটাও একবার মনে হয় না। আমাদের তোমরা মানুষ মনে কর না? মেয়েমানুষ বলেই এত তাচ্ছিল্য আর অবহেলা?

নিমাই চুপ করে থাকল।

অভিমানে লক্ষ্মীর গলা ভারী হয়ে গেল। বলল ঃ নিজেকে নিয়ে তুমি মশগুল থাক সব সময়। আমাদের কথা ভাবার সময় কোথায়? স্বার্থপর,

নিষ্ঠুর, লক্ষ্মী নিজেকে আর সংবরণ করতে পারল না। মুখে আঁচল চেপে সে কাঁদতে লাগল। মাঝে মাঝে হিক্কার মত একটা শব্দ হতে লাগল।

নিমাইর বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। চকিতে সে মুখ ফেরাল। বলল : লক্ষ্মী! তারপর একটু থেমে নিজের হৃদয়বেগ সংবরণ করল। গম্ভীর গলায় বলল : আমার মন ভালো নেই, এমন করে আমার সঙ্গে কথা বল. না। মেয়েদের ভালবাসা এক ধরণের স্বার্থপরতা!

তীর ছোঁড়া ধনুকের মত কেঁপে উঠল লক্ষ্মী। হতবাক হয়ে নিমাইর চোখের দিকে জলভরা চোখে চেয়ে রইল। কাঁপা গলায় বলল : তুমি এমন বলতে পারলে আমাকে! ছিঃ ছিঃ! আমার মনটা কিছু নয়?

নিমাই একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। লক্ষ্মীর কথায় মনটা তার খারাপ হয়ে বিষণ্ণ হেসে বলল : না। লক্ষ্মী না। আমার প্রাণে আছে অনেক ভালবাসা। ভালবাসায় আমার প্রাণ ভরপুর। কিন্তু সব ভালবাসাকে তোমার নিজের সম্পদ আর সাম্রাজ্য মনে করেই দুঃখ পাচ্ছ। সব স্ত্রীই স্বামীর ভালবাসাকে নিজের ধন মনে করে। কিন্তু এটা পুরুষের জীবনে মস্ত বড় পিছুটান।

কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্মী বলল : আমি'ত তোমাকে বেঁধে রাখিনি।

নিমাই হাসল। বলল : এ তোমার অভিমানের কথা। আমারও ভাল লাগে তোমার শরীরের সুগন্ধ নিতে. তোমাকে আদর করতে, অনাবৃত করে দেখতে, তোমার চোখের অতল গভীরে চেয়ে ডুবে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এক একজন মানুষকে জীবনের এই চৌহদ্দীতে আঁটে না। জীবন অনেক বড়। তোমার আমার দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে সবটুকু ধরে না। এর বাইরেও জগৎ আছে, জীবন আছে। তার প্রতিও আমার ভালবাসা রয়েছে, সব মানুষই দেশকে দেশের মানুষ জন, দেশের আকাশ, বাতাস, গাছপালা, নদী, পাহাড় ধুলোর গন্ধ, প্রকৃতির রঙ, পাখির গান, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সব ভালবাসে।

পুরুষের ভালোবাসা একটা মেয়ের মধ্যে আঁটে না। উপছে যায় অন্য মানুষের দিকে। যেমন তোমাকে পূর্ণ করে আমি উপছে যাচ্ছি আমার দেশের মানুষের ভেতর। আজ আমার যা কিছু উৎকণ্ঠা, দুঃখ, বেদনা, উত্তেজনা, আবেগ সব দেশের মন্দ থাকা মানুষদের ঘিরে। সে জন্যে তুমি যদি আমাকে নিষ্ঠুর ভাব, স্বার্থপর মনে কর তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

লক্ষ্মীর দুই চোখে বিস্ময়। কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। কান্না

তার চোখ দিয়ে গলে গলে পড়তে লাগল। কেঁদে কেঁদে বলল: তোমার বড় কথা, বড় ভাব আমি বুঝি না। নিজেকে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পার। কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকব? আমার কি রইল?

নিমাই লক্ষ্মীর কাঁধে হাত রাখল। তাকে দু'হাতে বুকের খুব কাছে টেনে নিল, মাথার উপর তার সুন্দর মুখখানা আলতো ভাবে রাখল। নিরুচ্চারে বলল: লক্ষ্মী। নিজের স্বাধীনতা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হয় এই কথাটা একদিন তোমার কাছেই শিখেছিলাম। নিজের জীবনে তোমাকে বিয়ে করে তার প্রমাণও দিয়েছি। মায়ের অনিচ্ছার সঙ্গে লড়াই করে তোমাকে জিতে এনেছি। তোমাকে জয় করার যে কি গভীর গর্ব আর আনন্দ আমার সে আমি জানি। তুমিও গর্বিত। সে জন্যে আমাকে ভীষণ শ্রদ্ধা কর। এই শ্রদ্ধা, সম্মান আর ভালবাসা দিয়ে মানুষের সমস্ত সম্পর্কের ভিত গড়ে উঠে। দুর্ভাগ্য আমাদের দেশে যারা চিরদিন ভাল মানুষ, বোকা, বঞ্চিত, সর্বহারা, লুন্ঠিত, তারা অবহেলা অসম্মান, ঘৃণার পাত্র হয়ে আছে। হিন্দু ধর্মের রক্ষকেরা তিল তিল করে তাদের ধর্মচ্যুত হওয়ার পথে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ হিন্দু ধর্মের এরাই ভিত। এদের শক্তি, সামর্থ, কর্তব্য, সেবা, পরিশ্রমের উপর দাঁড়িয়ে আছে গোটা সমাজ ব্যবস্থা। মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থপরতায় এদের জীবনের ভিতরটা আজ নড়বড়ে হয়ে গেছে। পুরো হিন্দু ধর্ম আজ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু ক'জন সেটা চিন্তা করে? দলে দলে কত মানুষ হিন্দুধর্ম ছাড়ল, তবু হিন্দু ধর্ম রক্ষকদের টনক নড়ল না। প্রতিক্রিয়া ঘটল না। তারা নিশ্চিন্তে ঘরের কোণায় বসে আছে। দায় দায়িত্বটা যেন কারোর নয়। তুমি বল, হিন্দু হয়ে এইভাবে হিন্দুর ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরে যাওয়া আর মরতে দেখা কারো ভাল লাগে? এ যে কত কষ্টের বোঝাতে পারব না।

শুনতে শুনতে লক্ষ্মীর বুকের ভেতরটা মোমের মত গলে যেতে লাগল। মনে হচ্ছিল, নিমাইর কাছে তার অপরাধ রাখার জায়গা নেই। একটা দুর্বোধ্য কষ্টে, দুঃখে, অনুতাপে তার বুকটা টাটাচ্ছিল। মনে মনে বলল: আমি মূর্খ নারী। কি বলতে কি বলেছি। অন্যায় যা করার আমিই করেছি। তুমি আমাব সুখ, আমার দুঃখ, আমার জীবন-মরণ, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব। কিন্তু কথাগুলো মুখে চেষ্টা করেও উচ্চারণ করতে পারল না। ভয়ে তার গা ছমছম করল।

লক্ষ্মী সম্মোহিতের মত নিমাইর কোমড় জড়িয়ে ধরে খাটে গিয়ে বসাল। তারপর দু'হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরল তার মুখের খুব কাছে। আস্তে আস্তে তার মুখখানা নেমে এল নিমাইর মুখের উপর। নিমাইর ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। চুমু খাওয়ার জন্যে নয়। নিমাইকে আঘাত করার সব দুঃখ, ব্যথা আর কষ্টটাকে নিঃশেষে শুষে নেয়ার জন্যে।

কয়েকদিন পরে বিশ্বম্ভর সম্পর্কে নানাবিধ ভাবনা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রইল। বলতে কি বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিত্ব, চরিত্রগুণ, আদর্শ এবং কার্যকলাপ নিয়ে বিবিধ বিশ্লেষণে এবং গবেষণায় তার দিনটা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল নিজেও ভেবে পেল না। ভাবনায় যেন শেষ নেই। বিশ্বম্ভরকে নিয়ে যত মাথা ঘামায় তত বিস্ময় বাড়ে, ততই আশ্চর্য হয়।

বিশ্বম্ভরের কোন কাজটা আশ্চর্যের নয়। ভাবতে গেলে থৈ পায় না অদ্বৈতাচার্য। বাল্য থেকে কোন গুণে বিশ্বম্ভর লোকের অন্তর-বাইরে নাড়া দিল? তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বিন্দু কোথায়? এসব প্রশ্ন নিরন্তর আকুল করল তাকে। অদ্বৈতের বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা-কোন মহান আদর্শের আলো পড়ে সে এত বড় হয়ে উঠল? সবার সামনে বড় হবার এই অপূর্ব সুযোগ সে কোথা থেকে কেমন ভাবে পেল? কে দিল? নিমাই লোকের চোখে সাধক পুরুষ। সার্থকতা নিয়েই যেন জন্মগ্রহণ করেছে সে। সকলকে সে জয় করছে, বশ কবছে, তাদের চিত্ত উদ্ভাসিত করছে। অন্তর্নিহিত এক বিপুল শক্তিতেই সে মহামানব। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অদ্বৈতাচার্যের চিত্ত আপ্লুত হল।

অদ্বৈতের বিস্ময় বিস্ফারিত দুই চোখের তারায় বিশ্বম্ভরের মুখ। সে কল্পনায় বিশ্বম্ভরকে দেখতে লাগল! আর যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে বড় হয়েছে, যে সব মানুষের মধ্যে সে বাস করছে তাদের ভীড়ের ভেতর বিশ্বম্ভরকে খুঁজল। বিশ্বম্ভরের সব কাজ তার অদ্ভুত লাগে। সে সাধারণ মানুষ সন্তান নয়। কালপ্রেরিত মানব মুক্তির দূত। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সে আত্মপ্রতিষ্ঠার হাসি প্রস্তুত করছে। সর্ববিষয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার অদম্য ঝোঁক বিশ্বম্ভরের বাল্য থেকে। কি খেলা; কি দুষ্টুমিতে; কি পড়াশুনায়, কি তর্কে-বিতর্কে তার কোন জুড়ি ছিল না। বন্ধুদের মধ্যেও ছিল তার শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। নেতৃত্বের প্রাধান্য। ছোট্ট একটা ঘটনা তার চোখের উপর

ভেসে উঠল।

পৌষ মাস।

দুপুর বেলা।

শীতের ঝকঝকে রোদে পিঠ দিয়ে ছেলে বুড়ো সবাই গা সেঁকে নিচ্ছে।

অদ্বৈত পুঁথি বগলে করে গুটি গুটি বাড়ী ফিরছিল।

বালকেরা পথে নবজাতক হৃষ্টপুষ্ট একটি কুকুর শাবক নিয়ে নানারকম রঙ্গ করছিল। বিশ্বম্ভরকে অদ্বৈত দেখল তাদের মধ্যে। হঠাৎ কুকুর শাবকের উপর অধিকার ও দাবি নিয়ে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সঙ্গীদের কয়জনের হাতাহাতি হওয়ায় উপক্রম। বিশ্বম্ভর দেবে না, সঙ্গীরাও ছাড়বে না। বচসা আরম্ভ হল! গঙ্গাধর বিশ্বম্ভরের হাত থেকে কুকুর শাবকটি নেবার জন্যে হাত বাড়াল। কতবার তাকে ধরতে চেষ্টা করল, বিশ্বম্ভর বাঁ হাত দিয়ে ততই ঠেলে ঠেলে দিতে লাগল। বিশ্বম্ভর লম্বা, স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী। গঙ্গাধর পেরে উঠবে কেন? বাঁধা পেয়ে গঙ্গাধরের ছিনিয়ে নেবার জেদ প্রবল হল। ফলে ঠেলাঠেলি সুরু হল।

অদ্বৈত থমকে দাঁড়াল। সামান্য জিনিষের অধিকার ও দাবি নিয়ে বালকেরা নিজেদের ভেতর ঝগড়া করে আবার তা মেটায়। কখনও কখনও তা নিয়ে হাতাহাতি, মারামারি হয়। একটা খণ্ড যুদ্ধও হয় দু'জনের ভেতর। অদ্বৈত সেরকম কিছু আশংকা করে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে বালক বিশ্বম্ভর এবং তার সঙ্গীদের কাণ্ড দেখতে লাগল। বিবাদের পরিণতি কি হয় তাই দেখার কৌতূহল জাগল তার। অবস্থা সেরকম হলে বিবাদমান দুই দলের মধ্যস্থ হয়ে বিরোধ মেটানোর মত কোন বয়স্ক ব্যক্তি কাছেপিঠে ছিল না। তাই দাঁড়িয়ে যাওয়া কর্তব্য মনে করল।

বালকদের এরকম তুচ্ছ বিবাদ অনেক কাল দেখেনি অদ্বৈত। শীতের রোদে দাঁড়িয়ে তার নির্মল মজা উপভোগ করতে ভীষণ ভাল লাগছিল তার। বিবাদময় বালকেরা দুই দলে বিভক্ত। বিশ্বম্ভরের একটি দল, অন্য দলটি মুরারীর। বিশ্বম্ভরের দলে ছেলের সংখ্যা বেশি। মুরারীর পক্ষে শুধু গদাধর।

বিশ্বম্ভর কুকুর শাবকটি এক হাতে উচুঁতে তুলে ধরে গঙ্গাধরকে নিবৃত্ত করছিল। বিশ্বম্ভরের উচ্চতা সকলের অধিক। তার হাত দুটিও বেশ দীর্ঘ। গঙ্গাধর নাগাল পাচ্ছিল না। লম্প ঝম্প করে সে বিশ্বম্ভরের হাত থেকে শাবকটি কেড়ে নেয়ার যত চেষ্টা করে বিশ্বম্ভর ততই সামাল দেবার জন্যে

তাকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিল। মুরারী তার হাত ধরে ঝুলে পড়ল। কিন্তু বিশ্বম্ভরের দৈহিক শক্তির কাছে কোন জোর-জবরদস্তি খাটল না। বিশ্বম্ভর এটাকে খেলার মতই নিল। তাদের রকম-সকম দেখে খিল খিল করে সে হাসতে লাগল। বিশ্বম্ভরের হাসিতে ক্ষিপ্ত হয়ে সাথীরা তাকে দু'একটা কিল চড় মারল।

মুরারী'ত রেগে গিয়ে তাকে রীতিমত শাসাল। বলল: ভাল হবে না বলছি নিমাই। ভালয় ভালয় বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দাও। নইলে, একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে। ওটাকে আমি পুষব বলে, আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি।

বিশ্বম্ভর কিন্তু চটল না। দুই চোখে তার কৌতুক মুখে মধুর হাসি। বলল, তুমি কবে কি ভেবেছ আমার জানা নেই। কিন্তু সকলের সামনে আমি তাকে প্রথম কোলে নিয়েছি। সুতরাং অধিকার আমার হওয়া উচিত। দেবদত্ত ও সিদ্ধার্থের রাজহংসের গল্পেও কিন্তু সেই কথাই বলে।

মোটেই না। বহু আগে থেকেই ওটা আমার। ওর উপর তোমার কোন অধিকার মানব না। আমি ওকে পুষব।

পুষে কি হবে?

বাড়ী পাহাড়া দেবে।

বেচারা কৃষ্ণের জীব। ছিল স্বাধীন আর মুক্ত, তোমার হাতে পড়ে হবে পরাধীন আর বন্দী। চমৎকার। যে স্বাধীনতা তুমি দিতে পারনা, তাকে কেড়ে নেবারও তোমার কোন অধিকার নেই।

মুরারী গণগণে রাগ নিয়ে ফুঁসে উঠল। বলল: তোমার সব বড় বড় কথা। ও সব কথার জবাব দেবার মত বিদ্যে আমার নেই। কিন্তু তুমি কুকুর ছানাটাকে নিলে কেন?

গদাধর চোখ গোল করে নিমাইর দিকে তাকিয়ে বলল: সবাই পেতে চায়। তুমিও চাইছ। পাওয়াটাই মানুষের অভ্যাস। না পেলে বরং খারাপ লাগে।

নিমাই চটল না। রাগও করল না। অধরে তার মধুমাখা হাসি। বলল: এমন সুন্দর একটা ছানাকে আমার বলে দাবি করব না। এই ছানা আমাদের সকলের। আমরা সকলে ওর খেলার সঙ্গী। ও থাকবে ওর মায়ের কাছে, একেবারে মুক্ত আর স্বাধীনভাবে।

কথাটাই বলে নিমা একটু থামল। ভারী সুন্দর দেখাল তাকে। হাসতে হাসতে কুকুর ছানাটি মুরারীর হাতে ফিরিয়ে দিল। বলল: এবার এটাকে নিয়ে তুই একটু আদর কর।

বিবাদ মিটে গেল। অনুশোচনার পালা সুরু হল। মুরারী কুকুরছানা ফিরে পেয়ে খুব গৌরব বোধ করল না। মনে হল, তার সব উৎসাহ নিবে গেছে। ছানাটা হাতে পেয়েও সে উত্তপ্ত হতে পারছে না। মুখে কথাও আসছে না। বিষণ্ণ মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। বলল: নিমাই, খেলার মেজাজটাই মাটি হয়ে গেল। আর কিছু ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে আমি তোমার যোগ্য নই। মুরারী হাহাকারের মত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল: তুমি আনন্দের এক অফুরান ভাণ্ডার। যে জায়গায় যাও, যেখানে যাও সে জায়গাই যেন হেসে উঠে। তোমাকে আমার ঈর্ষা হয়। কিন্তু ঈর্ষা করে আনন্দটাকে মাটি করে দিই।

নিমাই মৃদু হেসে বলল: তুমি একটা পাগল। কেন ভাব না আনন্দ বিবাদ যমজ ভাই। বিবাদ আছে বলেই আনন্দ এত মধুর হয়। নইলে আনন্দ যাচাই হত কি দিয়ে? বিবাদ না থাকলে আনন্দ যে মাটি হয়ে যেত ভাই। তুমি আমি সর্বদাই পাশাপাশি থাকব। তোমাকে নিয়েই আমার পূর্ণতা। তুমি ছাড়া আমি অসুন্দর।

চমকানো বিস্ময়ে মুরারী ডাকল: নিমাই!

কথাগুলো এখনো অদ্বৈতাচার্যের কানে ঝংকারে বাজে। বিশ্বম্ভর সত্যিই অবাক করেছিল তাকে। জীবনে এত অবাক হয়নি কখনও। বিশ্বম্ভর সেদিন তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। অনুভূতির মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বম্ভর কোন শক্তি পরীক্ষা কিংবা বিরোধে গেল না। একটা আনন্দ এবং সুখ সকলে মিলে ভাগ করে নিল। সব কিছুর উপর বন্ধুদের সমান অধিকার স্থাপন করে সে দুনিয়ার মানুষকে একটা কিছু বোঝাতে চাইছে। কিন্তু কি বার্তা সে? তার আচরণে অবশ্য প্রকাশ পেয়েছে গণ-তন্ত্রীর মনোভাব। সাম্য মৈত্রী প্রীতি স্থাপনের আদর্শ। দলনেতা হতে গেলে সর্বাগ্রে একটা ভাবমূর্তি তৈরী করা প্রয়োজন। ভালবাসার এবং আস্থার। বিশ্বম্ভর খুব সংগোপনে সেই কাজটি করে রেখেছে। বন্ধু ও আত্মজনের ভালবাসার আসনে নিজের সেই অভিষেকটি অনেক আগেই করে ফেলেছে।

আত্মতৃপ্তিতে অদ্বৈতাচার্যের মুখমণ্ডল এক অপরূপ কান্তি লাভ করল। তার গৌরবে হৃদয়খানা রাঙা হয়ে উঠল। নিজের মনেই উচ্চারণ করল : বিশ্বম্ভর তুমি কে জানি না ? কিন্তু তুমি তোমার মুক্তি পথের একা নিঃসঙ্গ যাত্রী।

ফাল্গুণের ফুরফুরে হাওয়া গঙ্গার বুক থেকে দেবতাদের শরীরের গন্ধ মাখা এক অলৌকিক বাতাস বহন করে আনল। অমনি ঘরটা স্নিগ্ধ ও শুচি হয়ে উঠল। কেমন একটু পবিত্র পবিত্র লাগল। মনটা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেল।

চৌকিতে বসে অদ্বৈতাচার্য বিশ্বম্ভরের কথা ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে শরীর মন ক্ষণে কণ্টকিত হতে লাগল পুলকে, গৌরবে, আনন্দে।

তাহলে বাল্য থেকেই বিশ্বম্ভর নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে মানুষের মনে। এই কাজটা তার ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে কেউ যেন করছে। বেশ বোঝা যায় ভেতরে ভেতরে একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে সে চলেছে। তার কথা-বার্তা, চালচলন, মেলামেশার মধ্যে অদ্বৈতাচার্য এক অন্য বিশ্বম্ভরকে দেখল। সে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের অজানা। কিন্তু অচেনা নয়। বহু জানা ঘটনার ভেতর বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিত্বকে দেখতে লাগল।

শান্তিপুরে চতুষ্পাটীতে বিদ্যার্থীদের পাঠ শেষ করে অদ্বৈত একটু বিশ্রাম করছিল। এমন সময় শ্রীবাস এসে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখ। কথা নেই। হাসি নেই। বর্ষার মেঘের মত থমথম করছে। অদ্বৈত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল : শ্রীবাস কি হয়েছে ? তোমাকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছে। কি হয়েছে আমায় বল ?

শ্রীবাস থম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর থমথমে গলায় বলল : আমি অপমানিত বোধ করছি আচার্য।

অদ্বৈতের হাসি পেল। বলল : তোমাকে অপমান করল কে ?

শ্রীবাস মাথা নেড়ে বলল : আমাকে না, অপমান করেছে আপনাকে।

তার উত্তেজনার হেতু আপনি ঈশ্বরের স্বপ্নাদেশে সিদ্ধ-সাধক একথা সে উড়িয়ে দিল। আমার কোন যুক্তিই মানল না।

কথাটা অদ্বৈতাচার্যকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। মুহূর্তের মধ্যে কল্পনা করে নিল নিশ্চয়ই কোন ম্লেচ্ছ বা যবন তার ধর্ম বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে। তাকে অপমান করার এই হীন চক্রান্ত নিশ্চয়ই চাঁদ কাজীর। তাই ক্রুদ্ধ স্বরে বলল : কে সে উন্মাদ ? অদ্বৈতাচার্য মরেনি এখনো।

প্রয়োজন হলে সুলতানের সামনে কূট তর্ক করে এর বিচার প্রার্থনা করব।

শ্রীবাস অদ্বৈতাচার্যকে নিবৃত্ত করার জন্যে বলল : আচার্য, আপনি এত উত্তেজিত হবেন না। সে নির্বোধ আপনার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ বিশ্বম্ভর, আমাদের নিমাই।

অদ্বৈতের সব রাগ নিমেষে জল হয়ে গেল। বুক থেকে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠার গুরুভার নেমে গেল। লাঘব হল উত্তেজনা। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। হাসি হাসি মুখ করে বলল : বিশ্বম্ভর বালক। ওর চৈতন্যই হয়নি। ঈশ্বরের মহিমা কেমন করে বুঝবে ?

আচার্য আপনি বিশ্বম্ভরের স্নেহে অন্ধ। তাকে বালক বললে ভুল হবে। বয়সে বালক। কিন্তু বচনে নয়। অসাধারণ মেধা আর প্রতিভাবনে সে এই বয়সেই অনেক পণ্ডিতদের ঘায়েল করে দিচ্ছে। তাইতেই এত অহংকার তার। ওর মত দুর্বিনীত, উদ্ধত, নাস্তিক ভূ-ভারতে খুঁজলে একটাও মিলবে না। লোকে বলে বৈষ্ণবের ঘরের কুলাংগার। কথাবার্ত্তাতেও বিনয়ের অভাব।

এই প্রসঙ্গের কোন জবাব দিল না অদ্বৈত। গম্ভীর হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল : বিশ্বম্ভর আমাকে কি বলেছে ?

সে নাস্তিক। দুর্বিনীত। মানী লোককে সম্মান দেয় না। পথে ঘাটে কথায় কথায় পণ্ডিত এবং সতীর্থদের সঙ্গে তর্ক করে। একেবারে বিশ্বতার্কিক।

অদ্বৈতের ভুরু কুঁচকে গেল। বেশ একটু গম্ভীর গলায় বলল : বিশ্বম্ভর কি বলল শুধু সেই কথা বল।

শ্রীবাস একটু থমকে চেয়েছিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : কি বলেনি ? ঈশ্বরের কোন অস্তিত্বই সে মানে না। ঈশ্বর তার কাছে অবাস্তব ; অলৌকিক। আর সে বাস্তব, লৌকিক। সুতরাং ঈশ্বর মিথ্যে, সে সত্য।

অদ্বৈতাচার্য আশ্চর্য হয়ে চেয়েছিল শ্রীবাসের দিকে। তার গায়ে কাঁটা দিল। মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক স্বপ্নলোকের মধ্যে নিমজ্জিত হল তার ভাবনা। অদ্বৈতকে নীরব দেখে শ্রীবাস সুধাল : আচার্য চুপ করে কেন ? কথা বলুন।

অন্যমনস্কতার মধ্যে চমকে উঠল অদ্বৈতাচার্য। ক্ষণিক দ্বিধা-জড়তা কাটিয়ে দুরু দুরু বুকে বলল : শ্রীবাস বিশ্বম্ভর বড়ই চপল বড় দুষ্টুমতি। সত্যিই পাগল ও। সব কথা ওর বোঝা যায় না। তুমি খুলে বল কি হয়েছে।

শ্রীবাস বেশ রাগত স্বরে বলল : শুনলে, আপনার দুঃখ বড়েবে। কষ্ট

হবে। ওসব পাগলামি না শোনা ভাল।

অদ্বৈতাচার্য একটু অবাক হল। বিশ্বম্ভরের পাগলামিটা কোথায় পেঁাছিয়েছে তা ভেবে একটু ভয়ও পেল। আস্তে আস্তে রাগস্বরে বলল: 'তবু তুমি বল। তাকে আমার বুঝতে হবে। ওকে নিয়ে আমার কৌতুহলের অন্ত নেই।

শ্রীবাস বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল অদ্বৈতাচার্যের মুখের দিকে। 'তারপর খুব স্বচ্ছন্দে সহজভাবে যা হয়েছিল তাই বলল।

বিদ্যানগর থেকে শ্রীবাস নিমাইর সঙ্গে ফিরছিল। পথ চলতে চলতে 'তু'জনের মধ্যে নানারকম কথা হল। কিন্তু সেসব কথা দীর্ঘস্থায়ী হল না। সহসা অদ্বৈতাচার্য সম্পর্কে নিমাই কৌতূহল দেখাল। তাঁর কুশল নিল! আচার্য অদ্বৈতের কথা বলতে গিয়ে শ্রীবাসের একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল। বলল: আচার্য অদ্বৈতের মত মানুষ হয় না। তিনি মহান বৈষ্ণব। শিখি-পুচ্ছধারী মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভুবন মোহন ভঙ্গীতে তাঁকে দর্শন দিয়েছে স্বপ্নে। তখন তিনি তরুণ। অদ্বৈতাচার্য নাম হয়নি। পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ আচার্য নামে পরিচিত। কমলাক্ষকে শ্রীহরি স্বপ্নে আদেশ দিলেন, জীবকে কৃষ্ণ নামে উদ্বুদ্ধ করতে। যমুনার তীরে অবস্থিত দ্বাদশ আদিত্য তীর্থে লুকনো মদনমোহন মূর্তি উদ্ধার করে তাকে স্থাপন করতে। নিত্য পূজা ও সেবা করতে। সত্য সত্যই দ্বাদশ আদিত্য তীর্থ মাটি খুঁড়ে কমলাক্ষ এক মনোহর কৃষ্ণমূর্তি পেলেন। স্বপ্ন, সত্যি ও বাস্তব হল। তারপর থেকে কমলাক্ষ একেবারে বদলে গেলেন। বুকের অভ্যন্তরে তাঁর ভক্তির ঢল নামল। চোখে তাঁর কি গভীর তন্ময়তা, মুখখানি কত ঢলঢলে আর ভাবাবেশে বিভোর। তনুতে কেমন তাঁর একটা শৈথিল্য ভাব প্রকাশ পেল। বৃন্দাবনে কমলাক্ষ মদন মোহনের সর্বক্ষণ সেবা করেন। ঐ বিগ্রহই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান হল। হঠাৎ একদিন মদনমোহন স্বপ্ন দিয়ে বললেন: আচার্য, তোমার মদন-মোহনের পক্ষে এইস্থান নিরাপদ নয়। এর চতুষ্পার্শে ম্লেচ্ছদের বেলেল্লাপনা, ম্লেচ্ছদের হাতে মদনমোহনের পবিত্রতা হানি হবে। তুমি মদনমোহনকে স্থানান্তরিত কর। মথুরার পরমভক্ত বিখ্যাত ব্যবসায়ী চৌবেজীর হাতে মদনমোহনকে সমর্পণ কর। তা-হলে আর কোন বিঘ্ন হবে না। স্বপ্নে কমলাক্ষ আরো শুনলেন—মদনমোহনকে হস্তান্তরিত হলেই বা কি? তোমার আমার সম্বন্ধ চিরকাল। তোমার মত মহান ভক্তের মধ্য দিয়েই যে আমার

লীলার পরিপুষ্টি। তুমি বরং নিকুঞ্জবনে স্থাপিত আমার পটটি নিয়ে দেশে যাও।

এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে নিমাই অদ্ভুত হাসল। বলল: স্বপ্ন কখনো সত্য হয়? স্বপ্নে মানুষ কিনা পায়, আর কিনা হয়? স্বপ্নে মানুষের ইচ্ছেগুলো ছাড়া পায়। সে একেবারে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। স্বপ্ন হল মানুষের কল্প সাম্রাজ্য। যার যা আকাংখ্যা তাই সে পায়। একজন ভিখারী স্বপ্নে রাজা উজীর বনে যায়। এই স্বপ্ন তার স্বর্গের পারিজাত। জীবনের নন্দন কানন। কষ্টের মরুদ্যান।

শ্রীবাস বেশ একটু ক্ষুব্ধ হযে বলল: নাস্তিকের মত কথা বল না। অল্প বয়সে বেশি বুঝে ফেলেছ। বিদ্যাই তোমার অহংকার আর নাস্তিক্যের হেতু।

নিমাইর অধরে বিচিত্র হাসি খেলে গেল। বলল: শ্রীবাসদা তুমি মিছে রাগ করছ। অস্তিত্বকে অর্থাৎ বাস্তব সত্যকে যে অস্বীকার করে সেইত নাস্তিক। তুমি কিন্তু সত্যকে মানছ না। অন্ধ বিশ্বাস যুক্তিহীন জ্ঞান নিয়ে তুমি রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করছ। কাষ্ঠে অগ্নি আছে—এই বোধ ও সত্য সম্পর্কে ধারণার নাম জ্ঞান। বিদ্যা লাভ করলে এই সত্যের উপলব্ধি ঘটে তাই বিদ্যা, আর সব মিছে। অদ্বৈতাচার্যের স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমার চোখে রজ্জুকে সর্প ভ্রমণের মতই একটি অবাস্তব ঘটনা। একটা অদ্ভুত ভ্রম।

শ্রীবাস একটু উত্তেজিত হল। কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকাশ পেল। বলল: পাণ্ডিত্য দিযে জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বর আছেন এটি একটা বোধ—একটা অভ্রান্ত প্রত্যয়।

নিমাই এবার অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাসল। সে হাসি উদ্ধত অহংকারী পণ্ডিতের। বেশ একটা কৌতুকে তার দুইচোখ ঝকমক করছিল। মৃদু হেসে বলল: ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না। কেউ কোনদিন তাকে দেখেনি। ঈশ্বর শুধু একটা উপলব্ধি। তার বিগ্রহ রূপত শিল্পী মানুষের সৃষ্টি। নিজের ভাল লাগা, মন্দ লাগা নিয়ে শিল্পী মানুষের আদলে দেবতার মূর্তি গড়েছে। তাই অঞ্চল ভেদে; মানুষ ভেদে, সম্প্রদায় ভেদে, ধর্ম ভেদে ঈশ্বরের মূর্তি বিভিন্ন। আকৃতি ও প্রকৃতিও আলাদা। সব ধর্মেইত বলে ঈশ্বর এক। তবু তাঁর আকার এত বিভিন্ন কেন? কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি এই বিশ্বপ্রকৃতির গাছ-পালা, পর্বত, নদী, জীব-জন্তুর আকৃতি'ত আলাদা আলাদা নয়। কেবল এক

এক অঞ্চলে তাদের নাম আলাদা। কিন্তু স্বরূপে, প্রকৃতিতে তারা এক। অথচ ঈশ্বর বিশ্বস্রষ্টা হয়েও স্বরূপে প্রকৃতিতে কত রকম। ঈশ্বর অলৌকিক, তার বিগ্রহ লৌকিক, ঈশ্বর অবাস্তব, শিল্পী বাস্তব। তাই ভক্ত যেরূপে তাকে কল্পনা করে তাকে ভক্তি করে সেই রূপেই তার মূর্তি গড়েছে। দেব-দেবীর বিগ্রহ, ভক্তের মানস বিগ্রহ। মহাবৈষ্ণব ভক্তশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যহীন যে মূর্তিটি অহরহ আরাধনা করতেন তাকেই স্বপ্নে দেখলেন তিনি। সাধারণ মানুষের স্বপ্ন এবং পরম জ্ঞানী ও সাধু সন্তর স্বপ্নের জগৎ একটু আলাদা। ঘুমের প্রশান্তির সময় সদা জাগ্রত মনটি অনেক কিছু গভীর করে ভাবতে পারে, অনেক অদ্ভুত সত্যের সন্ধান দিতে পারে। স্বপ্নে সেই ভাবনা প্রতিফলিত হয়ে তাকে এক অনাবিষ্কৃত রহস্যের সন্ধান দিয়েছে। এই স্বপ্নটি কিন্তু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আচার্য অদ্বৈতের বুদ্ধি, জ্ঞান, অন্বেষণ, ঐতিহাসিক চেতনা এবং অনুমান তাঁর এই স্বপ্ন প্রাপ্তি পশ্চাৎপট সৃষ্টি করেছে। আচার্য সচেতন মনে বৈষ্ণবদের প্রাচীন মহাতীর্থ দ্বাদশ আদিত্যতীর্থের লুপ্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মদনমোহনের প্রাচীন ঐতিহাসিটি হয়ত সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এরূপ একটি সিদ্ধান্তকে স্বপ্ন প্রত্যয়বান করল। সুতরাং এই স্বপ্নকে আমি দেবাদিষ্ট বলতে রাজি নই।

শ্রীবাস কথা খুঁজে পায় না। চোখ মুখে তার ক্রোধের অভিব্যক্তি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল: ঈশ্বর আছেন এটি একটা বোধ। একটা বিশ্বাস। পাণ্ডিত্য দিয়ে ঈশ্বর মেলে না। ঈশ্বরেতে পাগল হলে তবে তার স্বরূপ টের পাওয়া যায়।

কৌতুকে নিমাইর দু'চোখ চকচক করে উঠল। বলল: অজ্ঞতা দৃঢ় না হলে তর্ক বিচারের বোধ জন্মে না। জ্ঞান দিয়ে যা জানা যায় তাই হল পরম জ্ঞান। শাস্ত্র, পুঁথি এসব'ত কেবল যথার্থ সত্যের কাছে পৌঁছনোর পথ বলে দেয়।

শ্রীবাস বলল: নিমাই, শাস্ত্র পড়ে জ্ঞান অর্জন করা এক জিনিস আর তার মর্মোদ্ধার করা আর এক ব্যাপার। চিনিতে বালি মিশলে চিনিটুকু নেয়া বড় কঠিন। শাস্ত্রের মর্ম সাধু মুখে আর গুরু মুখে শুনে নিতে হয়। শিশুর মত সরল মন নিয়ে তাকে বিশ্বাস করতে হয়।

নিমাইর অধরে টেপা হাসি। চোখের চাহনিতে কৌতুক। বলল: চিনিতে বালি মিশলে চিনিটাকে বার করে নেয়া কঠিন নয়। জলে চিনি দ্রব হলে

বালি আলাদা হয়ে যায়। দ্রবীভূত চিনি পাক করলে আবার চিনিটুকু পাওয়া যায়। বিষ্ঠায়-অবিষ্ঠায়কে এমনি করে আলাদা করে তবে যথার্থ সত্যের উপলব্ধি হয়। এই সত্য দর্শন হল ঈশ্বর দর্শন। যিনি সত্য, তিনিই ব্রহ্ম। সোনার মত রঙ হলেই সোনা হয় না। জ্ঞান থাকলে তবেই সোনা-পেতল চেনা যায়।

শ্রীবাস ফাঁপড়ে পড়ল। অসহায় দৃষ্টিতে নিমাইর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল: উদ্ধতের চূড়ামণি, আমার সাধ্য কি তোমাকে ঈশ্বরের মহিমা বোঝাই? তোমার মধ্যে পাণ্ডিত্যের অহমিকা। অহংকার বৈষ্ণবকে মানায় না। অহংকার হল উঁচু পাহাড়। বৃষ্টির জল জমে না, সবটাই গড়িয়ে পড়ে যায়। কিন্তু জমিতে জল জমে, সেখানে মাটি নরম হয়, অঙ্কুর গজায়, গাছ হয়, ফল হয়। জীবনের উদ্দেশ্য এই ফললাভ। শুধু বিচার করলে হবে? আগে লাভ করার চেষ্টা কর। আচার্য অদ্বৈত বলেন, ঈশ্বর লাভের জন্যে সংসারে থেকে একহাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, অন্যহাতে কাজ করবে। কিন্তু পুঁথি পড়ে এই জ্ঞান হয় না। যে জ্ঞান ঈশ্বরের থেকে আসে তা ফুরোয় না। ঈশ্বরকে জানলে পুঁথি শাস্ত্র খড় কুটো বলে বোধ হয়। আচার্য অদ্বৈতের মত মহাসাধকের সান্নিধ্যলাভ করলে তুমিও জানতে পারবে ঈশ্বর কি? বৈষ্ণব কাকে বলে?

নিমাই হাসতে হাসতে জবাব দিল, বেশ তাই হবে।

বদ্ধঘরে অদ্বৈতাচার্যের মন বসল না। কেমন ক্লান্তি লাগল। বাইরে বেরিয়ে পড়ল অদ্বৈতাচার্য। তারপর কি ভেবে গঙ্গার ধার ধরেই চলল নিমাইর বাড়ীর দিকে।

অপরাহ্নের রোদ এক সুন্দর আবহ রচনা করেছে। পাশের বাগানে গাছের শাখায় লুকিয়ে একটা পাখি 'চোখ গেল চোখ গেল' করে অবিরাম ডাকছিল। তাঁর ঐ কেঁদে কেঁদে ডাকটা বন ভেদ করে অদ্বৈতের কানে আসছিল। ঝংকারে বাজছিল বুকের ভেতর। কেমন একটা আচ্ছন্ন চোখে এদিক ওদিক পাখিটাকে খুঁজল কিছুক্ষণ। কিন্তু কোন পাখী দেখতে পেল না। হয়ত ওর কান্না শোনার কেউ নেই। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জ্বালাটাকে বয়ে বেড়াচ্ছে। এই যন্ত্রণার কোন সমব্যথী নেই। কিন্তু বুক-ভরা ব্যথা আর হাহাকার তারা সারাক্ষণের সাক্ষী।

চলতে চলতে অদ্বৈতের বুকের ভেতরটা থরথরিয়ে কেঁপে গেল। একটা

গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সহসা মনে হল, এ পাখীর ডাক নয়, তার হৃদয়ের অভ্যন্তরের অব্যক্ত আর্তি পাখীর ডাক হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। এই মুহূর্তে অদ্বৈত আরো অনুভব করল তার সত্তার মধ্যে চোখ গেল পাখির আর্তনাদ যেন জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। সে এই অস্বস্তি অতৃপ্তিটা যে কি জন্য আর কেন-সে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। এক যন্ত্রনাবিদ্ধ জিজ্ঞাসার কাছে উৎকর্ণ, বোবা হয়ে সে পথ হাঁটতে লাগল।

একা একা পথ চলতে কত কথা মনে হল। কত মুখ মনে পড়ল। কিন্তু কোন কিছুই স্থায়ী হল না। কেবল নিমাই সম্পর্কে কৌতূহলটা প্রবল হল। নিমাই তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

অনেককাল আগের ঘটনা। বিশ্বম্ভর তখন দ্বাদশ বছরের বালক। ঐ বয়সেই সে নবদ্বীপের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অসাধারণ তার মেধা এবং বুদ্ধি। কিন্তু তার দুষ্টুমিও ভয়ংকর। বিশ্বম্ভরের দুষ্টুমির কথা মনে হলেই গঙ্গার ঘাটের কথা মনে পড়ে। শুধু এই একটা ঘটনার মধ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যার ভেতর বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও প্রকৃতি প্রকাশ পায়।

গঙ্গার প্রশস্ত বাঁধানো ঘাটের চত্বরে ধূমধাম করে সত্য নারায়ণের মানত পূজা হচ্ছে। নিমাই স্নান করছিল। হঠাৎ গঙ্গা থেকে ভিজে কাপড়ে উঠে এল পূজাস্থানে। নৈবেদ্য থেকে কলা এবং নাড়ু তুলে খেল। প্রসাদের পাত্র থেকে মুঠো মুঠো প্রসাদী ফলমূল, হাতভর্তি করে নিয়ে দর্শনার্থীর মধ্যে ছুঁড়ে দিল। অমনি হৈ-হৈ করে উঠল মেয়েরা। ঝড়ের বেগে তেড়ে আসল ঘাট-শুদ্ধ লোক। একজন বয়স্ক ব্যক্তি রেগে তার কান ধরল। একটা চড়ও দিল।

নিমাই ক্ষিপ্ত হল। দুরন্ত আক্রোশে পুজোর সাজ-সরঞ্জাম ছুঁড়ে ফেলল। ঠাকুরের চৌকিতে বসল। গোটা পুজোটাই নষ্ট করে দিল। মেয়েরা হায় হায় করতে লাগল। অমঙ্গলের ভয়ে তারা মাথায় করাঘাত করতে লাগল। ঈশ্বরের কাছে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শুধু ক্ষমা ভিক্ষে করতে লাগল। পূজারী, দর্শনার্থীরা তাকে প্রহার করতে উদ্যত হল। কিন্তু নিমাই অবিচলিত। ভক্ত এবং দর্শনার্থীরা তর্জন গর্জন করে তার দিকে তেড়ে এল। কিন্তু কেউ তার গাত্র স্পর্শ পর্যন্ত করতে সাহস পেল না। আকূতি-মিনতি করেও কেউ ঠাকুরের চৌকি থেকে তুলতে পারল না। নানা লোকে নানা কথা বলল। কিন্তু তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। শান্ত গলায় বলল: আমিই নারায়ণ। তোমরা আমাকে পুজো কর।

ভীরু ভক্তের অশান্ত, ক্রোধ, উত্তেজনার উত্তাপ এক দমকা হাওয়ায় যেন সহসা নিভে গেল। এ ওর দিকে সংশয়ে তাকাল। মাথা নাড়ল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে কেমন গদগদভাব হল তাদের চোখে মুখে।

অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে যাওয়ার জন্যে ঘাটে যাচ্ছিল। পথেই নিমাইর কাণ্ড শুনে একেবারে ঘটনাস্থলেই হাজির হল। অদ্বৈত আসাতে অনেকে স্বস্তি ও শান্তি পেল। একসঙ্গে হাজার নালিশ, অনুযোগ কটু মন্তব্য তার কানে গেল। কিন্তু অদ্বৈত কারো কথার কোন জবাব দিল না। নিমাইর সামনে এসে দাঁড়াল! অপলক চোখে স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিমাইর চোখে চোখ রাখল। নিমাই গাঢ় গভীর কালো দুই মুখে চোখে এক অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নামল। চোখ দুটিতে তার গভীর সম্মোহন। তার চোখের ফাঁদে ধরা পড়ল অদ্বৈত। সস্নেহে গলায় বলল: বিশ্বম্ভর তোমার একি ছেলে খেলা? মানুষের ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে খেলা করতে নেই। লক্ষ্মী বাবা, উঠে এস।

নিমাইর নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই! তেমনিভাবে বসে রইল। মুখে তার টেপা হাসি।

অদ্বৈত এবার কঠোর হল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল: আমি বলছি, তুমি উঠে আসবে।

নিমাই একটুও ভয় পেল না। আকস্মিক গলায় প্রশ্ন করল: কেন?

অদ্বৈত গম্ভীর গলায় বলল: ঈশ্বরের অপমান হয়।

নিমাই সহজভাবেই বলল: ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ কি? তাঁকে চোখে দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গে কথা বলাও যায় না। তাহলে আমি তাঁকে অপমান করলাম কেমন করে?

উত্তেজিত দর্শকরা বলল: আচার্য, শুনলেন'ত?

অদ্বৈত গম্ভীর হয়ে বলল: নিমাই তর্ক করা তোমার একটা বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। কোথায় কি বলতে হয় সেটুকুও শেখনি।

নিমাই নম্র গলায় শান্তভাবে মৃদু স্বরে বলল: আচার্যদেব কে বললে আমি তর্ক করছি? আমি'ত জানতে চাইছি, বুঝতে চাইছি। তবু আপনি তর্ক বলছেন কেন? জানতে চাওয়া কি অপরাধ? লোকে পুজো করে, ঈশ্বরকে ডাকে, কিন্তু তার এই পুজো কে নেয়? কেমন করে তার কাছে পৌঁছে? মানুষের আকুল করা প্রার্থনার সাড়া তিনি কিভাবে দেন?—এই জিজ্ঞাসার জবাব আমাকেই বা ঠাকুর দেয় কি করে তাই দেখতেই ঠাকুরের

আসনে বসেছি, তার নৈবেদ্যর প্রসাদ খেয়েছি। এতে যদি আমার অপরাধ হয় ঈশ্বর যদি অপমানিত হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কি? সেই কথাইত জানতে চাই। কিন্তু ঈশ্বরকে'ত পেলাম না কোথাও। আচার্যদেব ঈশ্বর তাহলে কোথায়? ঈশ্বর লাভ করতে গিয়ে জনতার কিল চড়, তিরস্কার শুধু জুটল। এতে ঈশ্বরের অপমান হল কিনা জানি না, কিন্তু আমার লাঞ্ছনা হল।

অদ্বৈতাচার্য কোন কথা বলতে পারল না। তার সব যুক্তি হার মানছে। দর্শকদের ভেতর কেউ কেউ মিন মিনে গলায় বলল ঃ নাস্তিক। ম্লেচ্ছ।

কথাটা নিমাইর কানে যেতে বলল ঃ দেব-দেবী হল মাটির একটা পুতুল, নয়'ত পটে আঁকা একটা ছবি, পুতুল এবং ছবির আকৃতি অবশ্য মানুষের মতই। এতে প্রমাণ হয় মানুষই ঈশ্বর। আমি সেই জীবন্ত ঈশ্বর। আমিই নারায়ণ। আমাকে পূজো করতে বাঁধা কোথায়? ঈশ্বরের সঙ্গে আমার তফাৎ ঈশ্বর অবাস্তব আমি বাস্তব, ঈশ্বর অলৌকিক আমি লৌকিক। ঈশ্বর নিরাকার আমি সকার, ঈশ্বর নির্বাক, আমি সর্বাক। ঈশ্বরকে ডাকলে সাড়া মেলে না, কিন্তু আমাকে ডাকলে জবাব মেলে। ঈশ্বর মিথ্যে আমি সত্য।

ঘাটশুদ্ধ লোক নির্বাক বিস্ময়ে তার কথাগুলো শুনল। আচার্যর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। তথাপি মুগ্ধ চমকে দুই চোখ চকচক করছিল। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগার চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল ঃ বিশ্বম্ভর। তর্কে ঈশ্বর মেলে না। ঈশ্বর জ্ঞানের নয়; বোধের, অনুভূতির। বড় জায়গায় এসে জীবনকে যখন বড় করে দেখবে তখন এই বিভ্রান্তি দূর হবে। ঈশ্বর চেতনা লাভ করবে। এই যে অলকানন্দের জলের ঝর ঝর, কল কল শব্দ; এই যে পাখীর কলতান, ঝির ঝিরে মিষ্টি হাওয়া—এসব কার সৃষ্টি? এই বিশ্ব সংসার কার দান? মনকে প্রশ্ন করলে উত্তর মেলে না। শুধু বিস্ময় জাগে, অনন্ত বিস্ময় ঈশ্বরের অনুভূতি।

বিশ্বম্ভর উদাস চোখে অলকানন্দের ঘোলা জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কি যে ভাবছিল কে জানে? খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলল ঃ কৈ সে রকম কোন অনুভূতি'ত আমার হয় না। বরং মনে হয় এসব প্রকৃতির। ঈশ্বর বলে কোথাও কিছু নেই। যখন মানুষের মনে এই ঈশ্বর বোধের উপলব্ধি আসেনি, তখন মানুষ নিজের শক্তি, সামর্থ এবং প্রত্যয়ের উপর ছিল আস্থাবান। কিন্তু যেদিন থেকে এই ঈশ্বর

ধারণা তার মনে দানা বাঁধতে সুরু করল সেদিন থেকে মানুষ সাহস আস্থা হারিয়ে দুর্বল, ভীরু অদৃষ্টের ক্রীড়নকে পরিণত হল। অথচ মানুষ প্রকৃতির মত অন্য সব জীবের মতই মুক্ত! ঈশ্বর এবং ধর্ম তাকে নিষেধের কারাগারে বন্দী করেছে। একদিন পটে আঁকা ছবির মতই সে যে নিজে ছিল সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। এই কথাটাই সে ভুলতে বসেছে। যারা সে কথা ভোলেনি তারা অবতারী। ঈশ্বরের অংশে তাদের জন্ম।

অদ্বৈত স্তব্ধ বিস্ময়ে বিশ্বম্ভরের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনের মধ্যে তার ঝড়। বহুকালের বিশ্বাস সংস্কার ভেঙে যাওয়ার একটা প্রবল কষ্ট আর দুঃখে বুকটা তার টাটাচ্ছিল। নিরুত্তর থাকার অপমানে মুখখানা গণগণ করতে লাগল। এসব প্রশ্ন এমন গভীর আর জটিল করে তার মনের ভেতর কখনও জাগেনি। তাই বিশ্বম্ভরের কথার জবাব দিতে পারে না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। বিশ্বম্ভরের কথাগুলো সাধারণ বালকের মত নয়। বহু অভিজ্ঞ বয়স্ক মানুষের। মনে হয় একজন বয়স্ক ব্যক্তি তার মধ্যে দিয়ে কথা বলছে। নিজেকেই প্রশ্ন করেছে—এ কার কথা? বিশ্বম্ভরের? ঈশ্বরের? তবে কি তার ঈশ্বর বিশ্বম্ভরের মূর্তি ধরে এল ধরাধামে? অদ্বৈতের সারা গায়ে কাঁটা দিল। বুকের ভেতরটা একটু অদ্ভুত আবেগে কম্পমান হল। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শে অদ্বৈতের মুখ উজ্জ্বল হল। মুগ্ধ অভিভূত গলায় প্রশ্ন করল: বিশ্বম্ভর তাহলে তুমি কি মনে কর, ঈশ্বর বলে কেউ নেই?

একজন বালককে এরকম ধরণের একটা প্রশ্ন করে অদ্বৈতাচার্য খুব বিস্মিত হল। অবাকও লাগল। তবু একটা বালকের বিশ্বাসে নিজেকে প্রত্যয়বান করার ইচ্ছা তার হল। কেন? এই ইচ্ছাটা জাগাল কে অন্তরে? অদ্বৈত নিজের জিজ্ঞাসায় নিজে বিব্রত হল। বাহ্য অপমান বোধে তার বুকের ভেতরটা পুড়তে লাগল। কানের দু'পাশ রি রি করে জ্বালা করছিল। আবেগের বশে কথাটা বলে ভাল করেনি। তবু কেমন একটা উৎকর্ণ মুগ্ধতা নিয়ে তার কথা শোনার জন্যে তাকিয়ে রইল। বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ বশীভূত করার শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থা তার।

অদ্বৈতের প্রশ্নে বিশ্বম্ভরের চোখে বিস্ময়ের অতলান্ত গভীরতা। মুগ্ধ স্বরে বলল: আচার্যের প্রশ্ন বড় অদ্ভুত। আমার চেয়ে আপনিই সেকথা ভাল জানেন। তবু আমাকে বেশ কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলা হল। নিজের কথা

বলার এত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করছি না। স্বর্গে ঈশ্বর আছে কি নেই-জানি না। তবে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেছি। সে মহান সেবায়, প্রেমে, ত্যাগে, মহত্বে, বীর্যে, তেজে, গৌরবে, মনীষায় ব্যক্তিত্বে শ্রেষ্ঠত্বে সকলকে ছাপিয়ে গিয়ে যে ভাব মূর্তিটি তৈরী করে পৃথিবীকে স্বর্গ করে তোলে সে ঈশ্বর! বড় অহংর আলো পড়ে সে ঈশ্বর হয়ে যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের সমস্ত স্থাবর মঙ্গলের মধ্যে নিজের অহংকে প্রসারিত করে দিয়ে ঘোষণা করেছে আমিই ঈশ্বর। আমিই বিশ্বনিয়ন্ত্রা। পৃথিবীর কটা মানুষ তার ভাবনা-চিন্তার মধ্যে গোটা বিশ্বকে এভাবে নিজের করে ভেবেছে? কোন মানুষ মহাশক্তির অংশ হয়ে আকাশ, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে নিজেকে দেখেছে? সে দেখার চোখ কার আছে? বিরাট অহং-র প্রভাবে জীবন ও বিশ্ব একাকার হয়ে গেছে। এই বিশাল অহং-র জোরেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান। অবিশ্বাসের যুগে আমাদের কেউ তাকে মেনে নিতে পারেনা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, সুন্দর, সত্য, শুভ ও কল্যাণপ্রদ তাই'ত মানুষের ঈশ্বরত্ব। এই ঈশ্বরত্বটুকু'ত তার চরিত্রের শক্তি, অন্তরের সৌন্দর্য, নৈতিক বল। এই গুণেই শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধ, যিশু, হজরত ঈশ্বর।

বিশ্বম্ভরের মুগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা ও প্রত্যয় অদ্বৈতের ভিতরটা ঠাণ্ডা বাতাসের মত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ভীষণ জোরে শক্ত করে ঠোঁট কামড়ে ধরল। অদ্বৈতের মনে হতে লাগল কি এক পরম প্রাপ্তির আনন্দে ও সুখে তার ভেতর টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছে। আর সে একজন নিতান্ত দীন অনুগ্রহ প্রার্থীর মত তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের মনের ভেতর তার প্রশ্নের ঝড়। কে এই বিশ্বম্ভর? এ কোন সাধারণ বালক নয়! জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীর মধ্যে দিয়ে এ কোন শিশু জন্মাল? তবে কি—?

অদ্বৈত সাহস করে স্পষ্ট কিছু চিন্তা করতে পারে না। বিশ্বম্ভরকে অবতার বলে ভাবতে খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু ভয়ও পায় ভীষণ। বিশ্বরূপকে ভগবানের অংশ মনে করে সে শুধু দুঃখই পেয়েছে। জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারের অনেক সন্দেহ ও তিরস্কারের লক্ষ্য হয়েছে সে। সেই ভুল বিশ্বম্ভরের বেলায় পুনরায় করতে তার কেমন ভয়। এই পুত্রটিই এখন শচীর একমাত্র সান্ত্বনা। তার দৃষ্টি পড়লে যদি সেও সন্ন্যাসী হয় তা-হলে কি সান্ত্বনা থাকবে তার নিজের? তাই, বিশ্বম্ভরকে এড়িয়ে চলে সে। কিন্তু আজ সেই বিশ্বম্ভর তার গৃহে চুম্বকের মত টেনে আনছে। কেন আনছে? কিসের মোহে

তার কাছে চলেছে—অদ্বৈত নিজেও ভাল করে জানে না।

পথ চলতে চলতে সেই বিস্মিত প্রশ্ন উথলে উঠা সাগরের মত তার বুক প্লাবিত করে গেল! শরীরের অভ্যন্তরে কোষে কোষে এক অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। এই অনুভূতিটা যে কখন এক দারুণ মুগ্ধ চমকে শিখিপুচ্ছ-ধারী বালক শ্রীকৃষ্ণের মুখ সে কল্পনায় দেখতে লাগল। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেক অদ্ভুত গল্প, ঘটনা কার্যকলাপ, কথোপকথন, মেধা, মনীষা বন্ধুপ্রীতি, কৌতুকপ্রিয়তা প্রতিবেশীদের বিস্ময়ের সঙ্গে কোথায় যেন একটা আশ্চর্য মিল দেখতে পেল বিশ্বম্ভরের। পরক্ষণেই প্রবল সন্দেহ জাগল, এ হয়তো সবই তার অনুমান কল্পনা। কিন্তু তাই বা বলবে কেন? শ্রীকৃষ্ণের মত বিশ্বম্ভরও তার প্রতিবেশী বন্ধু, ও আত্মীয়ের বড় কাছের মানুষ। বিশ্বম্ভর সম্পর্কে এরকম কোন আবেগ কিংবা চিন্তা আগে কখনও অদ্বৈতের হৃদয় ছন্দে বেজে উঠেনি। বিশ্বম্ভরের বাড়ীর পথে যাত্রা করার পর থেকেই এই ভাবনায় আকুল করল তার মন।

সারাপথ অদ্বৈত ছিল ভীষণ অন্যমনস্ক। হঠাৎ রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধ পেল পথে। ফুলের সুগন্ধ নিঃশ্বাস তার বুকের ভেতরটা ছড়িয়ে পড়ল এক অদ্ভুত ভাললাগার নেশায়। কৃষ্ণের মুখটা মনে পড়ছিল। কিন্তু সেই মুখের উপর বিশ্বম্ভরের চোখ মুখ দেখতে পেল। আর তখনি মনটা প্রবল-বেগে বিশ্বম্ভরের দিকে টানতে লাগল।

বিশ্বম্ভর এখন বালক নয়। আঠারো বছর বয়সের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। নবদ্বীপে অপবাজেয় কীর্তিমান মহাজ্ঞানী পণ্ডিত। এখন সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে তার খ্যাতি সুনাম। নবদ্বীপের বাইরেও তার গৌরব ও মর্যাদা যথেষ্ট বেড়েছে। এজন্য তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব ও অহংকার হয়েছে। অহংকারের সমর্থনে বিশ্বম্ভরের জোড়াল যুক্তিটি পথ হাঁটতে হাঁটতে তার কানে বাজতে লাগল। আমি হল মানুষের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ। মানুষের এই আমিটা কোন একজন মানুষের মধ্যে আঁটে না। উপছে যেতে চায় অন্য মানুষের দিকে। পূর্ণ ও চরিতার্থ হতে নিজেকে শুধু প্রসারিত করে দেয় বিরাট বিশ্বের যেদিকে বারিত পথটা চলে গেছে।

কতকগুলো কুকুরের একসঙ্গে ডাকে অদ্বৈতাচার্য ভীষণ চমকে উঠল। ঘোর লাগা আচ্ছন্ন ভাবটা সেইমুহূর্তে কেটে গেল। একটু সন্ত্রস্ত হয়েই পথের উপর থমকে দাঁড়াল। চোখের দৃষ্টি খুব দ্রুত শব্দকে অনুসরণ করল।

জগন্নাথ মিশ্রের উঠোন থেকে যে পথটা বড় রাস্তায় মিশেছে সেখানে দাঁড়িয়ে অদ্বৈতাচার্য ভাবতে লাগল এই কুকুরগুলো বিশ্বম্ভরের আশ্রিত ও পালিত। অপরিচিত এবং নতুন মানুষ দেখে তাই একনাগাবে তারা ডাকছে। একটা কিছু অনুমান করেই শচী বাইবে এসেছিল, নিমাইও তার পিছন পিছন এসে দাঁড়াল।

অদ্বৈত নিনাইর জন্যে উন্মুখ হয়েছিল। নিমাইকে দেখে তার বুকের ভেতরটা সহসা কেঁপে গেল। কিছু মুহূর্ত, কিছু অনুভূতি, কিছু স্মৃতি তার বুকের মধ্যে স্পন্দিত হল। অমনি একটা আকুলি বিকুলি করে উঠল মনের ভেতরটা। অদ্বৈতের বুকের ভেতরটা কেমন একটা পাগল পাগল ভাব জাগল। অপ্রতিরোধ্য স্নেহের আকর্ষণে তার বুকের ভেতর ছটফটিয়ে উঠল। নিমাই কিছু বলার আগেই হর্ষ মিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : বিশ্বম্ভর আমি এসেছি।

নিমাইর কিছু বলার আগে শচীই বলল : আরে দাদা এসেছ ! এস এস। ঘরে এস। গৃহের অভ্যন্তরে যেতে যেতে শচী বলল : এতদিনে মনে পড়ল ? একেবারে তা-হলে ভুলতে পারলে না !

নিমাই অদ্বৈতাচার্যকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেল। দুই চোখে তাব মুগ্ধতা নামল। গদগদ হয়ে বলল : আজ আমার দুর্লভ সৌভাগ্য। আপনার পদার্পণে এই কুটীর পবিত্র হল।

খুশিতে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হল অদ্বৈতের মুখমণ্ডল। দুই চোখে তার কিসের আলো এসে লাগল। বুকটা কেমন কবে উঠল। সমস্ত প্রাণমন এক অদ্ভুত আকর্ষণে তার দিকে ছুটে গেল। নিমাইকে বুকের ভেতর টেনে নিল অদ্বৈতাচার্য। ভেতরটা অনাবিল আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শে গলে গলে পড়ছিল। আর প্রবল একটা ভাল লাগার আবেশে তাকে বুকের ভেতর সমানে টানছিল। নিমাইর শরীরের স্পর্শ অদ্বৈতের অন্তরে কৃষ্ণের অনুভূতিকে তীব্র করল। নিমাইর আলিঙ্গনে এই অনুভূতি তার অন্তরে কেন জাগল ? এ মুগ্ধতা কার সৃষ্টি ? তবে কি সে পরম এসেছে বিশ্বম্ভরের বেশে ?

নিমাই আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে অদ্বৈতকে প্রণাম করতে মাথা হেঁট করল। অমনি অদ্বৈত ত্রস্তভাবে 'পা' টাকে টেনে নিয়ে বলল : আরে আরে করছ কি ? আমাকে আর অপরাধী করনা। তুমি বল, মানুষ ঈশ্বর হয়ে উঠে। তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তার মাথা এমন করে হেঁট করার কোন

অধিকার তোমার নেই।

অদ্বৈতের কথা শুনে নিমাই লজ্জা পেল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। দুচোখে তার নিবিড় লজ্জা। বুকে জড়তা। মনের মধ্যে প্রশ্ন। অদ্বৈতাচার্য তার মহা পণ্ডিতের দম্ভকে ঈষৎ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে কি কথাগুলো বলল? কিন্তু তার আন্তরিকতাকে সন্দেহ করার কোন কারণ আছে বলে মনে হল না তার। হবে কোথা থেকে? আচার্যের চোখে মুখে ঐ অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব তাহলে কখনও হত না। কি অপরূপ দেখাচ্ছিল অদ্বৈতাচার্যকে। নিমাই কিছুক্ষণ তার দুটি চোখ পেতে রাখল অদ্বৈতাচার্যর মুখের উপর। এক অপ্রতিরোধ্য ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ তাকে প্রবল বেগে আচার্যের দিকে টানতে লাগল। বুকের ভেতরটা অনুরাগে গদ গদ হয়ে উঠল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল: আচার্য, আমি জানতাম আপনি আসবেন। আমার এই ভাঙা ঘরে, হতশ্রী এই পল্লীতে আপনাকে আসতেই হবে। এই ধনুক ভাঙা পণ নিয়ে আমি আপনার প্রতীক্ষা করছি।

অদ্বৈতাচার্যের বুকের ভেতরটা ভীষণ চমকে উঠল। সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গিয়ে গাঢ় স্বরে ডাকল: বিশ্বম্ভর।

নিমাইর চোখের চাহনি সুনিবিড় হয়ে উঠল। বলল: আচার্য, আপনার আগমনের কারণ বলুন।

বিশ্বম্ভর! কার্য ছাড়া কারণ হয় না। কিন্তু আমি যে কিসের আকর্ষণে কেন এলাম, জানি না। মনকে'ত চোখে দেখা যায় না। অনুভূতি দিয়ে হয়ত কিছুটা বোঝানো যায়। কক্ষে একা বসে থাকতে থাকতে বুকের ভেতরটা ছটফটিয়ে উঠল। ঘরে বসে থাকাই দায় হল। বাইরে বেরোতেই ফুরফুরে হাওয়ায় দেহ স্নিগ্ধ হল। কিন্তু বুকের ভেতর কিসের একটা ভার তালার মত ঝুলে রইল। পথ চলতে চলতে শুধু তোমার মুখখানা চোখে ভাসতে লাগল। সেই মুখ তোমার দিকে এই বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীর দিকে আমাকে নিয়ে এল।

নিমাইর অধরে বিচিত্র হাসির ঢেউ খেলে গেল। চোখে মুখে অনির্বচনীয় মুগ্ধতা নামল। বলল: অদ্ভুত আপনার কথা।

নিমাইর কথা এক অদ্ভুত আশ্চর্য ভাল লাগার আবেগে আনন্দে গৌরবে অদ্বৈতের বুকের ভেতর ঘুঙুরের মত বাজতে লাগল। মুগ্ধ গলায় প্রশ্ন করল: বিশ্বম্ভর তুমি কে?

নিমাইর শরীর মন অদ্বৈতের প্রশ্ন করার আশ্চর্য কৌশলে চমকে উঠল। এক অপ্রতিরোধ্য আবেগে তার বুকের ভেতর কেঁপে গেল। তবু কথা বলার সময় দুই ঠোঁট বঙ্কিম হল। বলল: নবদ্বীপের পণ্ডিত, জ্ঞানীরা যা বলে থাকেন আমি তাই। আমি নাস্তিক, দাম্ভিক, অহংকারী, দুর্বিনীত, ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারী। মানি না শাসন, সামাজিক আইন, কানুন বাঁধা। আমি অনিয়ম, আমি বিশৃঙ্খল।

বিশ্বম্ভর এ তোমার অভিমানের কথা। তুমি আমার নীল আকাশের ধ্রুব তারা। দূর আকাশে টিপের মত জ্বলছ।

আপনার প্রত্যয়ের হেতু কি?

বিশ্বম্ভর তুমি আমার বিস্ময়। তুমি কে জানি না। কিন্তু তোমার কথা শুনলে আশ্চর্য সুখে ভরে যায় দেহ মন। এই আনন্দ সাগরে ভাসছে নবদ্বীপের সব মানুষ। নবদ্বীপের বাতাস, আলো, অন্ধকার ছেয়ে আছে তোমার প্রেম। এ প্রেম অনুরাগে বিরাগে, শ্রদ্ধায়-বিদ্বেষে, নিন্দায়, সুখ্যাতিতে অসামান্য। খুব কম লোকের ভাগ্যে এ দুর্লভ গৌরব জোটে।

এ সব বললে আমি লজ্জা পাই। প্রতিবেশীর প্রতি আমার কর্তব্যবোধ থেকেই এই মেলামেশা করি। কিন্তু কেন যে তারা আমাকে এত বড় করেন মিছেমিছি বুঝি না।

বিশ্বম্ভর তুমি নীরব কর্মী। তোমার কাজের ধরণ বড অদ্ভুত। সাধারণ লোকের সাধ্য কি তোমার উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করে? তারা নদীর উপরের স্রোত শুধু দেখতে পায়, কিন্তু তলদেশেও যে দুরন্ত প্রবাহ অব্যাহত তা টের পায় না। আর কেউ না বুঝুক, আমি'ত বুঝতে পারি কী অসাধ্য সাধন করে চলেছ নিঃশব্দে। হিন্দুর বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে তুমি নীরবে কাজ করে চলেছ। তোমার কাজ করার ধরনই অদ্ভুত। মানুষ আদব ভালবাসার কাঙাল। হৃদয়ের ছোঁয়া মন্ত্রের মত কাজ করে। পথে দাঁড়িয়ে একটু আলাপ করা, দুটো কুশল জিজ্ঞেস করা, ভাল-মন্দর খোঁজ নেয়া, একটু সহানুভূতি, সমবেদনা দেখানো যে গন্ধের মত মিশে থাকে তার সমগ্র চেতনায় ও স্নায়ুতে। এই মুগ্ধতা কিছুতে কাটে না।

একে আপনি জয় বলেন? পণ্ডিতেরা, ব্রাহ্মণেরা আমার নিন্দেয় মুখর।

নিন্দে নয়, বল ব্যাজস্তুতি। ভালবাসা, অশ্রদ্ধা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আনন্দ বিষাদ যেন অনির্বচনীয় হয়ে মিশেছে তাদের আবেগে। এটুকু বুঝেছি ঈশ্বর

তোমাকে মানুষের ভিতর বাইরে নাড়া দেবার শক্তি দিয়েছে। আমার ইচ্ছে তুমি নিজেকে বিস্তৃত কর, প্রসারিত কর, উন্মুক্ত কর।

নিমাইর দু চোখে বিস্ময়। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়েছিল অদ্বৈতের দিকে। আস্তে আস্তে বলল: আচার্য অমন করে বলবেন না। এখনও আমি ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হইনি। আমি অত্যন্ত সাধারণ।

না। তুমি মানুষরূপী ঈশ্বর। কিংবা ঈশ্বররূপী মানুষ।

আচার্য, আপনার এই ধরনের আবেগ প্রবণতা শোভা পায় না।

বিশ্বম্ভর। তুমি নিদ্রিত, আমি জাগ্রত। তোমাকে জাগাতে আমি এসেছি। নন্দন আচার্যের গৃহে তুমি একবার এস। সেখানে আমি তোমার ঈশ্বর পুরীর সাথে পরিচয় করে দেব।

নিমাই ভয় পেয়ে যেন সহসা আর্তনাদ করে উঠল। দৃঢ় স্বরে বলল: আচার্য, আমি বিশ্বরূপ নই। কোন কুহক মন্ত্রে আমি ভুলব না। জননীকে কাঁদিয়ে আমি অগ্রজের মত সন্ন্যাস নিতে পারব না।

অদ্বৈত নিমাইর চোখে চোখ রেখে শান্ত ভাবে বলল: কে বলেছে তোমাকে সন্ন্যাসী হতে? সন্ন্যাসীর অন্তরে প্রেম কোথায়? তারা পৃথিবীকে ভালবাসে না। সমাজের কোন কাজে লাগে না। তারা বড় স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর হয়। এই প্রেমহীন সমাজে কারো বুকে যদি প্রেম করুণা, মমতা, ভালবাসা থেকে থাকে তা রয়েছে তোমার বুকে। তোমার কাছে মানুষই ঈশ্বর। তুমি জাত-পাত মান না। তুমি মনুসংহিতা পুড়িয়ে ফেলেছ। বল্লাল সেনের জাত-পাতের নিষেধের পাহাড় ডিঙিয়ে হীন, পতিত, অপাংক্তেয় বাগ্দী, ডোম, মুচি কামার তাঁতীকে বন্ধুর চোখে দেখ। তাদের সঙ্গে ওঠ বস কর। তোমার আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে তারা মানুষ হয়ে বাঁচতে শিখেছে—এ কি কম কথা? যে এত বড় সুধা সিন্ধু প্রাণের ভেতর বইয়ে দিতে পারে তার মত বড় যোগী কে আছে?

বিস্ময়ে নিমাই অদ্বৈতাচার্যের দিকে চেয়ে রইল। চোখে মুখে তার খুশির ঝলক। এক মায়াবী আলো যেন পড়ল তার মুখমণ্ডলে। নিমাই কথা বলতে পারল না।

নন্দন আচার্যের ছোট গৃহে আগন্তুকদের স্থান সংকুলান হওয়া মুশকিল হল। তাই গোপীনাথ আচার্যের অঙ্গনে সেই সভা হল। সেখানেই ঈশ্বরপুরী:

ও নিমাইর সাক্ষাৎ হল। দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করল। তারপর অদ্বৈতাচার্য উপস্থিত শ্রোতৃ বর্গের সামনে হরিনাম স্মরণ করে বলল ঃ আমার বন্ধু ও ভ্রাতৃস্থানীয় পরম বৈষ্ণব সাধক ঈশ্বরপুরী শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা বিশ্বম্ভর সহ নবদ্বীপের বিদ্বজ্জনের সম্মুখে গ্রন্থটি পাঠ করে তার যথার্থ সমালোচনা শ্রবণ করা। ত্রুটি বিচ্যুতির সঙ্গে তার সাফল্যও তিনি জানতে বিশেষ আগ্রহী। এখন আপনাদের অনুমতি হলে ঈশ্বরপুরী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাব্য পাঠ আরম্ভ করতে পারে।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী সমস্বরে উচ্চারণ করল ঃ সাধু সাধু।

ঈশ্বরপুরী তারপর স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকবদ্ধ কাব্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত পাঠ সূচনা করল। ঈশ্বরপুরীর সুরেলা উচ্চারণ শব্দের ধ্বনি মাধুর্য জলতরঙ্গের মত তার কণ্ঠে বেজে উঠল। মৃদু আবেগে তার ভেতরটা কাঁপছে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ছে তার তরঙ্গ। তাতেই তার কণ্ঠস্বর আরো ছন্দময় হয়ে উঠল। আর পাঠের সুখানুভূতিতে ঈশ্বরপুরীর চোখে মুখে এক অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব ফুটে উঠল।

স্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী, কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর তলিয়ে বসে রইল শ্রোতারা, বাহবা দিতে পর্যন্ত ভুলে গেল। ভাবে সবাই চোখ বুজে বসে আছে। কারু কারু চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু নিমাইর এসব কিছু হচ্ছে না। অপলক দুটি চোখ ঈশ্বরপুরীর মুখের উপর স্থির হয়ে আছে। সে আর কিছুই দেখছিল না, শুধু ঈশ্বরপুরীকে দেখছিল।

ঈশ্বরপুরীর পাঠ শেষ হল। শ্রোতারা হরি হরি করল। মুখে তার গর্বের হাসি। চোখ দুটি মধুর এক প্রসন্নতায় আবিষ্ট। শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখে চোখে অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব তখনও লেগে আছে। প্রগাঢ় স্তব্ধতা বিরাজ করছে। কয়েকটা মুহূর্ত কাটার পর সকলের ভারী শ্বাস পতনের শব্দ শোনা গেল।

অপলক চোখে ঈশ্বরপুরী নীরবে দৃশ্যটা খানিকক্ষণ দেখল। কিন্তু তার দৃষ্টি চুম্বক আকর্ষণের মত নিমাইর দিকে টানছিল। বেশ একটা কৌতূহল নিয়ে নিমাইর দিকে তাকাল। কিন্তু তার কোন ভাবান্তর দেখল না। মনের ভেতর হঠাৎ একটা আশংকা জাগল, তবে কি নিমাই অন্যমনস্ক? কাব্যের অর্থ-তাৎপর্য কি তার বোধগম্য হলনা? অহংকার বশে কাব্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে দেখার জন্যে কি এই নির্বিকার ঔদাসীন্য তার? তীব্র একটা অস্বস্তির পীড়নে জ্বলে যেতে লাগল বুকের ভেতরটা। মাথাটাও তার ঝিঁ ঝিঁ করতে

লাগল। নিদারুণ একটা হীনমন্যতায় আর অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন। কথা বলতে গিয়ে লজ্জায়, দ্বিধায় অপমানে তার গলা কাঁপতে লাগল। বলল: বিশ্বম্ভর! শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে তুমি সর্বকনিষ্ঠ। মনে হচ্ছে তোমার চিত্ত আকর্ষণে আমি সমর্থ হইনি। আমার ব্যর্থতা সম্পর্কে যদি কিছু আলোকপাত কর—। ঈশ্বরপুরীর চোখ দুটোয় আগ্রহ প্রদীপের মত জ্বলে উঠল।

নিমাইর ধরা পড়ে যাওয়া বাচ্চা ছেলের মত অবস্থা হল। ঈশ্বরপুরীর দিকে চেয়ে অল্প একটু হাসল। সপ্রতিভ হয়ে বলল: আপনার কাব্যগ্রন্থ ভক্তি রসের আকর। শুদ্ধ ভক্তিরসে আপ্লুত শ্রোতৃমণ্ডলী। মহৎ উদার পবিত্র অনুভূতিতে তারা আচ্ছন্ন। প্রগাঢ় আবেগে তাদের অন্তরটা বিরাট আদিত্যবর্ণ এক অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্তার মত হয়ে গেছে। রচনার এই সাফল্য লাভের পর আর কোন আলোচনা করাই উচিত নয়।

ঈশ্বরপুরী স্তব্ধ বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল। অবাক হল তার বিনয় এবং নম্র আচরণে। কথায় কি গভীর সংযম! বাক্য কি মধুর! তবু লোকে বলে সে দুর্বিনীত, উদ্ধত, অহংকারী, গুণী ব্যক্তিদের সম্মান দেয় না, তাদের অপমান করে। বিশ্বম্ভর সম্পর্কে এই বহুল প্রচারিত নিন্দেটা তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল এক মুহূর্তে। এক গভীর স্নেহে ও শ্রদ্ধায় তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ সম্পর্কে তার নীরবতা ঈশ্বরপুরীকে অস্থির করল। মনের ভেতর নানারকম মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া হতে লাগল। বিশ্বম্ভরের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ নানাপ্রকার। অন্তত পাকে প্রকারে এ কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, কাব্যটির কিছু দোষ আছে। তাই কোনরূপ মন্তব্য করতে রাজি হচ্ছেনা সে। অথবা কাব্যটির অন্তর স্পর্শ করার মত কিছুই নেই। শুধু মাত্র পাঠের গুণেই তা শ্রুতিমধুর হয়েছে। ঈশ্বরপুরী ভারী অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। বিশ্বম্ভর নীরব থাকার জন্যই এই সব চিন্তা জাগছে। বারংবার মনে হচ্ছে, তার রচনাতে দোষ আছে। বিমর্ষ বেদনায় তার বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল। মুখের ভেতরটা বিস্বাদ অনুভব করল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে অস্বস্তিতে কাটাল। তারপর বুক থেকে একটা ভারী শ্বাস নেমে গেল। মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল: বিশ্বম্ভর কাব্য সৌন্দর্য প্রসঙ্গে তুমি কিন্তু কোন আলোচনা করলে না। এরকম অসম্পূর্ণ, মন্তব্য শুনব তোমার কাছে আশা করিনি।

নিমাইর মুখে অনির্বচনীয় হাসি। বলল ঃ

ভক্ত বাক্যে কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেনে নয়।
সর্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়।

ঈশ্বরপুরীর সংশয় সন্দেহ প্রগাঢ় হল। ধৈর্য ধরতে পারছিল না। অস্থির চিত্তে বলল ঃ বিশ্বম্ভর তোমার কোন পাপ হবে না। কৃষ্ণপূজায় অঙ্গহানি হলে আমি কষ্ট পাব। গ্রন্থ রচনায় যে দোষ ত্রুটি আছে নিঃসংকোচে তুমি বল। আমার কোন ভুল বা ত্রুটি থাকলে তুমি শুধরে নেয়ার সুযোগ দাও।

নিমাইর আশ্চর্য লাগল, তাকে ঘিরে ঈশ্বরপুরীর পরম বৈষ্ণব সাধকেরও একটা অগাধ কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। বয়সে নবীন হলে কি হবে, তার সমালোচনায় এই প্রধান মহাপণ্ডিত সাধকেরও বিপুল আস্থা। বুকটা তার গবে ভরে উঠল। মনটাও কেমন হয়ে গেল। চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মৃদু হেসে বলল ঃ আপনি আজ খুব মুশকিলে ফেললেন। অপরাধ যদি গ্রহণ না করেন তাহলে বলব ধাতু শব্দের ত্রুটি আছে।

ঈশ্বরপুরীর প্রশ্ন ঃ কোন কোন স্থলে এরকম ত্রুটি হয়েছে?

নিমাই চোখ বুজে সেই সেই শ্লোক হুবহু আবৃত্তি করল। এবং যে যে দোষ হয়েছে তার ব্যাখ্যা করল এবং পংক্তিটি সংশোধন করলে কত সুন্দর হয়, তার অর্থ ও মাধুর্য কত বদলে যায় তাও বিচার করে দেখাল।

ঈশ্বরপুরী নিমাইর কথায় পরিতুষ্ট হয়ে সেই ত্রুটি সংশোধনে প্রবৃত্ত হলে নিমাই তাকে বাধা দিয়ে বলল ঃ ভক্তের বিচলিত হৃদয়ের এই আকৃতির সরল সৌন্দর্যকে অলংকারে মুড়ে দিলে ওর ঐশ্বর্য নষ্ট হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও খুশি হবে না। তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক।

অদ্বৈতাচার্য নিমাইর পাণ্ডিত্যের গর্বে একটু হাসল। ভারী সুন্দর দেখাল তাকে।

ঈশ্বরপুরী নীরব। তার মুখে গভীর বিষাদ থমকে আছে। কিন্তু তা বলে নিমাইর উপর তার কোন রাগ বা অভিমান ছিলনা। নিমাইকে কি বলে অভিনন্দন জানাবে, অব্যক্ত আনন্দ প্রকাশ করবে তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

নিমাইর বুকের ভেতর অনেকক্ষণ থেকে একটা প্রশ্ন আটকে ছিল। এই

অবকাশে সেই প্রশ্নটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে এল। হাহাকারের মত দীর্ঘশ্বাসটা ছড়িয়ে পড়ল। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলঃ মহাত্মন, যদি কোন অপরাধ না হয়, তা-হলে একটি প্রশ্ন নিবেদন করব।

ঈশ্বরপুরীর ভিতরে একটা কিছু স্পন্দন তোলে। বিগলিত হয়ে মাথা নাড়ল। স্মিত হেসে বললঃ বেশ বল।

নিমাইর মনের কথা বলতে গেলে দেশের ও সমাজের কথা মনে পড়ে যায়। দেশটা আর হিন্দু রাজার নয়। একজন বিধর্মী এবং বিদেশী মুসলমান সুলতানের! এদেশের লোক নয় সে! তার ধর্মও ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মায়নি। দেশের শাসন ক্ষমতায় আসার পরেই তার রাজ্য বজায় রাখতে বুঝতে পেরেছিল হিন্দু অধ্যুষিত এই ভারতভূমিতে শুধু ভুজ বলে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিককাল ভোগ করা যাবে না। টিকে থাকতে হলে নিজ ধর্মমতে বিশ্বাসে লোকবৃদ্ধিব জরুরী প্রয়োজন। শুধু বহু বিবাহ আর অধিক সন্তান সৃষ্টি করে রাতারাতি জনসংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম প্রসারের এক অনুকূল অবস্থা এদেশের অভ্যন্তরেই আছে। শুধু একটু ইন্ধন দরকার। সুলতান তার বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে হিন্দুর দুর্বলতার রন্ধ্র পথটিকে ঠিকই চিনেছিল। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, প্রথা এদেশের জনচিত্তকে স্পর্শকাতর করে রেখেছে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল। সুলতান এবং কাজীরা অসামান্য ধূর্ততা এবং সাহসের সঙ্গে ব্রাত্য হিন্দুদের অভিমান, ক্ষোভ, বেদনা, দুঃখকে নিজেদের অনুকূলে এনে হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত হানল। রাজশক্তির সাহায্য এবং পৃষ্ঠ পোষকতা থাকায় স্বভাব ভীরু হিন্দুরা অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করল। সুলতানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মনোবল তাদের ছিল না। কোন রকম প্রতিরোধ গড়ে তোলারও কেউ উদ্যোগ নিল না। প্রবলের ভয়ে, উৎপীড়নে দুর্বল, ভীরু সহায় সম্বলহীন মানুষ ইসলামের শরনাপন্ন হল। তবু দেশের মাটিতে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। দেশ কাল পরিস্থিতি যতই সংঘাত সংকুল ও সমস্যা কণ্টকিত হোক না কেন, স্বভাব ভীরু, ঘরকুনো আত্মকেন্দ্রিক, আত্মমুখী হিন্দুরা সে সম্পর্কে উদাসীন আর নিস্পৃহ রইল। এই অকর্মন্যতা নিমাইকে পীড়িত করে। এই অবোধ কষ্টের কোন মানে হয় না। তবু ঈশ্বরপুরীর গ্রন্থ পাঠ শ্রবণ কালে তার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। মনে হল, এই ধর্ম চর্চা, শাস্ত্রচর্চা হল শিক্ষিত মানুষের এক ধরণের বিলাসিতা। কেননা, যে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তারা বাস করে

তাকে ভুলে থাকা পাপ। মারাত্মক অপরাধ। সেই পর্বত প্রমাণ অপরাধের তিল প্রমাণ প্রায়শ্চিত্ত হবে না শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত পাঠে। এ হল ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ভক্তির বিলাসিতা। এত কথা কয়েক মুহূর্তে তার মনে ঝিলিক দিয়ে গেল। দেশ কাল পরিস্থিতির চিন্তা তার সমস্ত ভাবনার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ঈশ্বরপুরীর দেশকাল সচেতনতাকে একটু পরখ করে দেখার জন্যেই প্রশ্ন করল: মহাত্মন এই গ্রন্থ লিখলেন কেন? এই গ্রন্থে হিন্দুর কোন কল্যাণ হবে? গোটা মানব সমাজের কি উপকার করবে? দেশকাল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আজ সবচেয়ে যা প্রয়োজন, সেই দেশ প্রেম কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে, সত্য ধর্ম ও ন্যায়ের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছিল। কর্মযোগী, মানবদরদী, জীবন প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম দৃপ্ত সেই মহা জীবনের গৌরব, মহিমা আপনাকে আকৃষ্ট করল না, কেন? অথচ, জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে উত্তরণের জন্যে কর্মযোগী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ প্রাণহীন এ দেশের জীবনকে ভালবাসায় রাঙিয়ে তুলেছিল কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যেই আমরা বুঝলাম, প্রেমহীন জীবন মরুভূমির মত। প্রেমে মানুষ আপন হয়, শত্রু মিত্র হয়। জীবনকে ভাল না বাসলে দেশকে ভালবাসা যায় না। তাই শিশু তার জননীকে ভালবেসে দেশজননীকে ভালবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে শেখে। প্রেমের উপলব্ধিই দেয় আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। প্রেম হল আত্মপ্রত্যয় এবং বিশ্বাস জাগানোর মন্ত্র। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতি না জন্মালে, সখ্যতা না গড়ে উঠলে, ভেদাভেদ বৈষম্যের গ্লানি কাটে না। ঐক্য ও সংহতি দানা বাধে না। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এই দিকটি আপনার গ্রন্থে কেন উপেক্ষিত হয়ে থাকল, বুঝলাম না?

ঈশ্বরপুরী স্তব্ধ। বিস্ময়ে অভিভূত! প্রস্তরীভূতপ্রায় তার অবস্থা। নিজের অক্ষমতার লজ্জায় ঈশ্বরপুরী ম্রিয়মান। তাকে স্তব্ধ দেখে নিমাই পুনরায় বলল: মহাত্মন! পরম ভক্তির ঐশ্বর্যে ভক্তকে ধর্মপ্রাণ করে তোলা যায়, কিন্তু তাকে দেশ প্রাণ করা যায় কি? বিশুদ্ধ ভক্তির আবেগ ধর্মিতা সৃষ্টি করে হিন্দু ধর্মের ক্ষয়, ধ্বংস, মহা সর্বনাশ কি ঠেকানো যায়? আপনি'ত সন্ন্যাসী। বিভিন্ন স্থান অনবরত পর্যটন করছেন। মানুষের দুর্দ্দশা, হিন্দু ধর্মের অবনতি, এবং তার বিপুল সংখ্যা হ্রাসের চেহারাত বেশি দেখার সুযোগ হয়েছে। তবু বিপন্ন হিন্দুধর্ম এবং দুর্গত মানুষকে রক্ষার কোন কথাই আপনার

মনে এল না। নির্জন ঘরে বসে সংসার পলাতক সন্ন্যাসীর মত শুধু হৃদয় চর্চার বিলাসিতা করলেন। হিন্দুর এই আত্মমুখী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে বিদেশী ধর্ম হিন্দুধর্মের মূলোৎপাটন করছে। অথচ, একজন হিন্দু হিসাবে নিজে ধর্ম রক্ষার কোন দায়িত্ব আপনার আমার নেই। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার কোন পথের সন্ধান আপনার গ্রন্থে নেই। এই সব গ্রন্থ লিখে হিন্দুর কোন কল্যাণ হবে, মানুষের কোন উন্নতি হবে? তাই নিদারুণ দুঃখে এবং লজ্জায় আমার স্বরচিত গ্রন্থটি একদিন গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। বিলাসিতা থেকে জীবনকে ধুয়ে মুছে সাফ করেছি।

সকলে কেমন একটা আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হয়ে চুপ করে আছে। শ্বাস পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। সন্ধ্যায় আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে আঙিনায়। ঈশ্বরপুরী মাথা হেঁট করে পুঁথির দিকে চেয়ে বিবশ হয়ে বসে আছে। মাথায় তার হাজার এলোমেলো চিন্তা। কিন্তু জবাবটা ভেবে পেল না। কোন কথাই বলতে পারল না। মুখখানা তার থমথমে এবং গম্ভীর। কিন্তু অদ্বৈতের দুই চোখ তারার মত জ্বলছিল। তীব্র হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ে চক্ চক্ করছে তার মুখ। নিমাইর প্রশ্নগুলো তাকে বারবার অবাক করে দিতে লাগল। একটু চমকে উঠে পুনরায় শুনল নিমাইর কণ্ঠস্বর। সকলকে নিরুত্তর এবং নীরব দেখে সে বলল: আপনারা সকলে মৌন। কোন কথা বলছেন না কেন? আচার্য অদ্বৈত কিছু একটা করা দরকার। অন্ততঃ কিছু করার জন্যে ভাবনা শুরু হোক।

অদ্বৈত নিমাইর দিকে একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল! মুখশ্রী দেখে মানব চরিত্র নির্ণয়ের অভ্যাস তার নেই। কিন্তু নিমাইর মুখখানি যে ভারী প্রত্যাশাময় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার প্রত্যয়দীপ্ত সুগভীর দুই চোখের দিকে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রাণ ভরে উঠে। কেমন যেন মনে হল এই ছেলের মধ্যে আছে সেই তেজ, এবং শক্তি যা দেশ ও জাতির অন্তর বাইরে নাড়া দিতে পারে। গাঢ় স্বরে অদ্বৈত ডাকল: বিশ্বম্ভর। তোমার পর্যবেক্ষণ নির্ভুল।

হিন্দুরা সত্যিই আত্মমুখী জাত। নিজস্ব জগতে তারা বাস করে। নিজের পরিজনের বাইরের পরিবেশটা পর্যন্ত তার অচেনা। যেখানে বাস করে সেখানেও অনেক অদ্ভুত চরিত্রের লোক বাস করে, তারাও কেউ কাউকে ভাল করে চেনে না। চিনতে চায়ও না। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও যে

একটা কিছু করা দরকার এটাও ভাবতে চায় না। বয়সে ছোট হলেও জীবনকে দেখার ও জানার একটা আশ্চর্য চোখ তোমার আছে। তোমার চোখের ভেতর যে তেজ লুকিয়ে আছে, এই মৃতপ্রায় হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরের আবর্জনাকে ভস্ম করে ফেলবে। আজ আমার গর্বের দিন, বড় আনন্দের দিন। এই অনাবিল সুখের মুহূর্তে আমার বিচারবোধ হারিয়ে ফেলছিল। বিস্ময় জাগছে। তুমি কে? তবে কি তুমি আমার সেই পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশয় চ দুস্কৃতাম্। হ্যাঁ হ্যাঁ বিশ্বম্ভর তোমার দুই চোখে ও আমি কাকে দেখছি? ও যে আমার মদনমোহন। আমার ইষ্ট! আমার ঈশ্বর। বিশ্বম্ভর আমার মাথা নুয়ে আসছে। তুমি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি নাও। আমাকে আশ্রয় দাও! আজ থেকে আমি তোমার অনুগামী, তুমি আমার নেতা, আমার গুরু।

নিমাই'ত অবাক! কথা বলতে পারল না। অদ্বৈতের চোখের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখের উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা মলিনতা ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে এক স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব ফুটে উঠল। লজ্জার হাসি হেসে বলল: আচার্য আপনার মহত্বের কোন তুলনা হয় না। আপনার অন্তরের ঐশ্বর্যে যবন হরিদাস পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের কোন জাত নেই। এই শিক্ষাত আপনাকে দেখেই শিখেছি।

কথাটা শুনে অবাক হল না অদ্বৈত। খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল: তাই নাকি? হরিদাস কিন্তু মনে প্রাণে বৈষ্ণব। সে যবন নয়। ব্রাহ্মণের সন্তান। অসহায় অবস্থায়, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মনেপ্রাণে মুসলমানের অন্ন জল গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাতেই তার জাত বা ধর্ম গেছে বলে মনে করিনি। কিন্তু হিন্দুরা তাকে ত্যাগ করল। তাকে হিন্দুসমাজ স্থান দেয়নি। হিন্দুর চোখে সে অস্পৃশ্য এবং যবন। আমি শুধু সেই পরম বৈষ্ণবকে কোল দিয়েছি। তাকে ফুলিয়ায় যেতে সাহায্য করেছি। একজন বৈষ্ণব হয়ে আর একজন বৈষ্ণবকে এই সাহায্য ছাড়া আর কিছু করতে পারিনি। তোমার সাহস, প্রত্যয় তেজ আমার কোথায়? বিশ্বাসে, শক্তিতে দৃঢ়তায়, কঠোরতায় তুমি যে অনন্য! তুমি আমার স্বপ্নের পুরুষোত্তম! অপাপবিদ্ধ, দুর্মর সাহসী, বিশ্বজয়ী সেই মহাপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ! তোমাকে আমি প্রণাম করি!

ঈশ্বরপুরী পুঁথি রেখে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার দিকে চেয়েছিল। বুকের

ভেতরটা এক উপচানো আনন্দে টৈ-টুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল! এক অসহনীয় সুখবোধে সে নিমাইকে টেনে নিল বুকের মধ্যে! ভারী কোমল, ভারী স্নেহময় সে স্পর্শ!

নিমাই একটু বিব্রত হল। একটু অপ্রতিভ হাসে। তবু খারাপ লাগছিল না এই আলিঙ্গন। সম্মোহিতের মত ঈশ্বরপুরীর বুকের উপর মাথা রেখে অদ্বৈতের দিকে চেয়ে থাকে। বুকের ভেতর তার কেমন করছিল। বার বার মনে হচ্ছিল এবার একটা কিছু হবে। একটা কিছু ঘটবে তার জীবনে। একটা মোড় ফিরবে হয়ত।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ঈশ্বরপুরী গভীর থমথমে গলায় বলল: বৎস বিশ্বম্ভর, ভক্ত শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতের সব স্বপ্ন এখন তোমাকে নিয়ে। আমিও বলছি, এই বিশাল পৃথিবী তার কাজের জন্যে তোমাকে টেনে নেবে। কত দিকে, কত কাজে ছড়িয়ে পড়বে তুমি। তোমার ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শে বিচিত্র নেশায় লক্ষ লক্ষ মানুষের স্তিমিত প্রাণে বহুশত বছরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার অপসারিত করে এক আলোর বন্যা নিয়ে তুমি আসবে। সে ভাবের বন্যা দেশকে পরম গৌরবে উদ্ভাসিত করবে। তোমার কল্যাণ হোক বিশ্বম্ভর তুমি জয়ী হও।

॥ ছয় ॥

দুপুর গড়িয়ে গেল তবু নিমাই বাড়ী ফিরল না। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নিমাই-প্রিয়া লক্ষ্মী সমানে ঘর-বার করছিল। দুশ্চিন্তায় সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেল। একটা দারুণ দুশ্চিন্তায় তার বুক টাটাচ্ছিল। মুখখানা বড় শূন্য আর গভীর দেখাচ্ছিল। পথের দিকে চেয়ে চেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার আর কাটে না। কতসব কুচিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার শূন্যদৃষ্টি খোলা জানলার দিকে প্রসারিত। নিমাইর সুঠাম সুন্দর গৌরতনু, ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, টানা টানা চোখ, সদা হাস্যময় প্রশান্ত মুখের এক অপার্থিব সৌন্দর্য তার দুই চোখের তারায় জ্বলজ্বল করছিল। সেই সুন্দর মুখখানি ঘিরে কতসব চিন্তা তাকে গ্রাস করল।

স্বামী তার নিমাই পণ্ডিত। লোকে তাকে সাধারণ মানুষ ভাবে না কখনও। শ্রদ্ধা-প্রীতি, ভক্তি-ভালবাসা. অনুরাগের সূত্রে গাঁথা এক অসাধারণ মানুষ। গোয়ালা পাড়া, মালীপাড়া, বাগ্দীপাড়া, তাঁতীপাড়ার লোকে তাকে ঠাকুর বলে। সে তাদেব ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ ঘরেব ছেলের এই ম্লেচ্ছাচার কিন্তু কায়স্থ, ব্রাহ্মণেরাও খুব ভাল চোখে নেয়নি। এসব নিয়ে তাদের অনেকের ভেতর একটা চাপা অসন্তোষ থেকে গেছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্কে যেহেতু নিমাইকে এঁটে ওঠা যায় না, তাই এসব নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ তাব বিরুদ্ধাচরণ কবে না। করতে সাহস পায় না। আড়ালে আবডালে, গোপনে, লুকিয়ে খুব পরিচিত জনের মধ্যে তার সম্পর্কে দু'চারটা নিন্দে মন্দ করে মনের আক্রোশ মেটায়।

আসলে তারা নিমাইর খ্যাতি, গৌবব, জনপ্রিয়তার ঈর্ষা করে। লক্ষ্মী কতবার তাকে নিবৃত্ত করার জন্যে বুঝিয়েছে—কী দরকার বয়স্কদের সঙ্গে তর্ক করার? ওঁদের বিশ্বাসকে সংস্কারকে আঘাত দিয়ে, ভেঙে দিয়ে তোমাব লাভ কি? এ তোমার ভারী বদ অভ্যাস।

নিমাই দুই চোখ কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলে, তুমি বলছ কি লক্ষ্মী? হাজাব হাজাব বছরের ভুলের জেব আর কতকাল টানবে কাল? ভুলের খেসার'ত আজ হিন্দুকেই দিতে হচ্ছে। হিন্দুর সংখ্যা রোজই কমছে—এ প্রশ্ন কখনও করেছে কেউ? কি করলে হিন্দুব ধর্মদ্রোহ বন্ধ হয়'—তার কথা ভাবতে দেখেছ কাউকে? নিঃশব্দে হিন্দুর যে কত বড় সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে-কেউ তা জানেও না। কারো তা নিয়ে মাথা ব্যথাও নেই! কেবল আচার্য অদ্বৈতই একটু উদ্বিগ্ন। আমি তাঁর কাজটাকে একটু অন্যরকমভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। বয়স্কদের সঙ্গে শুধু তর্ক করে, ঝগড়া করে তুমি ধর্মান্তর ঠেকাতে পারবে?

যে কারণ হিন্দুদের এক অংশ অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে তার শিকড়টি আগে টেনে তুলতে হবে। অজ্ঞতার মত শত্রু নেই, সংস্কারের মত জড়ত্ব নেই বিশ্বাসের মত স্থবিরত্ব নেই। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা ধর্ম আর শাস্ত্রের নামে মানুষকে গণ্ডির মধ্যে বেঁধেছে। শিখিয়েছে একে অন্যে ভেদাভেদ। আমিত তাদের শুধু সেই কথাই বলি।

লক্ষ্মী বাধা দিয়ে বলল: তুমি শাস্ত্র মানবে না?

নিমাই মৃদু হাসল। বলল: শাস্ত্র মানুষকে আরো সুন্দর এবং পরস্পবের

সহযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র রচিত হয়েছে। শাস্ত্র কোন মুখস্থ করা বুলি নয় লক্ষ্মী। মানুষের শুভ ও হিত হয় এমন অনুশাসন নিয়ে শাস্ত্র। সংসার পথে নিত্যকার বিবিধ অনুশাসন শৃঙ্খলা আনল। ব্যাপক শ্রম বিভাগের প্রয়োজনে গুণ ও কর্ম অনুসারে মানুষকে এক এক কর্মে নিযুক্ত করা হল। সমাজের সব লোকত সমান ক্ষমতা সম্পন্ন নয়, সকলের মনের গতিও সমান নয়, সকলের রক্তে থাকে না সমান প্রভাব—তাই হীন, দীন, রুগ্ন, শান্ত, শ্রমী, ও ধর্মী, বিদ্বান ও কর্মী ভেদে বর্ণ বিভাগ করা হল ঃ সামাজিক গণশক্তির। এমনই সব কার্যবিভাগ নিয়েই হয়েছিল এক একটি বর্ণ। এই ভাবে উৎপত্তি হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এরা সকলে এক একটি বর্ণের অন্তর্গত। এরা কোন জাত নয়—কর্ম। ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুসারে কর্মও বৃত্তি বদলানোর কোন বাধা নেই। ব্রাহ্মণ হয়েও জামদগ্ন্য, দ্রোণাচার্য ক্ষত্রিয় বৃত্তি নিয়েছেন। ক্ষত্রিয় হয়ে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হয়েছেন। কিন্তু মনু এই ধারার পরিবর্তন আনলেন। ধর্মের সঙ্গে কর্ম বিভাগকে যুক্ত করে মানুষের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য আনলেন। কারিগরী কর্মে অভ্যস্ত এক শ্রমিক সম্প্রদায়ের যেমন উদ্ভব হল ; কর্ম ও জন্মসূত্রে যে যে বৃত্তির অন্তর্গত তাকে সেই বৃত্তিই করতে হত। অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত না। বিশেষ করে বিবিধ উৎপাদন মূলক ও সেবামূলক কর্মে যারা ব্যাপৃত তারা নানাভাবে বঞ্চিত। প্রতারিত এবং নিপীড়িত হতে লাগল। সহস্র অনুশাসনের ফাঁসে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। নানারকম বিকৃতি কালক্রমে প্রকাশ পেল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আমি সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছি। মানুষের পরিচয় হল সে নিজে। তার জাত নয়, বর্ণ নয় কর্ম নয়। মনুসংহিতাকে মেনে আমরা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণদের পাঁচ হাজার বছর ধরে শুধু ঘৃণা আর অবহেলা করে আসছি। তার কারণ, জন্মসূত্রে তারা যে বৃত্তি করে সেই কাজটাকে ছোট করে দেখি বলেই তাদের মানুষ ভাবি না। তাই, উচ্চবর্ণের হিন্দুর উপর রাগ করে, অভিমান নিয়ে, নিদারুণ দুঃখে ও কষ্টে তারা পিতৃ পিতামহের অত্যন্ত প্রাচীন ধর্মকে ত্যাগ করছে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা। এরা সমাজে দুর্বল, পতিত, অবহেলিত। দেশের মুসলিম শাসকের লক্ষ্য এরাই। এদের যেভাবে তারা টানছে তাতে হিন্দুর সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ছে। ধর্মের ধ্বজা ধরে মানুষের সম্পর্ক যারা তিত করে দিচ্ছে আমার জেহাদ তাদের বিরুদ্ধে। তাই মানুষের মর্যাদা এবং গৌরব বাড়িয়ে তুলতে হলে ধর্মের

অনুশাসন থেকে যেমন মানুষকে মুক্ত করতে হবে তেমনি প্রকৃত সমতা ফিরিয়ে আনার সমাজকে পরিবেশ তৈরী করতে হবে। তাদের অন্তরে বিশ্বাস জাগাতে হবে। শুধু ভঙ্গি দিয়ে তাদের ভোলালে হবে না। হিন্দু ধর্মের স্বার্থেই শুধু নয় মানুষের মঙ্গল কল্যাণের ব্রত নিয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামিতে তাঁরা ভুগছেন। তাঁদের মনের বাঁধা, সংস্কার ভাঙতে আমি বাগ্দী, কাহাড়, চণ্ডাল, ডোম, জোলা মুসলমানদের সঙ্গে উঠি বসি,. খাই। বিবাদ বাঁধানো আমার উদ্দেশ্য নয়, সব বিরোধ না মিটলে, এঁদের. সঙ্গে না পেলে যে সবার উপর মানুষ সত্যের বাঁধ বাধা হবে না। এই সত্যটা বোঝাতে আমাকে কঠোর হতে হয়। ঔদ্ধত্য আমার স্বভাব নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই আমাকে কিছুটা উদ্ধত করেছে। ভিতরের জোরে গলাটা জোরাল হয়ে উঠে।

লক্ষ্মী বোবা বিস্ময়ে নিমাইর দিকে চেয়েছিল। নিমাইর বাম কাঁধে চিবুকে ভর দিয়ে গভীর এক ভালবাসার আবেগে সে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল।

লক্ষ্মীর চোখে নিমাই অসীম সাহসী, বিরাট এক মহান মানুষ। এই মানুষটার জন্যে চিরদিন সে গর্ববোধ করেছে। এই অনুভূতিতে তার হৃদয় মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মুখে তার এক আশ্চর্য মুগ্ধতা নামল। চোখে মুখে অজস্র ধারায় ঝরে পড়তে লাগল তার অমলিন দীপ্তি। গর্বের সঙ্গেই সে ভাবছিল, এক নিমাই পণ্ডিতের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। যার কুৎসাতে কিছু লোক আবার মুখরও হয়। কুৎসার কথায় তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনের ভেতর যন্ত্রণাবোধ করতে থাকে এক রকম। কিন্তু সেই আওয়াজহীন যন্ত্রণায় তার বুকটা চিরে চিরে যায়। অব্যক্ত অস্ফুট তীব্র যন্ত্রণার ভেতর আচমকা মনের ভেতর থেকে জগাই মাধাইর কথাটা মুখে এল। নিঃশব্দে উচ্চারণও করল। অপ্রস্তুত চেতন মনকে ঐ নামটা ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে লাগল। ভয়ে ভাবনায় তার গলা শুকিয়ে এল।

কিছুদিন আগের কথা।

বাগ্দী পাড়ার সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী বিধবা যুবতী হরিমতীকে জগাই মাধাইর লাঠিয়াল বাহিনী লুঠ করতে এসেছিল। হরিমতী বুঝতে পেরে গা ঢাকা দিল। কিন্তু লাঠিয়ালদের মারধোরের চোটে হরিমতীকে তারা লুকিয়ে রাখতে পারল না। হরিমতীকে বলির পাঁঠার মত টানতে টানতে নিয়ে গেল। তার আকুতি মিনুতি, অসহায় কান্না শুনেও কেউ সাহস করে

এগিয়ে এল না।

নিমাই সেই সময় বিষ্ণানগর থেকে বাগ্দীপাড়ার ভেতর দিয়ে ফিরছিল। হঠাৎ পথে হৈ-চৈ কান্নাকাটি শুনে ছুটে গেল। পাষণ্ডদের কাণ্ড দেখে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল ঃ মুখ। ঘৃণায়, ক্রোধে ঠোঁট বেঁকে গেল। দু'চোখের তারা আগুনের গোলার মত জ্বল জ্বল করে উঠল। রাগে কেশর ফোলা সিংহের মত গর্জন করে উঠল দাঁড়াও। ওকে ছেড়ে দাও।

যে লোকটি হরিমতীর হাত ধরেছিল, সে একটু বিরক্ত হয়ে বলল ঃ তুমি কে-ডা? তোমার সাহস'ত কম নয়।

নিমাই গলার স্বর চড়িয়ে বলল ঃ সাহসের এখনই কি দেখলে? বলেই, নিমাই তার হাতটা জোরে মুচড়ে ধরল। অমনি লোকটার হাতেব মুঠি আলগা হয়ে গেল হরিমতীকে ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ এই, এই কি হচ্ছে এটা? কাজটা খুব ভাল হচ্ছে না! আমি ছাড়লেও জগাই বাবু, মাধাই বাবু তোমাকে ছাড়বে না।

নিমাই গম্ভীর গলায় বলল ঃ সে আমি বুঝব। ফের এ পাড়ায় দেখলে তোমাদের আমি জ্যান্ত কবর দেব।

সঙ্গী লাঠিয়ালটি একটু চুপ করে থেকে বলল ঃ কাব সঙ্গে লাগতে এসেছ জানো? তোমাব কপালে অশেষ দুঃখ।

নিমাই চড়া গলাতেই বলল ঃ তোমাদের কাছে জ্ঞান নেব না। যাও, ভাগ এখান থেকে।

প্রথম লাঠিয়ালের চোখে মুখে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব ফুটল। বেশ রুক্ষ গলায় বলল ঃ এতই সহজ। খালি হাতে ফেবা যায়? ইজ্জৎ থাকে?

হরিমতী নিমাইর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত দিয়ে তাব পা জড়িয়ে ধরল। ঠাকুর। তুমি আমাকে বাঁচাও। তোমার সামনে দিয়ে এরা আমাকে নিয়ে যাবে ঠাকুর? তাই তুমি দেখবে?

দ্বিতীয় তৃতীয় লাঠিয়াল দৌড়ে গেল হরিমতীর দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে ফেলল তারা। একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল হরিমতী বাঁচাও।

প্রথম লাঠিয়াল বুক ফুলিয়ে বলল ঃ চল শালী।

নিমাইর সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল ক্রোধে, হরিমতী হাপুস হুপুস নয়নে কাঁদছে। তার কান্নায় নিমাই কেমন হয়ে গেল। তার ভেতরে

পুরুষটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর হয়ে গেল। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসল দাঁতে দাঁতে। গম্ভীর গলায় বলল : শেষ বারের মত বলছি, ওকে ছেড়ে দাও।

নিমাইর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে লাঠিয়ালরা থমকে দাঁড়াল। এ ওর দিকে তাকাল। তার মুখের ভাব চোয়ালের দৃঢ়তা দেখে দস্যুরা কি করবে ঠিক করে উঠতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে একজন নিমাইর মাথা লক্ষ্য করে লাঠি মারল। নিমাই প্রস্তুত হয়েই ছিল। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাঠিটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে কেড়ে নিল। অমনি অন্য এক লাঠিয়াল তেড়ে এল তার দিকে। সুরু হয়ে গেল লাঠি খেলা! নিমাইর দক্ষতার সামনে লাঠিয়ালরা দাঁড়াতে পারল না। হরিমতীকে ফেলেই তারা পালাল। হরিমতী সে যাত্রায় রক্ষা পেল। কিন্তু জগাই মাধাইর আক্রোশ পড়ল নিমাইর উপর।

নিমাইর কাছে এ গল্প শোনা থেকে লক্ষ্মীর ভয়ে ভয়ে দিন কাটে। জগাই মাধাই লোকটা বর্ব্বর, নিষ্ঠুর, অহংকারী, মমতাহীন। তার মত দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি পারে না এমন কোন কাজ নেই। সারা নবদ্বীপের সে আতঙ্ক। তার দলবলও বিরাট। অনুচরের অভাব নেই। বাড়িতে বসে তার আঙ্গুল হেলনেই অনুচরেরা সক্রিয় হয়ে উঠে। চাঁদকাজীর ডান হাত সে। লক্ষ্মীর উদ্বেগ, দুর্ভাবনা সেই কারণে আরো বেশী। লক্ষ্মীর তাই নিরন্তব ভৎসর্না আর তিরস্কার করে তাকে। সব বুঝেও সে বলে যাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে খাচ্ছিল, কাল হল তার গরু কিনে। তোমার অবস্থা তাই হয়েছে। করছিলে পণ্ডিতী হতে চাইলে সমাজ-সংস্কারক। তোমার একার চেষ্টায় এই অচল অনড় সমাজটা বদলে যাবে? সাধ করে তুমি ঝঞ্ঝাটে যাচ্ছ। কি দরকার তোমার জগাই মাধাইকে চটানো?

নিমাই লক্ষ্মীকে রাগিয়ে দেবার জন্যে কৌতুক করে। বলল : বহুকাল পর সত্যিকারের একটা ক্ষমতাবান লোকের সঙ্গে লড়াইর সুযোগ হল। সারা পথ আসতে আসতে কত ছবি এঁকেছি, আমার বীর, আমার রাজা বলে তুমি আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছ, নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে কত সোহাগ করছ, হরিমতীকে উদ্ধার করার দুঃসাহস দেখানোর জন্য অজস্র চুম্বনে পুরস্কৃত করেছ। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! স্বপ্ন শুধুই মিথ্যে, আমার কপালে শুধুই তিরস্কার আর ভৎসনা।

লক্ষ্মী কপট রাগ দেখাল। চোখের কটাক্ষে কৌতুক ঝলকিয়ে উঠল। সোহাগের গলায় বলল : অসভ্য! সব কিছুতে পরিহাস। লক্ষ্মীর এই

মুহূর্তের মুগ্ধতা অবাধ্য হয়ে উঠল। ভাল লাগার অবেশের মধ্যেই বলল ঃ ছেলেমানুষের মত আব্দার। কথাটা শেষ করেই এধার ওধার দেখে নিয়ে সে নিমাইর ফর্সা গালে লাল টুকটুকে ঠোঁটে চটপট দুটো চুমু দিল। বলল ঃ খুশিত? এবার যা বলব লক্ষ্মীছেলের মত শুনবে।

নিমাই তার মুগ্ধতাকে চট করে লুকিয়ে কৌতুক করার অভিপ্রায়ে বলল ঃ আমি বাপু লক্ষ্মীর ছেলে হতে পারব না, তার ছেলের বাপ হতে বরং পারি।

লক্ষ্মী নিমাই এক সঙ্গে হাসল। বড় সুন্দর আর তৃপ্তির সে হাসি। তারপর কেমন অদ্ভুত এক মায়াবী চোখে নিমাইর দিকে চেয়ে বলল। গালে টোকা দিয়ে বলল ঃ দুষ্টু। ভীষণ দুষ্টু হয়েছ আজকাল। সব তাইতে কথা ধর। কিন্তু ওসব বলে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

নিমাই মাথা নাড়ল। তার চোখে কৌতুক মুখে হাসি। বলল ঃ পাগল! ফাঁকি কেউ চায়? আমিত ধরা দিতে চাই, বাঁধতে চাই তোমায় বাহুপাশে। হরিণ যেমন সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ নেয়, আমারও ইচ্ছে তোমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে একটু যৌবনের ঘ্রাণ নিই।

লক্ষ্মী হঠাৎ গম্ভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার দুটো হাত উঠে এল নিমাইর বুকের উপর। আলতো হাতে দুম দুম করে কয়েকটা কিল ছোয়াল বুকে। নিরুচ্চারে বলল ঃ আমার বড় ভয় করে গো!

ভয়! কার ভয়? কিসের ভয়?

কাজটা তুমি ভাল করনি। জগাই মাধাইকে নবদ্বীপে সকলে ভয় করে! আমিও ভয় পাই।

এই দ্যাখ ভয়ের কি আছে? সেত একটা মানুষ। ভয় দুর্বলের সম্বল। ভয় একবার ধরলে আর কাটে না। দুশমনরা নতুন নতুন ভয় সৃষ্টি করে দুর্বল আর ভীরুদের জন্যে। এদের উপরে তাদের যত জুলুম আর দৌরাত্ম্য। কিন্তু যাদের সাহস শক্তি আছে তাদের ভীষণ ভয় করে তারা।

লক্ষ্মী চুপ করে থাকে। তার দু'চোখের কোণে জল টলটল করে। গলার কাছে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে রইল। কথা বলতে গিয়ে তার স্বর স্খলিত ও ভেজা হয়। বলল ঃ আমার ভয়টা তুমি কিছুতে বুঝতে চাও না। আমাকে তুমি ভালবাসনা। অভিনয় কর। মন দিলে প্রাণের কথা বুঝতে কষ্ট হত না। জগাই মাধাইর মত ভয়ংকর দানব যে এই হারকে কিছুতে মেনে নেবে না, ভেবেছ কখনও? তারা তোমার শত্রুতা করবে?

নিমাইর মুখে অনাবিল হাসির স্নিগ্ধ দ্যুতি। বলল: তুমি অকারণ ভয় পাচ্ছ। শত্রু আক্রমণ করবে জেনেই রাজা তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে। সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসে না। সত্যের জয় চিরকাল। কৌরবেরা পঞ্চপাণ্ডবের চেয়ে শক্তিশালী হয়েও পরাজিত হল। পশু শক্তিটা বড় কথা নয়।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল লক্ষ্মী। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলল: পৃথিবীতে লক্ষ্মীর মত এমন উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা আর আতঙ্ক নিয়ে যেন কেউ না জন্মায়।

নিমাই হাসল। লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল: দুঃখবোধ থাকে কেবল প্রকৃত মানুষের। তোমার নিজের দুঃখটাকে শুধু দেখলে লক্ষ্মী?—পৃথিবীতে দুঃখী নয় কে? সংসারে সকলে এক এক ধরণের দুঃখবোধ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু দুঃখ বিলাসিতা ভাল নয়।

নিমাইর ঠোঁটের হাসিতে এক আশ্চর্য কৌতুক মাখানো ছিল। লক্ষ্মী কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ঘেরা নিমাইর সুন্দর মুখের প্রাণভরা হাসির লাবণ্য শুধু দেখতে পাচ্ছিল। আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

সময়টা লক্ষ্মীর কাটছিল না। নানা কথা ভাবছিল, এলোমেলো। কত ঘটনা মুহুর্মুহু তার চেতনাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা হলুদ পাখি উঠোনের নিম গাছের ডালে এসে বসল। লক্ষ্মী সেইদিকে চেয়ে রইল। পাখীটাকে দেখতে লাগল। পাখীটা তার মতই একা গাছের ডালে বসে। বৌ-কথা কও বলে কেঁদে কেঁদে কাতর স্বরে মিনতি জানাতে লাগল। লক্ষ্মীর সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে ভরিয়ে ফেলল। পাখীর ঐ মিনতি কার কাছে? কে শুনছে তার ডাক? তবে কি নিমাইর হয়ে তার কাছে মিনতি করছে? কথাটা লক্ষ্মীর মনের ভেতর ঘুরতে লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে যার নাম হাহাকার।

লক্ষ্মীর মনে হতে লাগল ঐ পাখিটার মতই ব্যাকুল হৃদয়ে সে অপেক্ষা করে আছে নিমাইকে পাওয়ার জন্যে। তার নিজের ব্যাকুলতা যেন বৌ-কথা কও পাখির ডাকে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল লক্ষ্মীর। মনে হল, এ হয়ত পাখির ডাক নয, এ তার নিজের অভ্যন্তরের ব্যাকুলতা। লক্ষ্মী দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে কান্না চাপার বৃথা চেষ্টা করতে করতে ফোঁপাচ্ছিল।

এমন সময় বাইরের দিক থেকে নিমাইর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। মা, মা-

গো ডাকতে ডাকতেই সে উঠোনে এসে দাঁড়াল। নিমাইর গলা শুনেই শচী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শচী কোন অভিযোগ করার আগেই সে নিজের অপরাধের কৈফিয়ৎ দিয়ে হাসতে হাসতে বলল: আজও ফের দেরী হল। কি অন্যায় বলত? রোজ রোজ তোমাদের শুধু কষ্ট দেওয়া।

কথাগুলো যে শচীকে বলছিল না, একথা লক্ষ্মীর চেয়ে বেশি কে জানে? সে লজ্জা পেয়েই নিজের ঘরেব দিকে যেতে যেতে শাশুড়ীকে শুনিয়ে নিমাইর দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল। বলল: আপনার ছেলে বোধ হয় বাড়ীর লোকদের বিপন্ন আর বিব্রত করে তুলতে একধরণের আনন্দ পায়। আপনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশী ভাল বোঝেন।

কথাটা যে কত সত্য, শচীও জানে। তাই গায়ে মাখল না। ম্লান হেসে মাথা নেড়ে বলল: চিরদিনই ও একটু ক্ষেপা। ওর ওপর রাগ করলে নিজেরই কষ্ট বাড়বে শুধু।

॥ সাত ॥

নবদ্বীপে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই মতের লোকের বাস ছিল। কিন্তু যারা বিত্তবান তারা সকলে শাক্তমতাবলম্বী। তাদের ঘরের পুরুষরা রাত্রি কাটায় অনুরাগিনী বারবিলাসিনীদের কলকোলাহল মুখর কক্ষে। নাচ গান আর সুরার সাগরে ভাসতে ভাসতে তাদের রাত যে কখন দিন হয়ে যায় টের পায় না। কালক্রমে এদের সকলের আড্ডা এবং সান্ধ্য মজলিশ জমে উঠল নবদ্বীপ জমিদার জগদানন্দ এবং মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রমোদ কুঞ্জে।

জগদানন্দ এবং মাধবানন্দ দুই যমজ ভাই। যমজের জন্যেই হরিহর আত্মা। রাতের সান্ধ্য মজলিশ শেষ হতে হতে মধ্যরাত্র কেটে যায়। তারপর চাকর-বাকরদের তত্বাবধানে বেহুঁস হয়ে যে যার ঘরে ফেরে। জগদানন্দ, মাধবানন্দর অন্দর মহলে ফেরার প্রয়োজন হয় না। মদে বেহুঁস হয়ে তারা বাইজীর নরম বুকের উপর মাথা রেখে জলসাঘরেই পড়ে থাকত। সুরার ঘোর গিয়ে ভোর হতে হতে এক প্রহর বেলা শেষ হত। তারপর প্রাতরাশ করে সেরেস্তায় গিয়ে কিছুক্ষণ বসত। সেরেস্তায় বসতে বসতে দ্বিপ্রহর হয়ে

যেত। অপরাহ্নের সূচনায় মধ্যাহ্ন ভোজন পর্ব। তারপর একটু সুরা পান করে বিশ্রাম এবং দিবানিদ্রা। অন্দর মহলের মহিলাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। এ হল দুই ভাইর রোজগার জীবন।

এই জীবনযাত্রার মূল্য দিতে হত সাধারণ মানুষকে। অর্থ এবং প্রমোদ উপকরণ দুই আসত তাদের ঘর থেকে। স্বভাবত এই যোগান অব্যাহত রাখতে জগদানন্দের অত্যাচার, জুলুম, জবরদস্তি, লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি চলত অবাধে। দেশের শাসক চাঁদ কাজীর কাছে নালিশ করে কোন ফল হত না। কাজী নির্বিকার থেকে এই অত্যাচার আর অনাচারের ইন্ধন যোগাচ্ছিল। এই সংকট সমস্যা হিন্দুর ঘরোয়া সমস্যা মনে করত। বিধর্মী একজন শাসকের হিন্দুর জীবনযাত্রাব উপর হস্তক্ষেপ করা দোষের মনে করত। তাই নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল।

লম্পট, অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃংখল জমিদার জগদানন্দ এবং মাধবানন্দকে লোকে ভয় করত কিন্তু সম্ভ্রম দেখাত না। লোকচক্ষে ত ারা খুব ছোট হয়ে গিয়েছে। তারা পিতৃদত্ত নামের গৌরব ও মর্যাদা হারিয়ে লোকের কাছে শুধুই জগাই-মাধাই। যেন দুটি দুর্বৃত্তের নাম। তার অনুগামীরা হল জগাই মাধাইর দল।

প্রভাতী জলযোগের সময় রোজই জগদানন্দ মাধবানন্দের যত কাজের আর খোশ গল্প হয়। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তারা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে যায়। কখনও বা থালায় হাত দিয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'জনেই যেন কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু কেউ আগে মুখ খোলে না। কিন্তু জগদানন্দ ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কারণ কথাটা তাকে নিয়েই। বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জগদানন্দ মরিয়া হয়ে বলল : নিমাই শালা বড় বার বেড়েছে। সাহস দিন দিন শালার বেড়ে যাচ্ছে। আমার ল্যাজেও পা দিয়েছে।

জগদানন্দ ভণিতা করলেও ব্যাপারটা মাধবানন্দ জানে। সেরেস্তায় গোমস্ত পরমেশ চৌধুরী তাকে গোপনে সংবাদটা দিয়েছিল। কথাটা শোনা থেকে তারও মন খারাপ হয়েছিল। প্রাণের ভাইকে নিয়ে এই উপহাসের কথাটা বলতে মাধবানন্দ একটু বেদনা বোধ করছিল। তাই সে গোটা ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল। সে চাইছিল জগদানন্দ নিজে থেকে বলুক। সেই কথাটাই জগদানন্দ বলছে, এটা বুঝে নিয়েই মাধবানন্দ না জানার ভাণ

করল। কৌতূহল প্রকাশ করে বলল: নিমাই আবার করল কি?

জগদানন্দ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল একবার। আক্রোশে তার মুখখানা কঠিন দেখাল। ডান হাতখানা মুষ্টি বদ্ধ করল। গর্জন করে বলল: করছে না কি? শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধটাকে জিইয়ে তুলছে।

মাধবানন্দ নিরীহভাবে প্রশ্ন করল: কেমন করে বুঝলে?

জগদানন্দের দুটি চোখ গোল গোল হল। বলল: বুঝলাম। আমাকে যা বলেছে, শুনলে মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠে। কথাটা আমাদের দুজনকেই লক্ষ্য করে বলা। এত স্পর্ধা শালা, পেল কোথা থেকে? দু'পাতা সংস্কৃত পড়ে শালা নবদ্বীপের মাথা হয়ে গেছে। দেখাচ্ছি শালাকে?

মাধবানন্দ তার ক্রোধটাকে চট করে লুকিয়ে বলল: কি হয়েছে বলবে'ত? খামকা উত্তেজনা দেখালে সব গোলমাল হয়ে যাবে। তুমি বল, কি হয়েছে?

কঠোর হয়ে উঠল জগদানন্দর ভারী মাংসল মুখখানা। তার রক্ত চক্ষু ধু ধু করল, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের মত জ্বলতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল: শালা পরমেশকে বলেছে, জগদানন্দ একজন মানুষের মত মানুষ। কেউ তাকে মানুষ ছাড়া জানোয়ার বলবে না। মানুষের মতো দুটো হাত, পা, চোখ, কান। মানুষের মতনই মুখের ভাষা সংসারের সমাজে ওরকম আকৃতির লোককে সকলে মানুষ বলে জানে। জানোয়ার মানুষের তফাৎ শুধু আকৃতিতে।

মাধবানন্দ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: হুম। পণ্ডিতদের সঙ্গে লড়াই শেষ করে এবার আমাদের বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছে। হরিমতীর ব্যাপারটাই তাকে সাহস যুগিয়েছে। এখন একটা কিছু করার দরকার।

জগদানন্দ মাধবানন্দের কথা শুনছিল না। স্তব্ধ হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অন্যদিকে। দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে চাপা ক্রোধে বলল: জানোয়ার কে নয়? সব পুরুষই নারী মাংসলোলুপ হিংস্র পশু। শালা নিমাই তুইও—বাকী কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে থমকে গেল। জিভ আড়ষ্ট হল। ঢোক গিলল। তারপর বলল: বৈষ্ণব আর শাক্তধর্মের মধ্যে আকাশ জমিন ফারাক। নারী হল শাক্তের সাধনার উপাচার। যে জৈবশক্তি জীবন রথ টেনে নিয়ে যায় তার নিগূঢ় প্রেরণার শক্তি লুকিয়ে আছে নারীর ভেতর।

নারীর ভেতর আছে মহাশক্তি রূপিনী দেবী। তাকে জাগ্রত করতে হয়,

আয়ত্ত করতে হয়। জগদানন্দ কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে ছিল। সে যেন ঝাড় বাতির আলোয় উজ্জ্বল প্রদীপ্ত নারীর সম্পূর্ণ নগ্ন দেহের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে অস্ফুটস্বরে বলল: বিধাতার দান এই নারীদেহ। প্রতি রোমকূপে এর উল্লাস, উন্মত্ততা, উত্তেজনা। একে পাওয়ার জন্যে উন্মাদ হলে দোষ হবে কেন? নর-নারীর দেহগত মিলই শাক্তপন্থীদের সাধন পদ্ধতি। একমাত্র মিলনের সময় সাধকের ধ্যানস্থ অবস্থার চূড়ান্তে পৌঁছনো যায়।

মাধবানন্দ গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথাগুলো শুনছিল। উল্লসিত হয়ে বলল: ঠিক। আমার মনের কথা বলেছিস। মিলনের মুহূর্তে একটা মহৎ উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সমস্ত চেতনা। আর তীব্র একটা সুখে, তৃপ্তিতে, আনন্দে অন্তরটা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। চোখ দুটো সাধকের মত বুজে আসে। সব মিলিয়ে অনন্ত মহিমার কাছে নিবেদনের এক সকরুণ ব্যাকুলতা জাগে। এই জন্যেও শাক্তধর্মের সঙ্গে জীবনধর্মের বিরোধ নেই। সব ধর্মমতই শাক্তদের ঈর্ষা করে। শেষে শাক্তদের পথ ধরবে।

পরম আবেগে চোখদুটো বুজে এল জগদানন্দের। কিন্তু তার চেতনার ভেতরে, সত্তার ভেতরে নিমাইর অস্তিত্ব এবং তার পরিহাস কাঁটার মত বিঁধছিল ক্ষণে ক্ষণে। বুকের ভেতরটা রাগে তোলপাড় করছিল।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটল উভয়ের।

জগদানন্দ কিছু একটা উপায় খুঁজে পাওয়ার জন্যে খুব চিন্তিত ও অন্য-মনস্কের মত সামনে রক্ষিত দুধের গ্লাসে চুমুক দিল। কেমন উদভ্রান্ত আর নিস্পলক দৃষ্টিতে মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে তীব্র অসহায়তার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েই যেন বলল: কিছু একটা করতে হবে। তারপর বেশ একটু অস্বস্তিতে বলল: কিন্তু নিমাই শালা খুব শক্ত মানুষ! তাকে বশ করা আরো শক্ত। বেটা কি ধরণের বামুন বুঝি না। বামুনের ঘরে ছেলে হয়ে ম্লেচ্ছদের ঘরে ওঠবোস করে। তাদের প্রশস্তি করে বেড়ায়। শালার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবার জন্যে তর্কচূড়ামণিকে পাঠালাম। তর্কচূড়ামণি শালার বাড়ীতে গিয়ে কথাগুলো বেশ মাখ মাখ করে বলল: নিমাই তুমি ঈশ্বর বিশ্বাস কর?

নিমাই বলল: ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করবে কে? এই জগত তাঁর সৃষ্টি।

তর্কচূড়ামণি মৃদু হেসে বলল: ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করল তখন তাঁর থেকে জন্মাল ব্রাহ্মণ আর তাঁর পদদ্বয় থেকে হল শূদ্র। শূদ্রেরা কত ছোট সে

কথা ভেবেছ কখনও ?

তর্কবাগীশ নিমাই তৎক্ষণাৎ হাসতে হাসতে বলল : ঈশ্বরের পা থেকে যদি শূদ্র সৃষ্টি হয়ে থাকেন তবে তারা ছোট হবে কোন যুক্তিতে। মস্তকের মত পদদ্বয়ও ঈশ্বরের অঙ্গ। পদদ্বয় কি তাঁর মস্তকের তুলনায় হীন, অথবা অস্পৃশ্য ? আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসীরাই ঈশ্বরের পাদপদ্মেই প্রণাম জানিয়ে থাকি। সেই পাদপদ্মে যদি শূদ্রের জন্মস্থান হয় তা-হলে সমস্ত প্রণাম, তাদের প্রাপ্য। আমি তাদের সেবা করেই ঈশ্বরকে পূজা করছি।

তর্ক চূড়ামণি আর কথা খুঁজে পেলনা। ঘায়েল হয়ে ফিরে এল।

মাধবানন্দ একবাটি দুধ পান করতে গিয়ে নামিয়ে রাখল। বিষণ্ণ গলায় বলল : লোকটা ভীষণ ধূর্ত ! মহা শয়তান। কিছু একটা মতলব আছে মনে। নইলে খামকা ছোটলোকগুলোকে মাথায় তুলবে কেন ?

জগদানন্দ গম্ভীর হয়ে বলল : সমাজ আর শাস্ত্রের বিরোধিতা করলে সহজে লোকের নজর কেড়ে নেয়া যায়। রাতারাতি জনপ্রিয় হওয়া যায়। তাই এসব করে আর কি ?

মাধবানন্দ মাথা নেড়ে বলল : তা ঠিক। তবু লোকটা গুণী। আর পাঁচটা মাতব্বরের মত কথা সর্ব্বস্ব নয় ! লোকটাকে সকলে সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, ভয় পায়। তার নামে বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরা পর্যন্ত আঁৎকে উঠে। তার নামের খ্যাতি আছে। এই খ্যাতির জোরে মানুষের মনে সে একটা ভাবমূর্তি তৈরী করতে পেরেছে। ভারতবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভারতীর পাণ্ডিত্যের সব দর্প, গর্ব, অহংকার সে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। নিমাইকে জয়পত্র লিখে দিয়ে মাথা হেঁট করে প্রস্থান করেছে। এই জনপ্রিয়তাকে সে এখন শাক্তদের বিরুদ্ধে লাগাতে চায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জগদানন্দর গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হতাশ গলায় বলল : তাই'ত মনে হচ্ছে। কিন্তু এসব করে লাভ কি ? ও চায় কি ?

মাধবানন্দর বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় দেখা দিল। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। নিজেকে তার আক্রান্ত এবং বিপন্ন মনে হল। কিন্তু এভাবে'ত নিমাইর কাছে হেরে যাওয়া চলে না। কোন না কোনো ভাবে পাল্লা দিতে হবে তাদের। বুঝিয়ে দিতে হবে তারা তাকে পরোয়া করে না। নিমাইর প্রচ্ছন্ন বিরোধিতার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে সে বলল : নবদ্বীপের মাথা হতে চায়। তাই ছোটলোকদের মাথায় তুলেছে। তাদের নিয়ে আমাদের

বেইজ্জত করছে! ওর ধারণা নবদ্বীপে জগাই মাধাই কেউ না। ওই সব। ওর কথা, ওর শাসানি নবদ্বীপের লোক মেনে চলুক। কোন ভদ্দরলোক শালার পাশে নেই। ছোটলোকদের নিয়ে দল তৈরী করছে। এ সব চোখে দেখেও বসে থাকব আমরা? আমরা কি মরে গেছি, না বেঁচে আছি?

জগাই ভূরু কুঁচকে চেয়ে ছিল। মাধাইর কথায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল: বটেইত! আমরা মরে গেছি? ঐ ছোটলোকেরা কে? এই সমাজে তাদের অস্তিত্ব কোথায়? তারা কি দেশটাকে চালায়? ওরা'ত খেটে খাওয়া মজুর, মাঠের চাষী, ছা-পোষা নিজ নিজ বৃত্তিধারী কতকগুলো নামহীন মানুষ। ওদের কি আছে? ওরা আমাদের জব্দ করার কি বোঝে? ওরা কি মনে করে, নিমাই ওদের হাতে স্বর্গ তুলে দেবে? নির্বোধ! সরল মানুষ। বোঝে না, বুঝতেও পারে না, নিমাই ওদের নিয়ে কি খেলা খেলছে। ওরা নিমাইর পাশা খেলার ঘুঁটি। নিমাইকে ওরা সামান্যই জানে। কিন্তু জগাই মাধাই কে, কিরকম স্বভাবের—ভাল করেই জানে। শোন মাধাই, আমরা আর চুপ করে থাকব না। আমাদের নীরবতাকে নিমাই দুর্বলতা বলে ভাবছে। এবার নবদ্বীপের মানুষকে জানানোর সময় হয়েছে যে নবদ্বীপে জগাই-মাধাইর প্রভুত্ব এখনও আছে এবং থাকবে। নিমাই কি করল, ছোটলোকেরা কি চাইল আর বুঝল না ওসব পরোয়া করব না। এই নবদ্বীপে আমরা যেমন চলছি তেমনি চলব। এখানে আমাদের রাজত্ব চলবে। নিমাই কেউ নয়।

মাধাই মাথা নেড়ে বলল: ঠিক কথা। নিমাইর হাতের অস্ত্র ঐ ছোট-লোকগুলো। ওরা নিমাইর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। কিন্তু জগা আমাদের জন্যে প্রাণ দেবার মানুষ কেউ নেই। তাই একটু সমঝে চলতে হবে।

জগাই হুংকার দিয়ে বলল: কেন? নিমাইর অস্ত্র আমি কেড়ে নিয়ে ওকে চিরদিনের মত অকেজো করে দেব। কাকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি। নিমাইর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াইর আগে ঐ ছোটলোকদের উপর প্রতিশোধ নেব। মরীচিকার পেছনে ছুটলে কি মারাত্মক ফল হয় তা ওদের জানা দরকার। এখন থেকে হয় ওরা আমাদের মেনে চলবে, নয় ধ্বংস হবে। ওদের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে পাড়াকে পাড়া জ্বালিয়ে দেব। সামান্য ধন সম্পদ যা আছে লুঠ করে ওদের সর্বস্বান্ত করব। লোকে জানুক জগাই মাধাইকে হারানো সহজ নয়। তাদের হারাতে পারে এমন শক্তি এখনও

জন্মায়নি। ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা যাতে মাথা চাড়া না দেয় তার জন্যে একটু নিষ্ঠুর হতেই হবে। মানুষ শক্তের ভক্ত। শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরলে জনগণ নিমাই শালাকে ত্যাগ করবে।

মাধাই জগাইর চোখে চোখ রেখে দুধ পান শেষ করল। বেশ একটা হাসিখুশি প্রসন্নতায় তার চোখ মুখ ঝকঝক করছিল। মৃদু হেসে বলল: ঠিক। ঈশ্বরও তার অবাধ্য ভক্তকে নানাভাবে জব্দ করে, পীড়ন করে, দুর্ভোগে ফেলে তার ভক্তি আদায় করে। আমরা যদি দেবতার পথ ধরে তাদের কব্জা করি তা-হলে নিমাই ঠাকুরের চটা চটির'ত কিছু নেই! দেবতাদের দোহাই দিয়ে আমরাও দোষী হব। পার পেরে যাব।

জগাইর মুখের হাসি বেশ একটু গোলাকার হল। বলল: যুক্তিটা তুই দারুণ বাতলেছিস।

মাধাই উল্লসিত হয়ে বলল: নবদ্বীপে নিমাইর খেলা শেষ।

জগাই হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল: ওই নাম আর উচ্চারণ করিস না। শালা আমাদের শত্রু। আমাদের প্রতিপক্ষ। শালাকে আমাদের হারাতে হবে। যদি এজন্য হাজার অন্যায় করতে হয় তবু। নিজেদের অধিকার আব কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য কে করেনি অন্যায়? রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ সকলেই করেছে। আমরাও কবব। এত সনাতন কথা।

গঙ্গায় স্নান সেবে নিমাই গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় শুনল জগাই মাধাইব দল মধ্য রাতে বাগ্দীপাড়ায় খুব হামলা করেছে। হরিমতীর উপর অত্যাচার করেছে। নিরীহ মানুষগুলোকে মারধোর করেছে, শাসিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে। খবরটা নিমাইর মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। তাদের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করে বুকটা তার হাহাকার করে উঠল। যন্ত্রণার মত একটা কষ্টে বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছিল। কিছু ভাল লাগছিল না।

গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে তার বারংবার ভুল হচ্ছিল। কিছুতে ধ্যানে মন বসছিল না। কল্পনায় সে বাগ্দীপাড়ার মানুষগুলোর মার খাওয়ার দৃশ্য দেখছিল। তাদের সহিষ্ণুতা অবাক করল তাকে। তাদের এই নির্যাতন এবং দুঃখ ভোগের মূলে আছে সে। তাদের অপরাধ তারা নিমাই পণ্ডিতকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে। তার বাধ্য ও অনুগত হওয়ার জন্যেই তাদের এই দণ্ড পেতে হল। তাদের এই দুঃখভোগের বেদনা নিমাইকে স্বস্তিতে থাকতে

দিল না। তার ভেতরটা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। পাষণ্ডদের কি ধারণা, মানুষের পবিত্র ভালবাসা আর গভীর বিশ্বাস নির্যাতন করে মুছে ফেলা যায়? এরা দুর্বল, ভীরু, অসহায় বলেই এদের উপর অত্যাচার করা সহজ। তাই কাপুরুষেরা তার সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে নামতে সাহস পায়নি। কিন্তু তারা বুদ্ধিমান। তার দুর্বলতম স্থানটিতে ঠিকই আঘাত হেনেছে। এদের দুর্ভাগ্যের জন্যেই নিমাইর কষ্ট। এরা লাঞ্ছিত হয়, বঞ্চিত হয় তবু কারো কাছে তাদের নালিশ নেই, অভিযোগ নেই, প্রতিরোধ নেই, বিদ্রোহ নেই। কেবল বিধাতার কাছে বুকভরা হাহাকারে প্রার্থনা করে: হে দীনবন্ধু তুমি আবির্ভূত হও। একটু তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হও আর যে পারি না। তাদের সেই অসহায় কান্না আর আকুল ডাকে বৈকুণ্ঠের নারায়ণের হাত কোনকালে ঘুম ভাঙবে না। কিন্তু তাদের কাতর আর্তনাদে তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

নিজের অন্তরের মধ্যে একটা বড় কিছুকে অনুভব করল নিমাই। লাঞ্ছিত নির্যাতিত এই নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলোর ভেতর নিমাই তার স্বদেশকে দেখতে পেল। তার মনে হল, এই মানুষগুলোর জন্যে তার কিছু করার আছে। অদ্বৈত আচার্যের মত এই সব সাধারণ মানুষগুলোও বিশ্বাস করে তাদের বৈকুণ্ঠ তার ভেতরে ঘুমিয়ে আছে! তাকে কেবল জাগাতে হবে। কথাটা নিমাইর গায়ে কাঁটা দিল। বুকটা থর থর করে কেঁপে উঠল। ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত অকারণ আনন্দ ঢেউ দিতে লাগল। আর বারংবার মনে হতে লাগল, মানুষের মূল্য সৃষ্টিকর্তা দেন না, দাম মানুষই দেয়। ভালবাসার রঙীন চোখ দিয়ে নবদ্বীপের ভদ্র অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষ তাকে দেখে। তার সব কিছুই তাদের চোখে অদ্ভুত। তাদের জীবনে এক অমূল্য রত্ন সে। কেন যে তাকে এই এত বিরাট করে তারা চিন্তা করে নিমাই ভেবে পায় না। তবু তাদের এই অন্তহীন বিস্ময় কৌতূহল, অনুরাগ, বিশ্বাস তার ভাল লাগে। ঈশ্বরকে পৃথিবীতে কেউ কখনও আবির্ভূত হতে দেখেনি! তবু মানুষ সব ব্যাপারে একটা অলৌকিক কিছু চিন্তা করতে ভালবাসে। মনে মনে আশার সৌধ গড়ে তোলে। তাকে নিয়ে এই আশার সৌধ সৃষ্টি। তাকেই জীবনের পরম আশ্রয় বলে ভেবে নিচ্ছে। তার উপরেই তাদের মুক্তির সব ভাব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকছে। নিঃস্ব, নিপীড়িত, দুঃখী লাঞ্ছিত অথবা ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের এই আত্মপ্রসঙ্গ বিশ্বাস এবং সামান্য অবলম্বনটুকুকে আঘাত করে ভেঙে দিতে তার কোমল অন্তরে ব্যথা পায়।

হুতাশায় পৃথিবীতে তারা স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যয়ের কোন কাজই তার করা হয়নি। তবু মানুষ তার ভেতর নিদ্রিত দেবতাকে দেখতে পায়।

মানুষের অগাধ বিস্ময়, অন্তহীন কৌতূহল মাঝে মাঝে নিমাইকে অবাক করে দেয়। আশ্চর্য হয়ে 'স নিজের সম্পর্কে কত কি ভাবে। তবু নিজের অদ্ভুত কাজকর্মের কোন তল খুঁজে পায় না। অথচ তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন অসাধারণ কিছু আছে যা সকলের ঊর্ধ্বে উঠতে তাকে সাহায্য করেছে। মানুষের মনে তার একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরী হয়েছে। যদিও কিছু মানুষ তার বদনাম করে, নিন্দা করে তবু তাদের শ্রদ্ধা বঞ্চিত নয় সে। সে নিজেও ভাল করে জানে না, শিশুকাল থেকে নবদ্বীপের সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তি হল কেন? কি আছে তার ভেতর, যা দেখে মানুষ পাগল হয়। সে ত কোন অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়, তবু লোকের চোখে সে অসাধারণ মানুষ। বুদ্ধি, অভিজ্ঞতায় সে নাকি আঁটে না। এসব তাদের কোন অতিরঞ্জিত কথা নয়। সে নিজেও জানে, এমন অনেক কিছু ঘটছে যার ব্যাখ্যা সে নিজেও দিতে পারে না। ঈশ্বরপুরীর মত সাধক, অদ্বৈতাচার্যের মত মহাপণ্ডিতও ভক্ত; কেশব ভারতীর মত মহাজ্ঞানী সরস্বতীর বরপুত্র, বিদ্বান শ্রেষ্ঠ অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সব মানুষ তার মত একজন সর্ব বয়ঃ কনিষ্ঠ তরুণের বাক্যে প্রীত ও মুগ্ধ হল কি করে সেটাই বিস্ময়ের কথা। কোন মায়ামন্ত্র বলে সে এঁদের হৃদয় জয় করল? কে তার ভেতর এই শক্তি সাহস সঞ্চার করল? কে সেই?

অদ্বৈতাচার্যের কথাগুলো মনে পড়ল। নিমাই তুমি কে জানি না! তবে তোমাকে দেখে কেন যেন মনে হয় মাটির পৃথিবীর কর্মশালায় এক অদৃশ্য কর্মকার তোমাকে এক অন্য মানুষ করে গড়ছে। পৃথিবীর প্রয়োজনে মহাকাল তোমাকে একটু একটু করে তৈরী করছে। অথবা পৃথিবীর প্রয়োজনে তুমি নিজের ভেতর নিজেই তৈরী করছ। কেউ কাউকে তৈরী করে দিতে পারে না, সে নিজেই তৈরী হয়। দেশ কাল পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা।

নিমাইর এই মুহূর্তে মনে হল, জগাই-মাধাই-কাজীর দুঃশাসন তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কিন্তু মানুষের এই দুর্গতি, দুঃখ, দুরবস্থা ত শুধু নবদ্বীপের সমস্যা নয়, গোটা বাঙলার সমস্যা। বঙ্গদেশের সীমান্তের বাইরেও চলেছে

অবাধে। তাকে সমূলে উৎপাটিত করার কি ক্ষমতা আছে তার? পারিপার্শ্বিক যখন তার উপর প্রতিশোধ নিতে আসবে তখন সে তার সামান্য শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, হয়ত বা মানুষের মনে ইতিহাসের পাতায় একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাবে। কিন্তু তাতেই মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার থেকে মুক্ত হবে না। তাহলে মানুষের মুক্তি আসবে কি করে? কী করে মানুষ এই বোঝার ভার বয়ে বেড়াবে? কে ইতিহাস এগিয়ে নিয়ে যাবে? পৃথিবীতে চিরকাল সহায় সম্বলহীন মানুষ ইতিহাসের রথ টেনে নিয়ে যায়। নিঃসম্বল শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ল। অসহিষ্ণু সমাজের একজন প্রতিনিধি সে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তেজ, সাহস, বুদ্ধিবল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ হতভাগ্য, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মথুরাবাসীকে স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের নাগপাশ থেকে উদ্ধার করেছিল। সে স্বেচ্ছায় মানুষেব অবমাননার কষ্ট দুঃখকে অতিক্রম করার জন্যে বিরাট কিছু পাওয়ার অশান্তি মাথায় করে নিয়েছিল। দেশের সাধারণ এই সব অসহায় বিপন্ন মানুষকে নিয়েই'ত ইতিহাস। পৃথিবীর মানুষকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে, মানুষকে আরো সুন্দর করার জন্যে, পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্যে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের মত একজন মানুষ জন্মায়। এদের কাছে পথটাই সত্য। চলাটাই একমাত্র নিয়ম। পথের বাধা বিপত্তিটা কিছু নয়। তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায় অবারিত পৃথিবীর দিকে।

নিমাইর বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। গায়ে কাঁটা দিল। ভিতরে কি যেন একটা বাঁধ কাটছিল। এই সংসারে নবদ্বীপের গণ্ডীর মধ্যে তার সত্তা আর বাধা থাকতে চাইছে না। সামান্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না। সে চায় অনন্ত বিস্তার। তার কপালে আছে জন্মগত রাজটীকা। কার সাধ্য তাকে ঠেকিয়ে রাখে? মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে যে তার আসন পাতা। সেখানে ইতিমধ্যেই তার অভিষেক হয়ে গেছে। সে একটা কিছু হবে। হবেই। এ ঈশ্বরের অভিপ্রায় তার ভাগ্যফল।

নিজেকে প্রশ্ন করল নিমাই। শুধু নবদ্বীপে নয়, বাংলা দেশেও সে সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি। কেন তার লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, তেজ সাথে নিয়ে এরকম নানারকম গল্পই বা কেন? মাঝে মাঝে নিজের কানেও সেইসব অদ্ভুত গল্প শুনেছে। কিন্তু তাদের সেই অতি লৌকিক বিশ্বাসের

সঙ্গে নিজের পছন্দ অপছন্দকে যুক্ত করেনি কোনদিন। মানুষের মনে স্বাধীনভাবেই তা শুধু বেড়ে উঠেছে। বাল্য থেকেই অবশ্য জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলো হৃদয় দিয়ে দেখা ও বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করার মত এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার মধ্যে। একটা অন্তর্দৃষ্টিও ছিল তার ভেতর! মানুষের কষ্ট-দুঃখ, অসহায় অবস্থাটাকে ছোট থেকে চিনে নিতে কোন ভুল হয়নি। ঐ ছোট্ট বয়সে সে মর্ম দিয়ে অনুভব করেছিল নবদ্বীপের সাধারণ মানুষ কত অসহায়। এবং তাদের নির্যাতনের দুঃখ বেদনা ভোলার জন্যে প্রয়োজন একজন প্রাণের মানুষ। নিজেকে তাই সে উৎসর্গ করেছিল। তাদের ভালবেসেছিল, তাদের শুভ ও কল্যাণ কামনা করেছিল। তারা তাকে পরিত্রাতা বলে ভেবে নিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস, নির্ভরতা যে মিথ্যে এটাই প্রসার করার জন্যে জগাই মাধাইর মত পাষণ্ডেরা ক্ষেপে উঠেছে। এক ঠাণ্ডা সামাজিক লড়াইতে নেমেছে। লক্ষ্য'কে আঘাত হানার জন্যে প্রতিপক্ষরা, বিরোধীরা এক অদ্ভুত কৌশল গ্রহণ করেছে। "বৌকে মেরে ঝিকে শেখাবার" নীতি নিয়েছে তারা। সমাজে যারা দুর্বল, অসহায়, দরিদ্র, ব্রাত্য বঞ্চিত তাদের নিগৃহীত করল। এরা ভাল করেই জানে নিমাইর প্রত্যক্ষ বিপক্ষাচারণ করা সহজ নয়। কেশবভারতীর পরাজয়ের পর সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলী, ব্রাহ্মণ, ছোট বড় মানুষ নিমাইর অনুগত এবং ভক্ত। এ অবস্থায় তার বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। তাই নিমাইর উপর এক পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করল। তার জনপ্রিয়তাকে লোকচক্ষে হেয় করে তোলার এই হীন কৌশলের বিরুদ্ধে যদি সে এই মুহূর্তে রুখে দাঁড়ায় তা-হলে সাধারণ মানুষের নির্যাতনের দুঃখ কষ্ট শুধু বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে সংঘাত এড়িয়ে চলাই উচিত বলে মনে হল। নিজের স্বার্থে এই সংঘাত অনিবার্য করলে তারই সুনাম নষ্ট হবে। তা-ছাড়া সংঘাতের জন্যে যারা তৈরী, যাদের নীতি হল সংঘাত বাড়ান এবং গণ্ডগোল সৃষ্টি করা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা প্রকৃষ্ট জীবন নীতি। প্রতিপক্ষকে তার মুখ্য অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে নেই। এই সংঘাতের লক্ষ্য সে। সুতরাং সে যদি নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যায় তা-হলে ব্রাত্যদের উপর অত্যাচার করার কোন মজা খুঁজে পাবে না পাষণ্ডেরা। উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে গেলে তারাই নিবৃত্ত হবে।

কথাটা নিমাইর মনে লাগল। জগাই মাধাইর দলকে যত বোকা ভেবে-

ছিল তারা তত বোকা নয়। তাদের বুদ্ধিও আছে। তবুও এই সংঘাতে তাদের হারিয়ে দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষকে এধরণের সংগ্রামে জড়ানো বিপজ্জনক। ভাল করে তাদের সংগঠিত না করে, কোনরকম সংঘর্ষে সে যেতে চায় না। কারণ এ সংঘর্ষ পাষণ্ডদের সঙ্গে সৎ-নাগরিকের অন্তর্বিরোধের শুরু শুধু। এই লড়াই থেকে রেহাই নেই, পলায়নের পথও নেই। সুতরাং এখন জনগণের স্বার্থকে নিরাপদ করতে হলে বাইরে থেকে তার কাজ করার দরকার আছে। মানুষের স্বার্থে কূট কৌশলী, প্রাজ্ঞ সমাজ নেতার ভূমিকায় নেমে আসার আগে তারও জেনে নেয়া দরকার ভিন্ন স্থান, কাল ও পরিস্থিতিতে মানুষকে আহ্বান করার শক্তি কতখানি? নবদ্বীপের লোকের চোখে সে সার্থক পুরুষ। খ্যাতি-প্রতিপত্তি তার দেশ জুড়ে। কিন্তু সেই নেতৃত্বের মধ্যে কতখানি ফাঁক ও ঝুঁকি লুকিয়ে আছে তার কোন পরীক্ষা হয়নি। দেশের বাইরে গেলে জানা যেতে পারে ছোট ছোট মানুষের উপর বড় আদর্শের আলো এসে পড়লে তারা কতখানি বড় হয়ে যায়, কতখানি তাদের জীবন উদ্ভাসিত হয়, কতটা দুর্বলতা কেটে যায়। নিমাই আজ এই মুহূর্তে স্থির করে ফেলল, মহান জন সংকল্পে যোগদান করার আগে সে নিজের ব্যক্তিত্ব, ও ক্ষমতাকে একবার ভাল করে যাচাই করে নেবে।

একটা খুট শব্দে নিমাইর তন্ময়তা ভঙ্গ হল। মুখ ফেরাতে শচীকে দেখতে পেল। শচী নির্ণিমেষ চোখে তার দিকে চেয়েছিল। মায়ের মন নিয়ে সে নিমাইর অস্থিরতাকে টের পেল। নিমাইর ভাব ভঙ্গিতে সহজ স্বাভাবিক ভাবটি ছিল না। শচীর দিকে তাকাতে গিয়ে কেমন একটা বিব্রত ভাব তাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। তাতেই শচীর মনটা আশংকায় দুলে উঠেছিল। ছলছলে করুণ চোখে কি গভীর মায়া নিয়ে সে তাকিয়ে আছে নিমাইর দিকে। স্খলিত ভেজা গলায় ডাকল ঃ নিমাই! কণ্ঠস্বরে আর্তি বাজল ঝংকারে।

নিমাই চমকাল। তার বুকের ভেতর ধুকপুক্ করে শব্দটা আরো দ্রুত হল। চোখের চাহনিতে কেমন একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতার ভাব। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। বলল ঃ মা তুমি কিছু বলবে?

আমার বড় ভয় করছে। তোকে আজকাল ভীষণ অন্যমনস্ক আর উদাসীন দেখি।

মা আমি ভাল আছি। তোমার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই। বাগ্দী পাড়ার ঘটনায় আমি বড় আঘাত পেয়েছি। আমার মনটা ভাল নেই। কিছু

একটা করা দরকার।

শচীর মূর্ছারোগীর মত এক অসহায় কষ্টকর অবস্থা সহসা তার চোখে মুখের রেখা ও রঙ বদলে দিল। থমথমে গলায় বলল : নিমাই, ওই সব গুণ্ডা, বদমাস লোকদের সঙ্গে কোন রকম বিরোধে যাবি না, তুই আমায় কথা দে।

নিমাইর অধরে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। বেশ একটু ফাঁকা আওয়াজ করেই হাসল। কারণ, নবদ্বীপের বাইরে যাওয়া সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা তার পক্ষে কতখানি সম্ভব হ'ত জানে না, কিন্তু নিয়তিই তার পথটাকে হঠাৎ খুলে দিল। জননীর এই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠাকে সামাল দেয়ার সুযোগ নিয়ে নিমাই বলল : বেশ তাই হবে। কিন্তু এখানে থাকা আমার আর নিরাপদ নয়। শীঘ্রী আমাকে নবদ্বীপ ছাড়ার অনুমতি দাও।

শচী চমকাল। মুখে তার অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। দুই চোখে সুনিবিড় ব্যথা ঘন হয়ে উঠল। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতার ঢেউ তার বুকে দাপিয়ে বেড়াল। সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল। একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগে সে কান্না গিলে গিলে বলল : তুই ছাড়া কে আছে আমার। শেষে তুইও আমার বিশ্বরূপের মত ছেড়ে চলে যাবি। কষ্ট হবে না। জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় শচী ঠোঁট টিপে টিপে কাঁদল।

শচীর আশংকা ও উদ্বেগে নিমাইর হৃদয় ভারাক্রান্ত হল। সে একটু দিশেহারা বোধ করল। থমথমে দুই চোখ শচীর চোখের উপর রাখল। অবরুদ্ধ গলায় বলল : মা তুমিই আমার বন্ধন। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। শুধু কিছুদিনের জন্যে ছেড়ে থাকব। তারপর, আবার ফিরে আসব। তুমি কিচ্ছু ভেব না। তোমাকে ফাঁকি দিয়ে, দুঃখ দিয়ে আমি স্বর্গ সুখ চাই না।

তবু শচীর দুই ঠোঁটে টেপা কান্না। বুকের ভেতরটা তার টাটাচ্ছিল। বলল : নবদ্বীপে যদি তোর জায়গা না হয়, তা-হলে আমরা না হয় শান্তিপুরে গিয়ে থাকি? আমার চোখের উপর থাক বাবা। আমার বড় ভয় করে!

মা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, কিছুদিন পর আবার ফিরে আসব। তুমি আমাকে বাঁধা দিও না। পথ আগলে থেক না। তোমার চোখের জল দেখলে আমি শান্তি পাব না। জননীর চোখের জল সন্তানের শুধু দুঃখ বাড়ায়। তুমি

আমাকে অনুমতি দিলেই আমি যাওয়ার আয়োজন করব।

শচী কথা বলতে পারল না। দু চোখে জলে ভরে গেল।

নিস্তব্ধ কক্ষে তার বিষণ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আঁচলের প্রান্ত দিয়ে দুই চোখ ভাল করে মুছে নিয়ে মাথা নাড়ল। বলল ঃ কোথায় যাবি বাবা ?

পিতৃভূমি শ্রীহট্ট দেখার বড় সাধ হয়েছে। একবার সেখানে যাব।

অপরাহ্ন।

গঙ্গার ধার ধরে নিমাই অদ্বৈতাচার্যের বাড়ীর দিকে চলল। গঙ্গার ফুর-ফুরে হাওয়ায় তার লম্বা লম্বা চুলগুলো উড়ছিল। চোখে মুখে জড়িয়ে ধরছিল। শীতল হাওয়ায় দেহমন স্নিগ্ধ হল, কিন্তু মনে শান্তি ফিরল না। সে শান্তও হতে পারছিল না। বেশ বুঝতে পারছিল, তার ভেতর নিভন্ত আগুনটা বাতাসের সংস্পর্শে জ্বলে উঠেছে। ভেতরে তার উত্তাপ অনুভব করছে। কিন্তু এ আগুণ কিসের ? এ আগুণে তার ভিতরটাই শুধু জ্বলছে। এ দহনের তার কোন সঙ্গী নেই। সে একা নিজের সাথেই তার যত কথা। কি করলে মানুষের মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়, মানুষের জীবন সুন্দর হয়, স্বাভাবিক হয় সে সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

বাগ্দীপাড়ার লোকজনদের নির্যাতন, লাঞ্ছনার কথা ভেবে তার বড় খারাপ লাগছিল। নবদ্বীপ থেকে গেলে লোকে কি বলবে, তাদের অবস্থা কি হবে, এইসব ভাবনা চিন্তায় তার বুকের ভেতর বড় যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণাব কোন ব্যাখ্যা নেই। কেমন একটা কষ্ট বিঁধে থাকে বুকে। একটা ভারহীন শরীরের লম্বা পা ফেলে নিমাই হেঁটে চলল ! অনেকক্ষণ পর নিজের প্রশ্নের উত্তরের সান্ত্বনা খুঁজতে নিজেকে বলা শুধু—যে মানুষ নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যায়না, কেবল চেনা পরিবেশ থেকে ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়, চেনা আলো থেকে যেতে চায় অজানা অন্ধকারে তার জবাবদিহি করার থাকেনা কিছুই।

নিমাইর মুখে গভীর বিষাদ ও ক্ষোভ-অসন্তোষ থমকে আছে। বুকটা তার কেমন করছিল। বুকে একটা পাষাণ ঝুলে আছে।

অদ্বৈতের বাড়ী যখন পৌঁছল তখন আলোর তেজ নেই। পড়ন্ত আলোয়

বিকেলটাকে বিষণ্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। গঙ্গার ওপাড়টা শিমুল ফুলে রাঙা। আকাশ গভীর নীল। মাঝে মাঝে ওড়নার মত সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছিল। নদীতে পালতোলা নৌকোর গতিতে লেগেছে কিছু চলার বেগ। নিমাইর মন প্রকৃতির এই স্নিগ্ধতায় কিছু প্রসন্ন। কিন্তু বাগদীপাড়ার অপমানটা এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে যে প্রকৃতির এসব দৃশ্য কিছুই দেখছিল না। নিদারুণ একটা কষ্টের ভারে ভারী শরীরটাকে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে যেন টেনে নিয়ে এল।

অদ্বৈতের গৃহে সমবেত কণ্ঠে তখন হরিসংকীর্তনের জোয়ার লেগেছে। অঙ্গন জুড়ে সমুদ্রের কলরোল জেগে উঠেছে। নিমাই একটু থমকে চেয়ে থাকে। হরিনাম কীর্তনে বিভোর হয়ে গেছে প্রত্যেকটি মানুষ। দুই চোখ তাদের বোজা। দু'হাত ঊর্ধ্বে তুলে তারা উদ্দাম বেগে নাচছে। কাঁধ পর্যন্ত চুলেও যেন তার ঢেউ লেগেছে। মৃদঙ্গের সঙ্গে কর্তাল বাজছে। কীর্তনীয়রা চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে উন্মত্তের মত নৃত্য করছে। কোনদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। বর্ষাসমাগমে ঘন কালো মেঘের গর্জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন একদল মত্ত ময়ূরী মনের আবেগে বিভোর হয়ে নেচে চলেছে। সে তাদের খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তবু তারা কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। তাদের চেতনায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বাইরের পৃথিবী, সমাজ, সংসার। নিমাইর মন পুলকিত হল। সারা শরীরে এক অব্যক্ত শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। তার হৃদয়ের ভেতরেও সেতারের মধুর ঝংকারের মত বাজতে লাগল। বিড় বিড় করে নিজের মনকে শুনিয়ে বলল : শুধু একটা নামে মানুষ এত পাগল হয়। কি আছে ঐ নামে ?

কথাটা মনে হওয়ার পরেও তীব্র একটা আবেগে ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। অভিভূত আচ্ছন্নতায় নিমাইর অন্তরটা দীন এক অনুগ্রহ প্রার্থীর মত হয়ে গেল। কেমন অবশ হয়ে এল স্নায়ুগুলো। মনে হল ঐ নামকীর্তন মৃদু মধুর স্বরে তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধ্বনিত হল! নাম সংকীর্তন আজ নতুন শুনছেনা, কিন্তু আগে কখনও এরকম অনুভূতি জাগেনি। আজ এই মুহূর্তে একটা মহৎ উদার পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার সমস্ত চেতনা। সমস্ত সত্তার ভেতর ঐ নামের চুম্বক আকর্ষণ তাকে প্রবল বেগে টানতে লাগল। শূন্য কলসের মত তার অন্তঃকরণটা ভরে উঠছিল।

নামকীর্তনে এরকম একটা অনুভূতি যে হয় বিশ্বাস করতে পারছিল না

নিমাই। আবার অবিশ্বাস করবে এমন জোরও পাচ্ছিল না। পারবে কোথা থেকে? সুমন্ত্রিত মন্ত্রস্বরের মত ঐ আকুল করা নাম গান তাকে নিয়ে গেল মহৎ উদার এক অনুভূতির রাজ্যে। এক অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর নিমাইর বারংবার মনে হতে লাগল এই নাম গান বেঁচে উঠার এবং বাঁচিয়ে তোলার ধ্বনি। এই নাম আর সুর যেন মানুষকে অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে।

নিমাইর চেতনা জুড়ে নামল বিহ্বলতা। মৃদঙ্গের ধ্বনিতে সে আর স্থির থাকতে পারছিল না। তার ভিতরে প্রতিক্রিয়াটা শুরু হল এখন, এই মুহূর্তে। নিজের ভেতরে সে একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছিল। গভীর ভাবাবেগে তার তুই চোখ বুজে এল। আরো কিছুক্ষণ বাদে সে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলল। ভক্ত কীর্তনীয়াদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে নেচে নেচে মধুর কণ্ঠে হরিধ্বনি দিল। আর আশ্চর্য, অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে তার সারা শরীর কেমন অবশ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে উদ্দাম বেগে নৃত্য ও গীত হওয়ার পর কীর্তন থামল। হাত তালি নয়, উচ্ছ্বসিত বাহবার উল্লাসধ্বনি নয়, শুধু গদ গদ কণ্ঠে তিনবার হরিনাম উচ্চারণ করে নতজানু হয়ে সকলে মাটি ছুঁয়ে তুলসীমঞ্চ প্রণাম করল। তারপব কিছুক্ষণের জন্য নিথর স্তব্ধতা নেমে এল সেখানে।

দলের ভেতর নিমাইকে দেখে বিস্ময়ে অদ্বৈতাচার্যের তুই চোখ বিস্ফারিত হল। অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুটস্বরে ডাকল ঃ নিমাই! তুমি? আমি ভুল দেখছি না ত?

নিমাইর চেতনার ভেতর তখনও মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে ছিল। কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে নিরাবেগ গলায় বলল ঃ না আচার্য. আপনার দেখার কোন ভুল নেই। আমারই সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। আমার ভেতর একটা অশান্ত অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে অদ্বৈতাচার্য নিস্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল নিমাইর দিকে। তীক্ষ্ণ চোখে নিমাইকে দেখে বুঝবার চেষ্টা করছিল। কিছু বোঝা গেল না।

অন্ধকার ঘরে সেজ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল এক ভক্ত। সেজ বাতির আলো এসে পড়েছে নিমাইর মুখে। একটা মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে তার মুখমণ্ডলে। বুকের ভেতর অদ্বৈতের সামান্য আনন্দের তরঙ্গ ধারা বয়ে গেল।

একটা স্বস্তির শ্বাস পড়ল। তারপর একটু স্মিত হেসে মুগ্ধ গলায় প্রশ্ন করল ঃ নিমাই তুমি কেন এসেছ বললে না ত ?

নিমাই কোনরকম ভূমিকা করল না। সহজভাবে স্পষ্ট স্বরে বলল ঃ নবদ্বীপ ধাম ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি।

বাইরেব বাতাস এক ঝলক ঘরে ঢুকে কি ফেলে একটা শব্দ তুলে চলে গেল। অদ্বৈত চমকে প্রশ্ন করল ঃ কেন ?

বাগ্দীপাড়ার লোকদের উপর জগাই-মাধাইর অত্যাচারটা আমার যতদিন মনে থাকবে ততদিন অপমানটা ভুলতে পারব না। তাদের সঙ্গে আমার লড়াইটাও শেষ হবে না।

নবদ্বীপের বাইরে গিয়ে তুমি এ লড়াই কার সঙ্গে করবে ? তুমি গেলে ভদ্রেতর হিন্দুবা আরো বিপন্ন অসহায় বোধ করবে। পাষণ্ড জগাই মাধাইব জুলুম অত্যাচার অতিষ্ঠ হয়ে বাঁচাব জন্যেই তাবা মুসলমান হবে। তুমিত জান এই দুই নবাধম চাঁদ কাজীর খুবই ঘনিষ্ঠ। বাংলার নবাব হোসেন শাহেব দৌহিত্র বলে চাঁদ কাজীর প্রভাব পতিপত্তি অন্য কাজীর চেয়ে একটু বেশী। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই জগাই মাধাই হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও নির্বিচাবে হিন্দ্ পীডন কবে। মুর্খ বোঝে না; হিন্দুব কত বড় সর্বনাশ করছে। নরাধমকে দিয়ে চাঁদ কাজী কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি নিয়েছে। সাধারণ মানুষ এসব বোঝে না তাই এই অপশাসন চলছে। জানলে চলত না।

নিমাইর দীর্ঘশ্বাস পডল। চোখ বুজে শরীরের গভীর অবসাদ টের পাচ্ছিল। কিন্তু কোন গভীরতর সংকটে পড়লে'ত জীবনকে বোঝা যায় না। বৃহৎ কিছু করার আগে নিজেকে যাচাই করে নেয়ার তাগিদটা তার অন্তর থেকে আসছে। তাই আস্তে আস্তে বলল ঃ সবই বুঝি। তবু নবদ্বীপে আর থাকতে ইচ্ছে নেই। আদর্শ, ন্যায়, নীতি, জনস্বার্থ সব কিছুতে জেতানোর জন্য আরো বৃহত্তর কিছু করা দরকার। নবদ্বীপ থেকে তা করা সম্ভব নয়। নবাব হুসেন শাহের দৌহিত্র বলে চাঁদ কাজীর সাহস, স্পর্ধা, ক্ষমতা একটু বেশি। তার উপর চাপ সৃষ্টির দরকার হয়েছে। সাধারণ মানুষ উপেক্ষার পাত্র নয়' সে খেলার পুতুলও নয়—এটুকু বোঝানোর মত সামান্য একটা পরিবেশ তৈরী হলে দুর্গত দুঃখী মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল হবে।

নিমাই ! চমকানো বিস্ময়ে ডাকল অদ্বৈতাচার্য।

আচার্য, আজ আপনারাই অনেক মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছেন আমাকে। যে ক্ষমতা আমার নেই, অথচ সেই বিরাট ক্ষমতার আমি অধিকারী। এ ক্ষমতার আমি উত্তরাধিকারী নই, আমার অর্জিতও নয়। বহু মানুষ বিশ্বাস করে এক বিপুল গৌরবের অধিকারী করেছে আমায়। আমি তাই চুপ করে থাকতে পারছি না। বিভেদ, ঘৃণায় অন্তঃস্রোতে হিন্দুধর্মের স্বাস্থ্য অনেক দিন ধরে ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হয়ে গেছে। এখন তার ক্ষয়, ধ্বংস ঠেকানো আগে দরকার। কি করলে হিন্দুধর্ম রক্ষা পায়, হিন্দুর কল্যাণ হয় তা স্বচক্ষে দেখার প্রয়োজন অনুভব করছি।

বিহ্বল হতভম্ব চোখে অদ্বৈতাচার্য নিমাইর মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্য হারা হয়ে চেয়ে রইল। মৃদু আনন্দের ঢেউ দিচ্ছিল। স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল : কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে পাষণ্ডেরা তাদের জয় ভেবে আরো বেশী উচ্ছৃংখল হয়ে পড়বে। তাতে হিন্দুর আরো সর্বনাশ হবে।

অন্ধকার জানালার সামনে চুপ করে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে নিমাই। শরীর যেন প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, সংজ্ঞাহীন। নিমাইর স্তব্ধ মূর্তি তার নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি অদ্বৈতাচার্যের বুকের মধ্যে একটু মোচড় দিল। দুটো বড় বড় চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। কিন্তু বিস্ময় নয়। কেমন শূন্য।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতায় কাটল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল : আমি পিতৃভূমি শ্রীহট্ট যাব। কার্যান্তরে ফিরে আসব। আমার স্ত্রী ও মা থাকবে এখানে। সুতরাং পাষণ্ডদের ওসব কথা ভাবার সুযোগ কোথায়?

তারপর কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটল। নিমাই শান্ত গম্ভীর মুখখানা তুলে বলল : আচার্যদেব, আপনার দুশ্চিন্তা আমি জানি। ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে নাম সংকীর্তনের প্রভাব কত গভীর এবং ব্যাপক আপনার চেয়ে ভাল কেউ জানেনা। এই অনুরাগে জাতি-ধর্ম, বর্ণ মত নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্র সকলকে শ্রীহরির নাম গানে মিলিত করার জন্যে হরি সংকীর্তনকে নবদ্বীপময় করে তুলুন। এই নাম বেঁচে উঠার, বাঁচিয়ে তোলার জয়ধ্বনি। বিভেদ অনৈক্যের প্রতিবাদ। মহাসাম্যের জয়গান।

অদ্বৈতাচার্যের শরীর পুলকিত হয়ে উঠল, গৌরবে, আনন্দে। বুকের ভেতর একটা শিহরণ খেলে গেল। এমন করে হরিনামের মহিমা, গরীমা কেউ অনুভব করতে চায় ভাবলেই আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। সর্বাঙ্গ শির শির

করে উঠে। ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে গেল অদ্বৈতাচার্য। অভিভূত গলায় বলল: নিমাই আমি তোমার কথার মর্যাদা রাখতে পারি যেন, নাম আর সুরের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে জাগিয়ে তুলতে পারি। যতদিন তুমি না ফিরছ ততদিন আমি নামগানে মাতিয়ে রাখব মানুষকে। কিন্তু মনে রেখ, তুমি আমার স্বপ্নের রূপকার। আমার ধ্যানের দেবতা। আমি তোমার যন্ত্র তোমার অস্ত্র। তোমাকে মেনে চলাই আমার কাজ।

নিমাই ধীরে ধীরে কিন্তু মোটামুটি দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অন্ধকারে তাকে আর দেখা গেল না।

অদ্বৈতাচার্য নিজের ঘরে ফিরে এল। বুকটা তার কেমন করছে! বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে একটা পাষাণভারে।

পূর্ববঙ্গে নিমাইর যাওয়া খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল। মুসলমান রাজ-শক্তির অবিচারে, অত্যাচারে, অনাচারে সেখানকার হিন্দুরা অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় হয়ে পড়েছিল। সমাজে নেতৃস্থানীয় সামন্ত প্রভু, ভূস্বামী এবং ছোট ছোট হিন্দু রাজাদের সুলতানের কাজী, উজির, আমীর ওমরাহরা, গরুর মাংস খাইয়ে, গরুর ঠ্যাং মাথায় দিয়ে, মুখে থুথু দিয়ে ধর্মনাশ করল। ফলে, সাধারণ হিন্দুরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। এক অনিশ্চিত এবং অসহায় অবস্থার ভেতর হিন্দুদের আতঙ্কে দিন কাটতে লাগল। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করার মানুষ নেই, প্রেরণা যোগানোর নেতা নেই, একটু আশার বাণী শোনানোর মত কোন চারণও নেই। গভীর এক অসহায় তারা স্তব্ধ ও নির্বিকার।

এইসব দুর্গত মানুষদের জন্যে কিছু করার আছে বলে নিমাইর মনে হল। পৃথিবীতে এক একজন মানুষ থাকে যারা নিছক ব্যক্তিমাত্র নয় আরো কিছু। তারা একটা বড় গাছের মত। যাদের ঘিরে অনেক ছায়া, অনেক পাখির ডাক, অনেক ঝড় বাদল রাতের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। নবদ্বীপের মানুষ তাকে সেরকম চোখেই দেখে, কিন্তু, মনে ভাবা এক জিনিষ আর নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করা এবং সত্য হয়ে উঠা আর এক জিনিষ। মানুষের সেই ধারণাকে পরখ করে দেখার জন্যে নবদ্বীপের বাইরে প্রয়োজন হয়ে পড়ল। নিমাই স্থির করল পূর্বপুরুষের ভিটেতে সে যাবে। সেখান থেকে শ্রীহট্ট যাবে।

গোটা পূর্ববঙ্গ সফর করবে। মানুষের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস প্রত্যয়ের সঙ্গে তার অন্তর্লোকের ভুবনকেও নতুন করে একবার আবিষ্কার করা হবে। তাতে মানুষের জীবন ও সমাজে তার প্রকৃত ভূমিকা কি, জানা হয়ে যাবে।

নিমাই নিজের মনের আনন্দের খোঁজেই পূর্ববঙ্গে যাত্রা করল। রাজশক্তি বা সন্দেহের বাইরে থাকার জন্যেই লোককে বলল, জননীর আদেশে বৃদ্ধ পিতামহ, পিতামহীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতেই শ্রীহট্টে যাচ্ছি।

কার্যতঃ বঙ্গদেশে হুসেন শাহের রাজত্বের সর্বস্থানে নিমাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প নিয়ে পূর্ববঙ্গের মাটিতে পা রাখল।

পূর্ববঙ্গে নিমাইর কাছে খুব বিস্ময়ের। যেখানেই গেছে সেখানেই সমাদর পেয়েছে। বুঝতে বাকি রইল না পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, তপন মিশ্র, মুকুন্দ মিলে তার আগমনের পটভূমি তৈরী করে রেখেছিল। তাই নিজেকে কোথাও তার আগন্তুক কিংবা অপরিচিত বোধ হল না। কারো কাছে সে নতুনও নয়। সবাই চেনে তাকে! তাদের ভেতর শুধু দেখাশুনা নেই। নিমাইর সর্বদাই মনে হয়েছে সে নিজের গৃহে আছে। পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলেই তার সঙ্গ লাভে আকুল! দলে দলে তারাই নিমাইর কাছে ছুটে গেছে। কারণ, বড় অসহায় আর বিপন্ন তারা। অবলম্বনহীন জীবনে তাকেই একমাত্র আশ্রয় ভাবল তারা।

নিমাইকে সকলের ভারী ভাল লাগে। সকলের মনে একটা ধারণা জন্মে যাচ্ছিল যে সে ঈশ্বর প্রেরিত মহামানব। একদিন পুণ্ডারীক বিদ্যানিধি তার বিস্ময় প্রকাশ করে বলল: পৃথিবীতে ভগবান বেছে বেছে কিছু মানুষকে চওড়া কাঁধ দিয়ে পাঠান, অন্যের ভার বইবার জন্যে। তাদের ভাগ্যবান করে পাঠানো হয় অন্যদের জন্যেই। তোমাকে ভগবান অনেক কিছুই দিয়েছে, কিন্তু তোমার নিজের ভোগের জন্যে কিছুই দেয় নি। চারপাশের বোঝা লাঘব করার জন্যেই ঈশ্বর তা দিয়েছে।

এক দারুণ দীপ্তিতে নিমাইর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্মিত হেসে বলল: নিজের বোঝাত সকলেই বয়। পরকে যখন নিজের মনে হয় তখন বোঝাটা আর বোঝা থাকে না। সেটা হয়ে উঠে মানবিক কর্তব্য। বলেই আবার সেই দীপ্তি হাসি হাসল নিমাই।

পুণ্ডরীক একটু ভাল করে নিমাইর মুখটা দেখল। ভেতরটা একটু কাঁপল। বলল: তুমি অনেক গভীর করে ভাব। আমি যে ভাবিনা তা নয়, তবে

তোমার মত হয় না। তোমার ভারী সুন্দর একটা মানবিক মন আছে! তাই বোধ হয় জীবন সম্বন্ধে ধারণাগুলো এত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। আমরা যাকে জীবন বলে জেনেছি সে একটা অভ্যাস মাত্র। এক ঘেয়েমিতে ভরা। কোন বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু ক'দিন ধরে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে তোমার কথাগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছি। তুমি ঠিকই বলেছ, মুসলমানেব গোমাংস ভক্ষণকে হিন্দুবা ভাল চোখে দেখেনি! গো হত্যা, গো মাংস ভক্ষণের জন্যে মুসলমানেরা হিন্দুব কাছে ছোট হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমানের যথার্থ বিরোধের সূত্রপাত এখানে।

নিমাই একটু কষ্টের সঙ্গে হাসল। মাথা নেড়ে বলল: যতদিন হিন্দুরা এক্ষেত্রে একটু উদার না হবে ততদিন জোর করে ধর্মান্তব করার মজাটা মুসলমানেব মন থেকে যাবে না। অভ্যাস গুলো তাই আমাদেব নতুন করে ভাবনা চিন্তা করার সময় হয়েছে। ধর্মেব গোঁড়ামি আব সংকীর্ণতা প্রতিবেশীকে শত্রু করে তুলছে। ভুলতে বসেছি মানুষেব জন্যে ধর্ম, ধর্মের জন্যে মানুষ নয়। ধর্মের সম্পর্কে আমবা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। হৃদয়ে হৃদয় মেলে এমন প্রেম মন্ত্র চাই। একমাত্র প্রেমই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নিজের নিজের গভীব গন্তব্যের দিকে, নিজেদের প্রকৃত সুখের দিকে, আনন্দের দিকে। হরিনামই পারে ভাণ, ভণ্ডামি লোকভয় সব ছিড়ে ফেলতে। মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে। মানুষে মানুষে সমতা আনতে। এই নাম কণ্ঠে নিয়ে মানুষ প্রেম সাগরে ভেসে যেতে পারলে আর কোন ভয়, ভাবনা, উৎকণ্ঠা থাকবে না। প্রত্যেক মানুষই স্বয়ং সম্পূর্ণ। নিজের মধ্যে নিজের আনন্দ এবং পরিপূর্ণতার খোঁজে একবার বেরিয়ে পড়লে বোঝা যাবে, দুঃখ যা পাবার তা আমরা নিজেরাই নিজেদের দিই। অন্যকে দায়ী কবি মিছিমিছি। নিজেরা ভীরু দুর্বল পরনির্ভর বলে।

নিমাইর কথাগুলো ভাল কি মন্দ বিচার করার মত শিক্ষা ও জ্ঞান তাদের ছিল না। তবে কথাব চমকে এক বিস্ময় জাগত। নতুন জীবনের নতুনত্বের অনুভূতি নিয়ে যাওয়া নয়, ধর্ম জিজ্ঞাসা নয়, সন্ন্যাসী হয়ে, গৃহত্যাগী হয়ে তারা অভিভূত হয়ে যেত। সামাজিক, মানুষ হয়েই সব বাঁধন আলগা করে জীবন স্রোতে ভেসে যাওয়ার গভীর এক সুখবোধের মধ্যে পূর্বাঙ্গের মানুষকে টেনে আনল নিমাই। হরিনাম হল তাদের জপমন্ত্র। কিন্তু এই পূর্ণতা কেমন যেন এক নির্লিপ্ততা দান করল তাকে।

পূর্ববঙ্গে নিমাই এখন সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি। তাকে ঘিরে মানুষের বিস্ময়, কৌতূহলের অন্ত নেই। সে কে? এতদিন কোথায় ছিল? এইসব বিবিধ প্রশ্নের না পাওয়া জিজ্ঞাসার উত্তর তাদের মনে নবরূপী নারায়ণের ধারণা জাগিয়ে তুলল। তাকে দুঃখী মানুষের পরিত্রাতা বলে ভাবল। কিন্তু এ রকম একটা উপভোগ্য আলোচনা নিমাইর ভাল লাগল না। এতে তার পুরুষকার এবং যোগ্যতাকে ছোট করা হচ্ছে বলে মনে হল। ঈশ্বরের কোন গুণ তার মধ্যে নেই। সবই তার নিজের উদ্যমে ও উদ্যোগে গড়া। ঈশ্বরত্ব মানুষের সৃষ্টি। তাতে মানুষের কোন গৌরব প্রকাশ পায় না। বরং তাতে মানুষের ভিতরের জোরটাই কমে অসে। তাই তীব্রভাষায় তার সমালোচনা করল নিমাই।

বলল: আমি মানুষ। ঈশ্বর নই। আমাকে তোমরা ঈশ্বর ভেবে মহান ঐশ্বর্যের শক্তির অপমান কর না। আমি তোমাদের ঘরের ছেলে। রক্ত মাংসের মানুষ। ঈশ্বরের ক্ষমতা আমার নেই। মানুষের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস আমাকে কর্মক্ষেত্রে টেনে এনেছে। সকলের মত আমারও বিস্ময় লাগে বঙ্গদেশে এত মানুষ থাকতে লোকে আমাকে এত ভালবাসল কেন? এত প্রত্যাশাই বা করে কেন? এই বিশ্বাসের উৎস কোথায়? মানুষকে দেয়ার মত ধন, ঐশ্বর্যত আমার কিছু নেই। অবশ্য বিলানোর মত অনন্ত প্রেম, ভালবাসা, মমতা সহানুভূতি আমার আছে। ভালবাসার সেই ঝোলা নিয়ে প্রেমের ভিখারী হয়ে কাঙালীর মত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রেম ভিক্ষা করেছি। ভিক্ষে পেয়ে আনন্দিত হওয়াত দূরের কথা লজ্জা ক্ষোভে আমার মাথা নত হয়ে গেছে। দেখে অবাক হয়ে গেছি, সমাজের উঁচু বর্ণের মানুষের কত স্বার্থ বুদ্ধি, লোভ-লালসায় কত অন্যায় অবিচার দুর্বলের প্রতি কত অবহেলা, অবজ্ঞা, ঘৃণায় ভরা এই সমাজটা। ভেতরটা তার কুষ্ঠ ব্যাধির মত গলে গলে খসে পড়ছে। তবু মনুর এই হিন্দু সমাজের প্রতি সর্বস্তরের হিন্দুর কি অসীম আনুগত্য, ভালবাসা। এই সমাজ সৃষ্টির সার্থকতার মধ্যে ফাঁক আর ফাঁকি দেখে আমার লজ্জা হল, গ্লানি জমল। উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে মনে হল পাঁচ হাজার বছর ধরে জমে ওঠা পাপ, অন্যায়, স্খলন পতনের বিরুদ্ধে যুগযুগান্তর ধরে মানুষের মনে যে ক্ষোভ গর্জে উঠেছে তার প্রতিকার দরকার। একমাত্র ভালবাসার অমৃত ধারায় ধুয়ে দেয়া যায় এই পঙ্কিলতা। আমরা এক মায়ের সন্তান, এক ধর্মের লোক।

তবু আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কতদূরের ?—ভাইর কাছে ভাইর কোন লজ্জা থাকে না। ভাই পারে সকল লজ্জা অপরাধ ক্ষমা করে বুকে টেনে নিতে। আমার সেই বিশ্বাসের দাম দিচ্ছে আমার ভাইরা। এই বড় জয়ের গৌরবে আমাদের সকলের বুক আজ বড় হয়ে গেছে। আমাদের জীবন আদর্শের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। হরি সংকীর্তনের প্লাবনে কলঙ্ক, কালিমা, দুর্বলতা সব কেটে যাচ্ছে। মোহ, সংস্কার ভেঙে যাচ্ছে। মনে স্বস্তি, শান্তি ফিরে আসছে। অত্যাচারী হুসেন শাহের রাজশক্তির হাত থেকে নিজের ধর্ম হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার এক বড় সুযোগ সবার সামনে সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরের নাম গান মুখে নিয়ে আমরা সেই প্রেমধর্ম প্রচার করব। মানুষকে আহ্বান করব। প্রেমে আমরা মিলব। ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহসে, সবার উপর মানুষ সত্য এই চেতনাকে জাগ্রত করার মহান সংকল্প নিয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে আমরা নাম কীর্তন করব। আমরা অমৃতের সন্তান, আমরা মানুষ। আমরা প্রেমে বিশ্বাসী। তবু আমরা হিন্দুরা নিজেদের সঙ্গে লড়াই করে শক্তি ক্ষয় করছি। হুসেন শাহ সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের আঘাত করছে। তবু ইতিহাসের কাছ থেকে আমরা শিখলাম না কিছুই। পালরাজারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, মানুষে মানুষে সহযোগিতাই শক্তির উৎস। সেন রাজারা দেখিয়েছে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে রাজশক্তি বেশিদিন টেঁকে না। প্রেমের কবি চণ্ডীদাস বলেছে সবার উপরে মানুষ সত্য। তবু মুসলমান রাজশক্তি হিন্দুর মন্দির ভাঙছে, হিন্দুর ধর্ম হরণ করছে। হিন্দুরা নিজেদের আক্রান্ত এবং বিপন্ন মনে করছে। তাদের অসহায়তা এবং দুর্বলতার ভয় দূর করতে মুসলমান সুফী সাধকেরা এগিয়ে এসেছে। তারা উদার, মহান। মিষ্ট কথায়, মিষ্ট আচরণে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করেছে। ধর্মের বৈষম্য নয়, মানুষে মানুষে বিভেদ নয় প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে তারা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছে। ধর্মের পার্থক্য যে মানবসমাজের পার্থক্য নয়, এই কথাটাই সুফী সাধকেরা বোঝানোর চেষ্টা করেছে। বৈষ্ণবেরাও বিশ্বাস করে মানুষে মানুষে বৈষম্য নেই, বর্ণে বর্ণে পার্থক্য নেই। সব মানুষ এক। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। একমাত্র হরিনামে সব জাতি-ভেদ ঘুচে যায়। প্রেমভক্তির মধুর রসের ধারায় একজাত একবর্ণ হয়ে যায়। প্রেমে জাত-বেজাত, ছোট-বড় নেই। হিন্দু-অহিন্দু নেই।

কথাগুলো প্রত্যেকের মনের ভেতর এই ঝংকারে বাজল। গায়ে কাঁটা দিল। দুটি রক্তস্রোত পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তাদের চোখ বেয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ল। বহুদিন পর তারা এক বুকভাঙা মুক্তির সুখ, আনন্দ নিয়ে যেন বেঁচে উঠল। তাদের স্বপ্নাতুর দুই চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিমাইর মধ্যে নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন জেগে উঠল।

পূর্ববঙ্গের কত স্মৃতি, কত ঘটনা, কত কথা, নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন কালে তার মনে পড়তে লাগল। ছ'টা মাস যে কোথা দিয়ে কিভাবে চলে গেল তা টেরই পেল না। সাফল্যের সেই গৌরব তৃপ্তিতে মনটা প্রসন্ন।

নৌকোর পাটাতনের উপর বিছানো একখানা চাটাইর উপর নিমাই চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তারাভরা আকাশের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বারংবার মনে হতে লাগল, পাশাপাশি সব তারারাই আছে আকাশে, কিন্তু রাত্রি গভীর আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে সবাইকে, সব কিছুকে। দুঃসময় মানুষকে কাছে টানে, বড় আপন করে। তার মানে অন্ধকারও নিশ্চিন্তে বসে নেই। দিনের তপস্যায় সে ধ্যানস্থ।

রজনীর নির্জনতার মধ্যে লীন হয়ে গিয়ে ভাবতে ভাল লাগল তার জীবনটা কত বিচিত্র ঘটনায়, অনুভূতিতে, ব্যথা-আনন্দে, জয়ে-সার্থকতায় পরিপূর্ণ। কত মানুষের মিছিল একটা মানুষের জীবনে। কত কর্মের আহ্বান কত নতুন দায়িত্ব, কত অভিনব সংগ্রাম। জীবন নদীর মত চঞ্চল বেগবান। পরিবর্তনশীল। কি বিপুল হর্ষে আকাশের সীমা ছাড়িয়ে কি আবেশে প্রবাহিত। কোথাও তার বাঁধা নেই। আবার থেমে নেই। শুধুই চলা, চলাই জীবন ধর্ম। অগণিত মানুষের সঙ্গে একত্রে বেঁধে থাকার নাম জীবন। এক বিরাট জীবন স্রোতের অংশ হয়ে, বহু মানুষের জীবনের শরীক হয়ে সে ফিরে যাচ্ছে নবদ্বীপে।

এখন সে আর একা নয়। এক বিরাট জীবন ঐ তারা ভরা আকাশ ঐ অপূর্ব সুন্দর বহুবর্ণ প্রকৃতি, এই সবুজ শ্যামল পৃথিবী ও মানুষের সঙ্গে একত্রে।

বেশ লাগছিল নিমাইর। ফুরফুরে শীতল হাওয়ায় তার দুই চোখে ঘুম এল। তবু দু'চোখ টেনে টেনে সে নিজেকে প্রশ্ন করল ঃ আমার নাম কি জান ?"—বিশ্বম্ভর। অর্থাৎ, বিশ্বের ভরণ কর্তা। লোকে যাকে বলে নারায়ণ। দেবতার ছেলে আমি নই, দেব অংশেও জন্ম নয়। তবু দেবতার মত মানুষের

ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি পেয়েছি। মানুষের সমাদর, পূজা আমাকে এক অন্য মানুষ করে গড়েছে। সেই মানুষ, অসাধারণ, বিরাট। মহাবলী দেবতার মত সে অন্যায়, অধর্ম, উৎপীড়নকে ধ্বংস করতেই যেন এসেছে। কিন্তু তার বাহুবল, ধনবল নেই, আছে জনবল আর প্রেম।

চোখের সামনে নানা দৃশ্য তার ভেসে যাচ্ছিল। তার সবটারই কোন অর্থ নেই। তবু এক মহৎ বোধে ভরে উঠল অন্তঃকরণ।

ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়ায় নিমাইর ঘুম পেল। দুই চোখের পাতা ঘুমে জুড়ে এল। আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

রোদের স্পর্শে ঘুম ভাঙল। চোখের পাতা খুলে টকটকে রাঙা সূর্য যেন জ্বালা ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। রাঙা আকাশ থেকে রক্তের স্রোত মিশছে গঙ্গার জলে। গঙ্গাকে রাক্ষুসীর মত দেখাচ্ছে। নিমাইর বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। বুকের মধ্যে তার কষ্ট হল বড়। এ রকম একটা কল্পনার মধ্যে কিছু ছিল না। তবু একটু বিমর্ষ হল নিমাই। শান্ত সৌম্য মিষ্টি সকালের অপরূপ শ্রী, পাখির ডাক, নদীর তরঙ্গের শব্দ, ঝিরঝিরে হাওয়া সব তার ভাল না লাগার গভীর বেদনাময় অনুভূতিতে বিবর্ণ বোধ হচ্ছিল।

আজই তার নবদ্বীপে পৌঁছনোর কথা। কতদিন পর বাড়ী ফিরছে, তবু মনে কোন আনন্দ নেই। তার এই অতৃপ্তির মধ্যে যে মন বাস করছিল তার রূপ নিজেও জানে না। কিন্তু এক অসীম শূন্যতায় তার বুক টাটাচ্ছিল। একটা কুচিন্তা আসছিল মনে।

কি তার অর্থ, আর কেনই বা এমন হচ্ছিল কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। নিজেকে প্রবোধ দেয়ার জন্যে কিংবা ভুলে থাকার জন্যেই হয়ত বা মনে হল, সব মানুষেব আসল বিরোধ বোধ হয় তার নিজের সঙ্গে। চিরদিনের জন্যে অথবা কিছু সময়ের জন্যে। মনের সঙ্গে এই অবিরাম বিরোধ ও দ্বন্দ্বের বোধ হয় খুবই প্রয়োজন থাকে। একটানা দীর্ঘ পথ চলা বড় ক্লান্তিকর আর এক ঘেয়ে হয়ে উঠে। তাই বোধ হয় মানুষ নিজের ঘরে নিজের মন গড়া অথবা একটা বাস্তব বিরোধ বাঁধিয়ে এক ঘেয়ে জীবনে কিছু গতি আনে। মাটির সঙ্গে চাকার নিরন্তর সংঘর্ষেই চাকা এগোয়, তেমনি সংঘর্ষ ছাড়া মানুষের জীবন'ত কল্পনাই করা যায় না। দুঃখ, বিরোধ, যন্ত্রণার সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়ার আরেক নামই ত জীবন। তা-হলে এই উৎকণ্ঠা কেন? বেশিদিন

প্রবাসী থাকলে মনের ভেতর এ রকম কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি? জ্ঞানীরা বলেন, মনে অনেক কিছুই আগে থেকে টের পায়। কিন্তু সে কিছুই টের পাচ্ছিল না। মন খারাপ করে দেয়া কষ্টের মত বিষণ্ণ আপশোষ আর হতাশা তার বুকে বিঁধে ছিল। কিছুই ভাল লাগছিল না। কেমন একটা বিষণ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নৌকার উপর।

অপরাহ্নের কিছু আগে নৌকো এসে ভিড়ল নবদ্বীপের ঘাটে।

জনাকীর্ণ ঘাট।

লোকেরা সবিস্ময়ে নিমাইকে নৌকা থেকে অবতরণ করতে দেখল। কিন্তু কাছে গিয়ে তার কুশল নিল না। নিমাই বেশ বুঝতে পারল সবাই তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। পাছে তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয় তাই অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে। কেউ বা অন্য কাজের ছুতো করে নীরবে তার চোখের সামনে থেকে সরে গেছে।

নিমাইর বিস্ময়ের অন্ত নেই। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। একটা অশুভ আশঙ্কা তাকে চঞ্চল করে তুলল। লক্ষ্মীর জন্যে মায়ের জন্যে তার মনটা কেমন করতে লাগল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে নিমাই বৈদিক পল্লীর দিকে এগোল। সমস্ত পথটাই এক উৎকর্ণ উৎকণ্ঠার ভেতর তার কাটল। ভয়ে বুকের ভেতরটা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। মেরুদণ্ডের ভেতর ঝিমঝিম করতে লাগল। বাড়ীর কাছা-কাছি হতে ভয়টা আরো চেপে ধরল। হাত-পা কঁাপতে লাগল। উঠোন পেরিয়ে ঘরের সিঁড়িতে পা দেবার সময় বুকে ভয়, ভীষণ ভয়। মৃতু ভয়ও বোধ হয় এ রকম হয় না। নিমাই ভয়ে ভয়ে অস্ফুটস্বরে প্রথমে আস্তে পরে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে ডাকল: মা।

কিন্তু শূন্য গৃহে তার আকুল করা অস্থির ডাক হাহাকারের মত ঘরময় বাজতে লাগল। মনে হল প্রেতেরা যেন এক সঙ্গে খল খল করে হেসে উঠল। ঘরের ভেতর থেকে কোন সাড়া না আসায় নিমাইর ক্রন্দনের উপক্রম হল। কিন্তু জননীর কক্ষে পা দিয়েই সে শচীর সামনে পড়ল।

নিমাই কোন প্রশ্ন করার আগেই শচী আঁচলে মুখ ঢাকল। মুখে কাপড় দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। নিমাই শচীর মুখ চোখ দেখতে পাচ্ছিল। মাথার পাকা চুল আর শিরা বেরনো ফর্সা হাতখানা থান বস্ত্রের ফাঁক দিয়ে বের হয়েছিল। শচীকে এভাবে কাঁদতে দেখে নিমাই চমকে উঠেছিল।

শরীরের ভেতর একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। উৎকণ্ঠায় আশংকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভয়ংকর একটা কিছু শুনবার প্রত্যাশায় সে শচীর খুব কাছে এসে দাঁড়াল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের মধ্যে একটা ঝোড়ো বাতাসের দোলা। ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন ভাবের ভিতর থেকে নিমাই রুদ্ধ-কণ্ঠে অতি কষ্টে বলল: মুখে আঁচল চাপা দিয়ে থাকলে আমি যে তোমার মুখ দেখতে পাই না মা। কতদিন তোমায় দেখি না। তুমি আঁচল সরাও। কথা বল।

শচী আর নিজেকে আর সামলাতে পারল না। অসহায়ভাবে সে দেয়ালে মাথা ঠুকে কাতর শব্দ করে কাঁদতে লাগল। কান্না নয়, যেন হাহাকার।

নিমাই আতঙ্কিত চোখে দরজার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। অবোধ দৃষ্টি।

বাইরে উৎসুক প্রতিবেশীরা কাতর চোখে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাদের চোখে মুখে একটা সকরুণ বিহ্বলতা। রুদ্ধ কান্নায় তাদের ঠোঁট কাঁপছে। নিমাইর বুকের ভেতর কান্নার সমুদ্র তোলপাড় করে উঠল। ঝড়ো বাতাসে ছিন্ন পাতার মত তীর বেগে সে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল। লক্ষ্মী লক্ষ্মী বলে ডাকল। কিন্তু লক্ষ্মীর কোন সাড়া পেল না। বুকটা তার হায় হায় করতে লাগল। বড় শূন্য লাগল। দেখল ছবির মত পরিপাটি করে সাজানো গোছানো ঘরের এ কি দশা হয়েছে? মেঝেতে বিছানায় জিনিসপত্তরের উপর ধূলো জমেছে। দেয়াল ঝুলে মাখামাখি ঘর জুড়ে কেমন একটা শূন্যতা অস্তিত্বহীনতা টের পেল। ঘরটা যেন বড় বেশি নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ আর শব্দহীন। নিমাইর ভীষণ কষ্ট হল।

নিমাইর ভুরু কুঞ্চিত মুখে যথাযথ উদ্বেগ, অধীরতা। হঠাৎ তার খুব শীত করতে লাগল। ঠাণ্ডায় যেন শরীরটা জমে যাচ্ছিল। নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে এল। পায়ের নিচে তার থরথরিয়ে মাটি কেঁপে গেল। ভূমিকম্প নয়, তার জড়বৎ শরীরের এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। ভয়ংকর সব চিন্তার আক্রমণে নিমাই আর নিজেকে সংযত রাখতে পারছিল না। ডাক ছেড়ে তার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে শক্তিটুকুও তার নেই।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে নিমাই আস্তে আস্তে শচীর সামনে এসে

দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকল তার দিকে! তার শ্বাসের শব্দে শচী টের পেল নিমাই তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে। কেমন একটা উদভ্রান্ত উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছিল। পাপবোধ তাকে পীড়া দিচ্ছিল। তার নিজের মানসিক শক্তিতেও টান ধরেছিল।

শচী কান্না থামিয়ে নিমাইর দিকে চেয়ে রইল। একখানা হাত এগিয়ে এসে তার বুক স্পর্শ করল। ভারী কোমল, ভারী স্নেহময় সে স্পর্শ। শচীর দুই ঠোঁটে টেপা কান্না। বার কয়েক ঢোক গিলে বলল: নিমাই, লক্ষ্মী আর নেই। আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। আমার উপর অভিমান করে চলে গেছে। শচী মাথা নেড়ে কাঁদতে কাঁদতে হাউ হাউ করে ভাঙা গলায় কথা-গুলো বলল। নিমাইর বুকে কপাল ঠোকে আর বলে আমার কপাল। সব আমার কপালের দোষ। এ পোড়া কপালে এখন অনেক দুর্ভোগ বাকি আছে। আমার মত হতভাগিনীর পৃথিবীতে কোন প্রয়োজন নেই। তবু আমাকে বেঁচে থাকতে হয় শুধু দুঃখ পাওয়ার জন্যে। কেন বলত? দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে শচী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাতর শব্দ করে কাঁদতে লাগল। নিমাই স্তব্ধ। কেমন যেন অসহায় লাগল হঠাৎ কি যেন হারাল। শরীর থেকে আত্মা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বড় কষ্ট হচ্ছিল নিমাইর। অস্ফুট একটা শব্দ করে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল লক্ষ্মী নেই। আর কোনদিন তাকে দেখতে হবে না। কথাটা হা-হাকারের মত শোনাল।

শচীর বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল। নিমাই বলে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল। কান্নায় ভাঙা ভাঙা গলায় বলল: মন্দ কপাল আমার। আমার কপাল দোষেই তার মৃত্যু হল। এই দুঃখটা আমার মরে গেলেও যাবে না।

নিমাই বজ্রাহাতের মত বসেছিল। কিছুক্ষণ তার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না। সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপর গভীর এক হতাশার চোখে শচীর দিকে চেয়ে থমথমে গম্ভীর গলায় বলল: মা, লক্ষ্মীর মৃত্যুটা আমি কোনদিন ভুলব না। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় বন্ধন ছিল সে। তাকে কথা দিয়েছিলাম কোনদিন ছেড়ে যাব না। কিন্তু সে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল! ছোট্ট সংসারের পরিবর্তে বিশ্ব সংসারের ভার দিয়ে গেল আমায়। বোধহয়, আমার অদৃষ্ট দেবতার ইচ্ছাও তাই। তারপর কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল চেতনা।

দেয়ালে টানানো কালীঘাটের শঙ্খ চক্র-গদা পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণের পটের দিকে অপলক চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। গভীর ধ্যানে যেমন দুই চোখ বুজে যায়, তেমনি অভিভূত ভাব নিয়ে নিমাই মৃদুস্বরে মন্ত্র ধ্বনির মত স্পষ্ট উচ্চারণ করল: "হে রুদ্র তব সঙ্গীত আমি কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী, মরণ নৃত্যে, ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাব, ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে তোমার অর্ঘ্য সাজাব"।

লক্ষ্মী প্রিয়ার মৃত্যুটা নিমাইকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। তার জীবনের থিত ভিত সব ভীষণভাবে নাড়া খেল। সংসারের আর কোন আকর্ষণ রইল না। অসীম শূন্যতায় তার মন ছেয়ে আছে। লক্ষ্মী নেই তাই জীবনের শ্রীও নেই। কর্মের গৌরবতৃপ্তির সব অবসান। সকাল থেকে সন্ধ্যে একই নিয়মে দিনটা তার গড়িয়ে চলে। এক ঘেয়ে। বৈচিত্র্যহীন। কেবল দিন গত পাপক্ষয় করার জন্যেই সংসারের তরীটা ভাসিয়ে বসে আছে। নিজেকে বড় একলা লাগে। দিনগুলো শূন্যতায় চেপে ধরে। কিন্তু এটা যে জীবন নয়, জীবনের ক্ষয় ধ্বংস এটুকু বিচার করার মত তার শক্তি আছে। তবু, এই শোকের মধ্যে, শূন্যতার মধ্যে হয়ত মনটা এই জগতের কোন সূত্র অনির্দ্দিষ্ট জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে যার কোন বাস্তব মূল্য নেই। সেই অনির্দ্দেশ অদৃশ্য বস্তুটি যে কি সে সম্পর্কে তার কোন স্পষ্ট ধারণাও নেই। কিন্তু স্পর্শটা মনে লেগে আছে।

রাতে ভাল ঘুম হয় না। কখনও অর্ধরাতে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে অনেক বিপত্নীক পরিচিত লোকদের কথা ভাবে। ওরা'ত পত্নী বিয়োগের ব্যথায় এত কাতর হয় না। কিছুদিন পর আবার শোক সামলে নিয়ে নতুন করে বয়ে থা করে সংসার করে। নিজের অবস্থায় ওরা সন্তুষ্ট। নিজের সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু সে তাদের মত হতে পারছে না বলে এক ধরণের যন্ত্রণা ভোগ করে। জীবনে সে সব পেয়েছে তবু শূন্যতা কেন যায় না? হঠাৎ মনে হল এ কি তার শূন্যতার যন্ত্রণা? অথবা সে যা করতে চায়, তা পাচ্ছে না বলেই কি এই বিহ্বলতা, প্রকৃত পক্ষে মন প্রাণ ঢেলে সে যা করতে চায় নবদ্বীপে, তার কিছুই করা হল না। মানে একটা দুর্ঘটনার জন্যে তার কিছুই সুরু করা হয়নি। এই অপূর্ণ আকাংখার এই অতৃপ্তি কি তার বুকের ভেতর মোচড় দেয়?

তারা ভরা আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিমাই। ঝির-ঝিরে বাতাস লেগে তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। একটা গভীর শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল আকাশ ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই ?

আত্মান্বেষণের শেষ নেই নিমাইর। তার এই শূন্যতাবোধ যে কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের জন্যে নয়, একেবারেই নয় এই কথাটা আজকাল প্রবলভাবে টের পায়। শূন্যতার যন্ত্রণা ছাড়া পূর্ণতাকে পাবে কোথায় ? একটু একটু করে নিমাইর কাছে শূন্যতার অর্থ পরিস্ফুট হয়। অন্য কাউকে নয় নিজেকেই সে খুঁজছিল। সত্তার যে অংশ নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারেনি এত তারই বেদনা। নিমাইর ভিতরে শুরু হয় বিচার, বিশ্লেষণ এবং সমাধানের চেষ্টা।

দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল। নিমাই আবার টোলে অধ্যাপনা সুরু করেছে। কিন্তু পূর্বের মত সহজ, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক আর নয়। সব সময় কেমন একটা উদাস অন্যমনস্কভাব। নিজের মনে বিড় বিড় করে আর মাথা নাড়ে। তার চেহারাতেও একটা ক্ষ্যাপামির ছাপ পড়েছে। আড়ালে আবডালে লোকের ইংগিতময় কথাবার্তা তাদের চাহনি দেখে নিমাইও টের পায়। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিজেকে। বিহ্বল হতভম্ব চোখে সে নিজের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল। সত্যি সে একটু রোগা হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতেও ক্ষ্যাপামির ভাব প্রকট। এক প্রার্থনা নীরবে মাথা কুটছিল। কিন্তু তাব ভিতরে এ নীরব প্রার্থনা কিসের ? বুঝতে পারছে একটা কিছু ঘটবে তার জীবনে। অনেক বড় একটা কিছু অনুভব করে বুকের ভেতর। সে তার স্বদেশকে টের পায়। তার মনে হয় নিজের দেশের জন্যে, স্বজাতির জন্যে, দেশবাসীর জন্যে তার কিছু করার আছে। তারাও আছে তার প্রত্যাশায়। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণের পথে বড় বাধা বোধ হয় আজ সে নিজে।

লক্ষ্মীর মৃত্যুটা সে ভুলতে পারছিল না। মানুষের মৃত্যু হলে সে সর্বাংশে মরে না। তার কিছু থেকে যায় মনের অভ্যন্তরে। সে এক ভিন্ন অস্তিত্ব। তবু দিনের ব্যবধানে ঠিক হয়ে আসে ক্রমে। সবাই জানে একথা, তবু এ জানাটা জানাই নয়। ঘূণ পোকার মত লক্ষ্মীর মৃত্যুটা তার ভেতর ক্ষয় করে চলেছে। সর্বক্ষণ একটা করুণ সুরের আলাপ হচ্ছে বুকের নিভৃতে। ভিতরের এই উন্মাদ ঝড় শান্ত করতে সে ধ্যানে ডুবে যায়। সমস্ত চেতনার উপর

নেমে আসে বিহ্বলতা। সমস্ত বিষণ্ণ-অবসন্নময় নিঃশেষে মুছে দিয়ে এক অনির্বচনীয় সুখ আর পরিতৃপ্তিতে ভরে যায় তার মন। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় তখন পাগল পাগল ভাব হয় তার।

ধ্যানেই সে উপলব্ধি করল, যখন মানুষ নিজের উপর আত্মবিশ্বাস হারায়, জীবনের কোন মানে খুঁজে পায়না তখন আয়ু বড় দুর্বহ বোধ হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন দুর্দৈব মুহূর্ত আসে কখনও যখন তার অনেক থেকেও কিছুমাত্র থাকে না। অনেক থেকেও, কেউ নয়। সেই সময় তাকে আমিত্বকে সম্বল করেই দাঁড়াতে হয়। জীবন থেকে পালিয়ে নয়, সরে থেকেও নয়, সব কিছুর মধ্যে জীবনকে মানিয়ে নিয়ে। কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর মানুষকে একা একাই দিতে হয়। সেই হল তার পরীক্ষার কঠিন মুহূর্ত। জীবনে যা কিছুই বড় পাওয়া তার জন্যে শ্রেষ্ঠ মূল্য ধরে দিতে হয়। লক্ষ্মী হয়ত সেই মূল্য দিয়ে গেল তার জন্যে। জীবন স্রোতের নিয়মই হল এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে প্রদীপ জ্বালিয়ে যাওয়া। সে রইল না, কিন্তু তার প্রাণের অম্লান শিখা রয়ে গেল অন্যের অন্তরে এরই নাম প্রগতি। জীবনে থেকে থাকার নয়। জীবন ভরে ওঠার, পূর্ণ করার। সমস্ত ভাল মন্দের, সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে নিজেকে না নিয়ে এলে জীবন বোধ হয় পূর্ণ হয় না। লক্ষ্মীর মৃত্যু তাহলে কোন ঘটনাই নয়। বিশ্ব জুড়ে প্রাণের যে অবিরল প্রকাশ ঘটছে লক্ষ্মী তার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। মহাজীবনের ইন্ধন। বৃক্ষ জটিল সৃষ্টি লীলার ফসল। সে নিজেও তাই। এইসব জটিল এক মহৎ চিন্তায় তার হৃদয় জ্যোতির্ময় হল। মনটাও প্রসারিত হয়ে গেল বহুদূর পর্যন্ত।

॥ সাত ॥

নিমাইর প্রিয় নদী গঙ্গা। আর নদীতীরের প্রাচীন বট গাছ। তার দুঃখ সুখের জায়গা এটি। এখানে বসলে সে নিজেকে খুঁজে পায়। এখন মনে কিসের পালা? দুঃখের সুখের। কোনটাই বোধ হয় না। দুঃখ বা সুখ কোন একটা না থাকলে সে এখানে নেই কেন? দুঃখ বা সুখ ছাড়া মানুষের আর কি অনুভূতি আছে? দুঃখও নেই, সুখও নেই সেই অবস্থাকে

কি বলে? নিমাই তার প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না।

এক জ্বালাভরা চোখে তরুমূলে বসে সে গঙ্গাকে দেখে। গঙ্গার কোন উদ্বেগ নেই, দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, কেমন নির্বিকার, উদাসীন। বৈরাগীর মত নিঃশব্দে পথে নিজের আনন্দ ও সুখ নিয়ে চলেছে।

নিমাইর নাভিমূল থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এসে ফুরফুরে বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল। বহুদিনের জমা করা একটা ভার যেন নেমে গেল বুক থেকে। এখন নিজেকে তার বেশ হাল্কা লাগছে। বটগাছে ঠেস দিয়ে বসে ফুরফুরে হাওয়ায় গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকল। পাল তোলা নৌকো ঘোলা জলের আবর্ত কেটে মন্থর গতিতে চলেছে। মাথার উপর তুলোর পেঁজা সাদা সাদা ছিন্ন মেঘ পতাকার মত উড়ছে। বহুদূর পর্যন্ত অবারিত আকাশ। হাতছানি দিয়ে নিবন্তর তাকে ডাকছে।

অনন্ত আকাশ। পণ্ডিতেরা যাকে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-বলেছেন, তাকে শুধু কল্পনা করা যায়। কিন্তু তার স্বরূপকে ধরা যায় না। তাই নানা উপমা সহযোগে তাকে বোঝানের চেষ্টা। এই অতৃপ্তি, অপূর্ণতা নিয়ে তবু সাধক, ভক্ত, জ্ঞানী নিরন্তর অন্বেষণ করে চলেছে। কিন্তু এইভাবে নিজেকে বঞ্চনা করে, পৃথিবীকে ফাঁকি দিয়ে, মানুষের কর্তব্য ভুলে সংসার পলাতক মানুষের মত নির্জনে একান্তে বসে দীন সন্ন্যাসীর বেশে ঈশ্বর সাধনা করার ভেতর মানুষের কোন গৌরব কিংবা মহত্ব নেই। এ হল মানুষের সঙ্গে মানুষের নিজের আত্মপ্রতারণা। এর ভেতর জীবনের দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার কোথায়? রূপ-রস-শব্দ স্পর্শ গন্ধ ভরা পৃথিবীর অন্তহীন মাধুর্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কোথায়? এই সুন্দরী শ্যামা বসুন্ধরা, এই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র খচিত আকাশ, অন্তহীন মাধুর্যে ভরা এই জগৎ যার সৃষ্টি তার কাছে মধুর রসইত প্রিয়। একে ভুলে থেকে নয়, এর মাধুর্যের মধ্যে অবগাহন করে তাকে অর্চনা করা আবেগ দিয়ে আকর্ষণ করার নাম হল ঈশ্বরের সেবা। বিধাতার পৃথিবীকে আরো সুন্দর করা, মধুর থেকে মধুরতর করে তোলাই হল মানুষের সাধনা। বিধাতা বিশ্বকে মাধুর্যে পূর্ণ করে রেখেছেন। প্রেম ভালবাসার মত মধুর কি আছে আর। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এই বিশ্বরূপের মধ্যে নিজেকে পরিব্যপ্ত করে দিয়ে সহজ ভালবাসায় ধরা দিয়েছেন। বোধহয় ঈশ্বরেরও তার কাছে সেই প্রত্যাশা।

মুনি ঋষিদের তপস্যা বড় কঠিন কঠোর। তাতে মাধুর্য কোথায়? এ

জীবন এ দেহ কার সৃষ্টি নিমাই জানে না। তবে একে এক জটিল সৃষ্টিলীলার ফসল তাতে সন্দেহ নেই। এই দেহ মন আত্মাকে শুষ্ক কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্ষয় করে নষ্ট করা, মানুষের কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া অপরাধ। না, কিছুতেই সে এপথে যাবে না। কেন যাবে?

সাধারণ মানুষের বড় দুঃখ। তারা বড় অসহায়। জ্ঞান, শিক্ষা, তপস্যার কথা কিছু বোঝে না, জানে না। এই পথে তাদের কোন উপকার হবে না। বরং তারা নব নব দুঃখ পাবে। অশেষ কষ্ট ভোগ করবে। এইসব দুর্বল, অজ্ঞান, অসহায়, নিঃস্ব মানুষের অনন্ত ভালবাসা আজ তাকে ঘিরে আছে। এরাই তার ঈশ্বর। এদের সেবা করলেই তার ঈশ্বর সেবা হবে। ঈশ্বরও তাই চায়।

নিমাইকে খুঁজতেই অদ্বৈতাচার্য গঙ্গার ধারে এসেছিল। কিন্তু নিমাই নিজের ভাবনায় এতই নিবিষ্ট আর অন্যমনস্ক ছিল যে অদ্বৈতাচার্যের আগমন টের পেল না। শূন্যচোখে অদ্বৈতাচার্য তার দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ। নিমাইকে দেখে মনে হল তার বুকের পাষাণ ভার সবটুকু নেমে গেছে। একটা মানসিক স্থিতি ফিরে এসেছে। অদ্বৈতাচার্য একটু নিশ্চিন্তবোধ করল।

কবোষ্ণ রোদে এক ঝিম ঝিম নেশাড়ু মাদকতা ছড়িয়ে রেখেছে চারধারে। নিবিড় ছায়াঘন বটগাছের নিচে ছায়া রোদ্দুরের আলপনা আঁকা। প্রজাপতির ডানার মত স্পন্দিত হচ্ছে আলো, বটের ছায়া। জায়গাটা বট ফলের গন্ধে ভরে আছে। নিঃশ্বাস বুজে এল অদ্বৈতের। আর, কেমন এক রহস্যময় আকর্ষণে তার বুকের ভেতর উথলে উঠার ভাব হল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে ডাকল: বিশ্বম্ভর।

অদ্বৈতাচার্যের গা শিউরানো ডাক শুনে নিমাই তার অন্যমনস্কতার মধ্যে হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল। কেমন ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর থেকে বলল: হুঁ! আমি ব্রহ্মত্ব চাই না, আমি চাই ভালোবাসার মাধুর্য উপভোগ করতে। মাধুর্য দিয়েই ঈশ্বরের সেবা করতে।

একটা ঘোরের ভেতর কথাটা বলার পর নিমাই শান্ত মুখে একটু থমকে চেয়ে থাকল অদ্বৈতাচার্যের দিকে। চোখে তার অদ্ভুত দৃষ্টি যা সাধকদের থাকে। তবে বৈরাগ্য নিস্পৃহতা নয়। বরং প্রেমের জ্বলন্ত আবেগ চোখের চাহনি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মনে হল, প্রেমের শতদল ফুটে আছে নিমাইর চোখে!

অদ্বৈতাচার্যের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। এক পরিপূর্ণ আনন্দে হৃদয় মথিত হতে লাগল। বুকের মধ্যে নানা রকম ভাবনা চিন্তার বিস্ফোরণ ঘটতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় অদ্বৈতাচার্য যে কথা বলতে এসেছিল ভুলে গেল। এক অপার্থিব মুগ্ধতা নিয়ে দুটি চোখ পেতে রাখল নিমাইর মুখের উপর।

অদ্বৈতাচার্যের স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। কি অপরূপ হয়ে গেল তার মুখটা। বিহ্বল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল: বিশ্বম্ভর, মহাপৃথিবীর নিমন্ত্রণ নিয়ে তুমি এসেছ। এই বিরাট বিশ্ব তোমার কর্মক্ষেত্র। একটি মৃত্যুর সাধ্য কি সংকীর্ণ গণ্ডীর সীমায় তোমাকে আটকে রাখে। বিধাতার কাজ বড় কঠিন। তার জন্যে অনেক কঠিন মূল্য দিতে হয়। জীবনে যা কিছু পেতে হয়, সব কিছুর জন্যে মূল্য দিতে হয়। লক্ষ্মী তার প্রাণের মূল্যে তোমাকে ভেঙে নতুন করে গড়ল। তুমি কিছুতে সাধারণ মানুষ নও। বিধাতা তার কাজের যোগ্য করে প্রতিমুহূর্ত তোমাকে নব নব করে গড়বে। তোমাকে অনেক দুঃখের মূল্যে সার্থক হতে হবে।

চমকানো বিস্ময়ে নিমাইর বুকের ভেতরটা দপ দপ করতে লাগল। অবাক স্বরে উচ্চারণ করল: আচার্য।

বিশ্বম্ভর নিজেকে উৎসর্গ করার সুখ তোমার সমস্ত চেতনা জুড়ে ঝংকারে বাজছে। তুমি না বললেও আমি টের পাচ্ছি তোমার অন্তরে কত কর্মের আহ্বান, কত কর্মের নতুন দায়িত্ব, কত অভিনব সংগ্রামের স্বপ্ন তোমার মন ছুঁয়ে আছে।

অদ্বৈতাচার্যের বাক্যে মুখে চকিতে রক্তের ঝলক লাগল নিমাইর। মস্তিষ্কের ভিতরে কথাগুলোর এক প্রতিক্রিয়া শুরু হল। বুকের ভেতর একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছিল। একটা কিসের অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। খুব মহৎ কিছু হওয়ার কথা জ্ঞান হওয়া থেকে শুনে আসছে। এই মুহূর্তে সেই প্রত্যাশা যেন দপ করে জ্বলে উঠল। অকস্মাৎ বুকের ভেতর অনুভব করল দুঃখী দুর্গত মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, আর্তি, অসহায়তা, লাঞ্ছনা মানুষের স্বার্থপরতা, লোভ, লালসা অহংকার, দম্ভ, ক্রোধ, বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ যেন এক সঙ্গে পাক খাচ্ছে। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা অসহনীয় দুঃখবোধ নিবিড় বেদনায় মিশল।

অদ্বৈতাচার্য নিমাইর মুখের দিকে অপলক স্থির দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ

ধরে চেয়ে থেকে তার মনের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করল। তারপর তাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে গম্ভীর গলায় বলল: বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ এবং স্রষ্টা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ একাধারে রাজনীতিক, যোদ্ধা, দার্শনিক। আবার পরম প্রেমময়। সমস্ত জগতের প্রতি তার অপার করুণা। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখের কারণ যারা তাদের সমূলে উৎপাটিত করতে তিনি সর্বনাশা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন করতে দ্বিধা করেননি। তিনিও ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ অবস্থায়। ভাগ্য বিড়ম্বিত, নিঃসহায়, নিঃসম্বল, অবস্থায়, লাঞ্ছিত, জাতিকে সম্মানে, গৌরবে, মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যেসব স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ভয়ে উৎপীড়নে মানুষের মনুষ্যত্ব, ধর্ম বিপন্ন, জীবন ও জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছিল দুর্বহ ও দুঃসহ সেই দুর্গত মানবকুলকেও তিনি অপমানের, অসম্মানের এবং হীনমন্যতার আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার করেছেন। মানুষের ঐকান্তিক প্রেমে তার সহজ ভালবাসায় ধরা দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন জনগণ-মন-অধিনায়ক। বিভিন্ন পরিবেশে সমাজের বিভিন্ন অবস্থার ভেতর, বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বিনা আয়াসে এমন মিলে যেতে, মিলিয়ে নিতে খুব কম মহাপ্রাণকে দেখা গেছে। এমন মানুষের সংস্পর্শে আসা সেদিন যে কোনও লোকের পক্ষেই সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। এসব তোমার অজানা নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবন ও কর্ম দিয়ে আমাদের শেখাল ধর্মহীনতার অবসান ঘটাতে যেমন প্রেমের প্রয়োজন তেমনি ধর্মদ্বেষী পাষণ্ডদের নিধন করতে রাজশক্তি দরকার।

বিস্ময়ে নিমাই চমকাল। রহস্যময় এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। পিপাসিত অনুভূতির প্রতি রন্ধ্রে অনুভব করল তার শরীরের রক্তস্রোতে, স্নায়ুর অভ্যন্তরে কোষে কোষে কি যেন উষ্ণ প্রস্রবণের মত গড়িয়ে পড়ছে। তার আত্মা চিন্তা এতকাল যে গুহায় লুকিয়ে ছিল অদ্বৈতাচার্য সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলোয় তাকে উদ্ভাসিত করল। বিস্ময়ের সুখকর উল্লাসে প্রশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল। আচার্য।

বিচিত্র বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল অদ্বৈতাচার্য। নিমাইর মনের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেল যেন। আত্মগতভাবে বলল: নবদ্বীপচন্দ্র গৌরচন্দ্রের উপর মানুষের অনেক প্রত্যাশা। কিন্তু সে আশায় দীপ জ্বলে কৈ? কোথায় গেল ভাগ্যবিড়ম্বিত বাংলার জনগণ-মন-অধিনায়ক? ইতিহাসের মহানায়ক।

নিমাইর অনুভূতির ভেতর একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। মুখে স্মিত হাসির দ্যুতি। আস্তে আস্তে বলল : আচার্য! বিধাতার সৃষ্টি রহস্য বড় বিচিত্র। দিনে জীবন বড় ছড়িয়ে থাকে রাত্রি তাকে গুছিয়ে আনে। রাত্রির জমাট অন্ধকারে জীবনকে বড় বেশি কাছে পাওয়া যায়। পাষণ্ডদের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে উৎপীড়নে, ধর্মান্ধতায় বঙ্গদেশের জীবনের থিত ভিত ভীষণভাবে নড়ে উঠেছে। পরাজয়ের আশঙ্কা পাষণ্ডদের মনে প্রবল হয়ে উঠেছে বলেই তারা মরিয়া হয়ে বিপন্ন অস্তিত্বকে আগলাচ্ছে। এক দারুণ হতাশায় ভুগছে তারা। এটা শুভ লক্ষণ। বেশ বোঝা যাচ্ছে তাদের জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অদ্বৈতাচার্যের উৎকর্ণ চোখে মুখে অস্থিরতা। সবেগে ঘাড় নেড়ে বলল : বিশ্বম্ভর তুমি অমন নির্লিপ্ত থেক না। নির্বিকারভাবে দেশকাল পরিস্থিতিকে দেখ না। পাষণ্ডরা গোপনে হিংসার ছুরিতে শান দিচ্ছে। তাদের সব আক্রোশ, ক্রোধের লক্ষ্য এখন তুমি। তোমার উপর প্রতিশোধ নিতেই তারা নির্বিচারে শান্ত নিরীহ ধর্মভীরু মানুষের উপর অত্যাচার করছে। তোমাকে নিবৃত্ত করার কৌশলরূপে তারা তোমার ভক্ত, অনুরাগী অনুগতদের নানাভাবে পীড়ন করছে। তোমার প্রভাব, গৌরবকে খর্ব করার ষড়যন্ত্রে কাজী এবং তার অনুগত জগাই, মাধাই, মেতে উঠেছে। তুমি ওদের আক্রমণের লক্ষ্য। ভীরু, কাপুরুষেরা তোমার জনপ্রিয়তা, লোক-বলকে ভয় পাচ্ছে। তুমি আক্রান্ত হলে জনরোষ থেকে তারা অব্যহতি পাবে না জেনেই তোমার ভক্ত ও অনুরাগীদের নিবৃত্ত করতে এবং তাদের নিষ্ক্রিয় করতে তারা মহীরুহ উৎপাটিত করার নীতি নিয়েছে। সাধারণ মানুষ তোমার প্রেমে অন্ধ। তোমার জন্যে পাষণ্ডদের সব দুঃখ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে প্রস্তুত। তুমি তাদের বহু প্রত্যাশার বহু স্বপ্নের মহানায়ক। তোমার ভরসাতেই তারা বেঁচে আছে। কিন্তু আর কতকাল তাদের এই নিগ্রহ, উৎপীড়ন সইতে হবে? আর কতকাল? তুমি বল?

নিমাইর মুখের ভাব পরিবর্তন হল। বজ্রাহতের মত স্তব্ধ বিস্ময়ে অদ্বৈতাচার্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের জন্যে তার কোন অনুভূতি ছিল না। শুকনো অধরদ্বয় কেবল থর থর করে কাঁপছিল। মুখে বিবর্ণ ভয় ও উৎকণ্ঠের ছাপ স্পষ্ট। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার

পর বিব্রত গম্ভীর গলায় স্বগতোক্তি করল : পাষণ্ডদের ছড়ানো পরিকল্পনার জাল একটু একটু করে কৌশলে টেনে তুলতে হবে। এবার লড়াই হবে ভক্তের সঙ্গে পাষণ্ডের।

অদ্বৈতাচার্য বিস্ময়ে একটু থমকে চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হতাশ গলায় উচ্চারণ করল : তোমার কথাগুলো নিরর্থক বলে উড়িয়ে দেব এমন জোরও পাই না, আবার অবিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। তবু তোমার রহস্য উদ্ধার করতে পারি না। সব কথা ভাল করে বুঝতেও পারি না। স্বপ্নের মানুষ বোধহয় স্বপ্নেই বাস করে।

নিমাইর মুখের ভাব কেমন হল। মুখে তার অনির্বচনীয় হাসির দীপ্তি॥

নিমাইর জন্যে শচীর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। তার উদাস উদাস ভাব, এবং অন্যমনস্কতা দেখে শচী ভয় পায়। বিশ্বরূপের মত নিমাই যদি সন্ন্যাসী হয় এই ভাবনায় কণ্টকিত হতে লাগল শচীর অন্তঃকরণ। যতদিন যেতে লাগল এই আশংকা তাকে ঘুণ পোকার মত কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল। এই উৎকণ্ঠা আতংক থেকে যদি তাব নিজের মৃত্যু হ'ত তা হলে সব চুকে যেত। কোন ভাবনাই আর ভাবতে হত না। কিন্তু ঈশ্বর বড় নিষ্ঠুর। এখন অনেক কিছু দেখার জন্যে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গত জন্মে অনেক পাপ করেছে সে। তার পাপের বোঝা এত ভারী যে এতগুলি মৃত্যুর শোকেও তার ভার হাল্কা হয়নি। পুত্রের গৃহত্যাগের মত একটি পুণ্য কর্মেতেও তার পাপ পরিশোধ হয়নি বলেই পুত্রবধূর অকাল মৃত্যু ঘটল।

অতি স্পর্শকাতর মনটা শচীকে কষ্ট দেয়। শচীর অন্তরের কথা'ত পাঁচজনকে বলার নয়, বলতেও পারে না। একা একা অন্ধকূপের মধ্যে তলিয়ে নিভৃতে নিজেকে অন্বেষণ করে। লক্ষ্মীর মুখ ভাসে চোখের উপর। নিমাইর সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে হোক এটা কোনদিন সে মনে প্রাণে চায়নি। তার নিজের পছন্দ করা মেয়ে ছিল সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করুক এটাই ছিল অন্তরের ইচ্ছে। কিন্তু নিমাই সে ইচ্ছেয় বাদ সাধল। মাধবাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে নিমাই ভালবাসে। তাকে ছাড়া অন্য কারোকে বিয়ে করবে না। মায়ের আদেশ হলেও না। মাতা পুত্রের মনোমালিন্য চলল কদিন ধরে। অবশেষে সম্মতি আদায় করতে নিমাই ক্রোধে উন্মাদ হয়ে বলল : মা হয়েছ বলে যা খুশি করতে পার না।

প্রত্যেকের নিজের একটা মন এবং ইচ্ছে বলে জিনিস আছে। সেই মন ও ইচ্ছে হল তার নিজের পৃথিবী। কোন মায়ের সেখানে অনুপ্রবেশের অধিকার নেই। এ কোন স্বার্থের নয়, অধিকারের লড়াই ব্যক্তিত্বের সংগ্রাম। ছেলে হয়েছি বলে তোমার ইচ্ছেটাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে পার না। দিলেও, আমি মানতে বাধ্য নই।

নিমাইর মুখে এমন একটা নিদারুণ মর্মস্পর্শী কথা শোনার জন্যে শচী প্রস্তুত ছিল না। তাই বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হতবাক হয়ে গিয়েছিল। দুঃখও পেয়েছিল খুব। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারে নি। একটা থম ধরা কান্নায় তার বুকটা টাটাচ্ছিল! মনটা হেরে যাওয়ার দুঃখ ও আত্মগ্লানিতে পাষাণ হয়ে গিয়েছিল। নিমাইর বিয়ের পরেও সে বেদনা ভুলতে পারেনি। শুধু সেই কারণেই লক্ষ্মীর সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর হয়নি। কোথায় যেন একটা কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা ছিল। নিজের আচরণে কথাতে অজান্তে সে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ হয়ে পড়ত। ফলে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কে একটা চিড় ধরেছিল। কিন্তু কোনদিনই কেউ কাউকে বুঝতে দেয় নি। তাদের নিঃশব্দ অন্তর্দ্বন্দ্বের সাক্ষী ছিল শুধু অন্তর্যামী।

নিমাইর শ্রীহট্টে যাওয়ার পরেই তাদের ভেতরের বিরোধটা আর চাপা রইল না। প্রকাশ হয়ে পড়ল। মনোমালিন্য নিমাইকে নিয়ে। পূর্ববঙ্গে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া শাশুড়ী বৌ-র অন্তরে এক অসহায় শূন্যতার যন্ত্রণায় যেন ক্রিয়াশীল ছিল।

লক্ষ্মীর সব সময় কেমন একটা মন মরা ভাব। তার বিষণ্ণ থমথমে গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকাতে শচীর কষ্ট হত। বুকের ভিতর কেমন একটা উথলে উঠার ভাব হত। নিমাইর জন্যে মনটা হু-হু করত। হাউ হাউ করে খানিকটা কাঁদত। নিজের মনে বলত: সারা জীবন ধরে আমাকে জ্বালিয়েছে। একটু সুখে থাকতে দেয় নি। আমার দুঃখ কষ্টটাকে কোনদিন চেয়ে দেখল না।

লক্ষ্মী হতাশভাবে মাথা নাড়ল। শচীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। একটা শ্বাস ফেলে বলল: বলে, লাভ নেই। ভীষণ নিষ্ঠুর। নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসল না।

কথাটা শচীর সহ্য হল না। সে নিজে যা বলুক তাতে দোষ নেই। কিন্তু অন্য কেউ নিন্দে মন্দ করলে সহ্য করতে পারে না। ঝংকার দিয়ে বলল:

ওর দোষ কি? তুমি একটু চাইলেই ও যেত না শ্রীহট্টে। ওকে আটকানোর কোন চেষ্টাই তুমি করনি। দোষত তোমারই। তুমিই নিষ্ঠুর।

লক্ষ্মী সিউরে উঠে বলল: বলছেন কি? এত বেশি করে চেয়েছিলাম বলেই ঠেকাতে পারিনি। একটু তফাতে, একটু দূরে রাখলেই বোধ হয় ভাল হত।

জ্বালাভরা চোখে শচী লক্ষ্মীর দিকে তাকাল। কিন্তু কথাটার অর্থ কি বুঝল সেই জানে। বুকের ভেতরটা তার দুর-দুর করে উঠল। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল: তোমার অবহেলা আমার নিমাইতো সইতে পারে নি বৌমা।

কথাটা শুনে লক্ষ্মীর মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রেগে গেল ভীষণ। চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। গলাটা সামান্য নামিয়ে বলল: আমি না হয় অবহেলা করেছি, কিন্তু মায়ের সমাদর আদরত ছিল। তা-হলে মাতৃভক্ত ছেলেকে মা ঠেকাতে পারল না কেন?

শচীর কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল। উত্তেজিত হয়ে বলল: পারব কোথা থেকে? ছেলে আমার আর বশে আছে কি? তুমি তাকে মন্ত্র করেছ।

লক্ষ্মী ভুরু কুঁচকে যতদূর সম্ভব কঠোর মুখ ভঙ্গি করে বলল: সবত জানেন। তবু মিছেমিছি বকেন কেন? বলে কি লাভ? শুধু কষ্ট দেয়া। রুদ্ধ ক্রোধে নিজের মনে গজর গজর করে বলল, মন্ত্র করেছে। মন্ত্র করে বশ করতে পারলাম কৈ?

সেটা ভাবতেও লজ্জা হয় আমার। বলল শচী।

লজ্জা থাকলে'ত বাঁচতাম। তাহলে রোজ এই লোক হাসানো শাশুড়ী বৌ-র ঝগড়া হত না। ভীষণ বিশ্রী লাগে। ও নেই বলে, যা খুশি আপনি বলতে পারেন না।

ক্রোধে শচীর গলা কেঁপে গেল। চমকানো স্বরে ধমকালো: বউমা! তোমার স্পর্ধা অসহ্য।

শাশুড়ী বৌর এ হল প্রতিদিনের কোন্দল। ভীষণ একঘেয়ে। এক অসহায় অভিসম্পাতের মত মনে হয় তাদের নিজের অবস্থাকে।

এই ভাবেই দিন কাটে। মাস যায়। তবু নিমাইর কোন খবর নেই। লক্ষ্মীর আর কিছু ভাল লাগে না। ভীষণ ফাঁকা আর শূন্য লাগে। সব অর্থহীন মনে হয়। কাজে তার আগ্রহ নেই, মনে উল্লাস নেই। এমন কি নিজের প্রিয় সাজগোছের প্রতিও নেই বিন্দুমাত্র কৌতুহল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায়

তার দিন কাটে ! নিজের অস্তিত্বটাই তরে কাছে ভার হয়ে উঠল। স্বামীর ঔদাসীন্যের জন্যে তার বুকের ভেতর পাক দিয়ে উঠে ছলছল কান্নার ঢেউ। একা একা বসে কাঁদে। কখনও হতাশ চোখে চেয়ে থাকে দিগন্তের দিকে। তার ঘন কালো আয়ত দুই চোখের করুণ দৃষ্টিতে কি যেন এক না পাওয়ার আর্ত্তি। নিদারুণ এক গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তার মন। উৎকণ্ঠা দুর্ভাবনা বিষাক্ত পোকার মত তার বুকের ভেতরটা কুড়ে কুড়ে খায়। তবু মুখ বুজে মনের যন্ত্রণা চেপে সারাদিন শাশুড়ীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তার সঙ্গে ঘর গেরস্থলীর কাজে সাহায্য করে। যখন মনটা বড্ড খারাপ লাগে, নিম গাছের সুশীতল ছায়ার গিয়ে বসে। নিমাইর প্রিয় নিমগাছটি তার মনের শান্তি, যন্ত্রণার আরাম। এখানে বসলে নিমাইর স্পর্শ সে গায়ে অনুভব করে। এই অনুভূতির উৎস তার মনে ও কল্পনায়। শুধু এ জায়গাটুকু ছাড়া তার কাছে সব মরুভূমি।

লক্ষ্মী ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। গায়ের রঙ মলিন আর তামাটে হয়ে গেছে। লক্ষ্মীর চোখে ছায়াপাত ঘটেছে। কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব তার। আহারে মনোযোগ নেই, কর্মে-আগ্রহ নেই। শয়নে স্পৃহা নেই। কোন কিছুতে আসক্তি নেই। মনের মধ্যে কোথায় যেন হেরে যাওয়ার একটা দুঃখ, বেদনা আর আত্মগ্লানি আছে। যা মন থেকে মুছেও মোছে না। দিন-গুলোর শূন্যতা লক্ষ্মীকে চেপে ধরে। আসলে লক্ষ্মী নিমাইকে খুঁজছিল মনের অভ্যন্তরে। কিন্তু শূন্যতায় বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠে। একটা যন্ত্রণায় ছটফট করে। থেকে থেকে শুধু দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

লক্ষ্মীকে দেখলে শচীরও কষ্ট হয়। সমবেদনার সরোবর টল টল করে উঠে বুকে। তবু, সেদিন ভর সন্ধ্যায় নিমাগাছের নিচে হঠাৎ তার গভীর শ্বাসের শব্দে শচী ভীষণ চমকে উঠেছিল। আর কেমন একটা অমঙ্গল আশংকায় তার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে উঠল। তাতেই তার শরীর মন কন্টকিত হল ভীষণ। রাগ উথলে উঠল। শচীর বুকের ধকধকানিটা হঠাৎ শুরু হল এসময়। মুখ রুদ্ধ রোষে টকটকে লাল হয়ে গেল।

লক্ষ্মীর গম্ভীর থমথমে বিষণ্ণ চিত্রবৎ মূর্তির দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বলল : অলক্ষণে মেয়েমানুষ।

গালাগালিটা লক্ষ্মীকে ভীষণ বিঁধল। অপমানে তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল। কিন্তু শচী তখনও রাগে থরথরে করে কাঁপছিল।

লক্ষ্মীর প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় সে কাঁপতে কাঁপতে জ্বরগ্রস্ত রোগীর গলায় বলল : দিনরাত মুখ পুড়িয়ে শুধু হা হুতাশ করছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। স্বামী যেন কারো বিদেশে যায় না। ঢং। বিদেশ বিভুঁইতে স্বামী থাকলে লোকে কত পূজো-অর্চনা করে, মানত করে; সে সব নেই, আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকা, দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল ফেলা। এসব করলে সংসারে কখনও কল্যাণ আসে না। ঘরের বৌ হল লক্ষ্মী! তোমার নামটাই শুধু লক্ষ্মী।

লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে লক্ষ্মীর কান্না আসছিল। কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে দমন করে রাখল। চুপ করে দাঁড়িয়ে সম্ভবত পরিস্থিতিটা একটুখানি ভেবে নিল। তারপর খুব কষ্টে একটু ফিক করে হেসে সব ব্যাপারটাকে লঘু করে দেয়ার জন্যে বলল : নামটা লক্ষ্মী নয়, লক্ষ্মী প্রিয়া।

শচীর রাগ তাতে আরো চড়ল। উন্মাদ সেই পিশাচ রাগ লুপ্ত করে দিল কাণ্ডা-কাণ্ডজ্ঞান। ঝংকার দিয়ে বলল : রঙ্গ দেখে গা জ্বলে যায়। এক একটা অলক্ষণে মেয়েমানুষ থাকে তারা নিজেরাও সুখী হয়না, সংসার-কেও সুখী করতে পারেনা। তাদের জন্যে সংসারটা ছারখার হয়ে যায়।

লক্ষ্মী আর্ত গলায় ডাকল : মা !

শচী রাগে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। ভিতরকার উত্তেজনায় সে যা বলল তা অকপট মন থেকে উঠে আসা কথা। ঘটনার আকস্মিকতায় তার আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল কিছুক্ষণের জন্যে। ভীষণ নিষ্ঠুর আর বিবেকহীন ভাষায় বলল : তখন পই পই করে বলেছি, বিয়ে করিস না। কিন্তু শুনেছে কি আমার কথা। শোনেনি বলেই, বছর ঘুরতে না ঘুরতে মোহ কেটে গেছে। মোহ'ত আর চিরকাল থাকেনা মানুষের। বিশেষ করে পুরুষের। এখন ছেলের চোখ খুললে কি হবে? বুঝি'ত ছল-চাতুরী করে বিবাগী হয়েছে। কে জানে, আর ফিরবে কি-না? সন্ন্যাসী ওর কুষ্ঠিতে লেখা।

লক্ষ্মী বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ বোধ হয় সে মানুষ ছিলনা। পাথর হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে মাথা তুলতে পারল না। বুকের ভেতর তার ঝড়ো বাতাসের দোলা। অপমানটা এত গভীরভাবে তার মনে বেজেছিল যে তার কথা বলার মত মনের অবস্থা ছিলনা। মনের যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে যেতে অসহায় চোখ মেলে শচীর দিকে চেয়ে রইল। নিজের উপর তার প্রচণ্ড ঘৃণা হল। ধিক্কার দিল নিজেকে শতবার। তার মত মানুষের কোন প্রয়োজন নেই এই সংসারে। তীব্র

অভিমানবোধে তার বুক টাটাচ্ছিল।

শচীর তিরস্কার শুনে লক্ষ্মীর আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করলনা। এই মুহূর্তে তার মরণটা হলে সুখকর হত। প্রাণটা তার কিসের ভারে যেন ভেঙে পড়তে চাইছিল যা প্রায় অসহনীয়। লক্ষ্মীর অসামান্য মুখশ্রীতে কষ্টের ছাপ এবং অপমানের যন্ত্রণার ভয়াবহতা ফুটে উঠল।

লক্ষ্মী চোখে কিছু দেখছিলনা। মস্তিষ্কও তার শূন্য ফাঁকা। অনুভূতি-বিহীন মনের মধ্যেও এখন কোন দুঃখও নেই, সুখও নেই। কানে শুধু ঝংকারে বাজছিল শচীর উন্মাদ তিরস্কার। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তীব্র একটা অপমানের স্রোত গড়িয়ে পড়ল। সমস্ত শরীরটাকে ধরে প্রচণ্ড ঝাপটা দিচ্ছে। আকাশ, পৃথিবী হারিয়ে গেল। সব অর্থহীন হয়ে গেল। প্রেম মরে গেলে আর কি থাকল জীবনে? লক্ষ্মীর শুধু মনে হতে লাগল শচীর উন্মাদ তিরস্কার তার সমস্ত সত্তাকে আক্রমণ করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। মনে হল এখন সে দ্বিখণ্ডিত। তার পূর্বের সত্তাটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন মৃত্যুই তার শ্রেয়। এটাই হয়ত এ সংসারে, এবং নিমাইর নূতন জীবন সূচনা করবে। লক্ষ্মীর এই মুহূর্তে মনে হল সে বড় একা। বড় দুর্ভাগা।

আস্তে আস্তে লক্ষ্মী উঠে দাঁড়াল। কাঁপা কাঁপা বুক নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল। শচীও তার সঙ্গে যেতে যেতে রূঢ় গলায় বলল: এই ভর সন্ধেতে ঘরে ঢুকে খিল দিও না বলছি। ভাল হবে না কিন্তু। মেয়েমানুষের এত তেজ ভাল নয়। অন্ধকারে শচীর কণ্ঠস্বর কেমন কঠিন শোনাল।

লক্ষ্মী স্তব্ধ। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ছিল। একটি কথাও বলল না। নিঃশব্দে নিজের ঘরে গেল। ঢোকার আগে দরজাটা একটু অল্প করে ভেজিয়ে দিল।

গভীর রাত।

লক্ষ্মীর ঘর থেকে অস্ফুট গোঙানির মত একটা শব্দ আসছিল। অনেকক্ষণ ধরে। শচীর মনটা সহসা ঝাঁৎ করে উঠল।

কেমন একটা সন্দেহে ঘুলিয়ে উঠল মন। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় তার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। একটা অজ্ঞাত ভয়ে অস্থির হল সে। নিমগাছের নিচে লক্ষ্মীর মৌন গম্ভীর বিষণ্ণ মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠল। দুই চোখে তার জ্বলন্ত ঘৃণা আর দুরন্ত বিতৃষ্ণায় জ্বল জ্বল করছিল। মনে হয়েছিল, একটা কিছু অঘটন সে করবে। শচীর ভেতরটা ছটফটিয়ে উঠল ভীষণ। পাগলের মত সে লক্ষ্মীর ঘরের দিকে দৌড়ে গেল।

দরজা ঠেলতেই হাট হয়ে খুলে গেল। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় লক্ষ্মীকে দেখা যাচ্ছিল। লণ্ডভণ্ড বিছানার উপর তার দেহটা শিথিলভাবে পড়ে আছে। প্রাণের স্পন্দন আছে কি নেই বোঝা গেল না। ঠোঁটের কোণা বেয়ে কষ আর ফেনা গড়াচ্ছিল। গলা থেকে খুব ক্ষীণ একটা শব্দ হচ্ছিল।

দৃশ্যটা দেখে শচী প্রথমটা অবাক বিস্ময়ে থমকে চেয়ে রইল লক্ষ্মীর দিকে। শিরদাঁড়ার ভেতর শির শির করে উঠল। তারপর তার বুক জুড়ে দেখা দিল ভয়। লক্ষ্মী কি তবে বিষ খেয়েছে? ও কি মরে যাচ্ছে? কিন্তু ওর আত্মহত্যা করার মত কি ঘটল? হায় হায় করে উঠল শচীর বুকের ভেতরটা। কিন্তু সে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হলনা। এই মুহূর্তে যদি চেঁচায় লোক জানাজানি হয়ে যাবে। বিশ্রী এক পরিস্থিতির মুখে পড়বে সে।

লক্ষ্মীর শ্বাস চলছিল। জ্ঞান কিছুটা লুপ্ত হয়ে গেছে। হতবুদ্ধি শচীর বুকের ভেতর থেকে আর্তনাদের মত একটা স্বর বেরিয়ে এল! বৌমা এ তুমি কি করলে? এ সর্বনাশ তুমি কেন করতে গেলে? আমি এখন কি করব? কি বলব? এত রাতে কোথায় যাব? কাকে ডাকব? লোককে কি কৈফিয়ৎ দেব? নিমাইকে কি বলব? বৌমা তোমার এমন হল কি করে? তোমাকে কি সাপে কেটেছে? তুমি কথা বলছ না কেন? বল, তোমায় কি সাপে কামড়িয়েছে? কথা বল? লক্ষ্মী-মা আমার কথা বল।

শচী তারপরেই দৌড়ে গিয়ে কুঁজো থেকে জল নিয়ে তার মুখে জোরে জোরে ঝাপ্টা দিল। পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

লক্ষ্মী খুব কষ্টে একবার তাকিয়ে দেখল। তার চোখ দুটো বড় বড়। কপালে রক্তোচ্ছ্বাস। মুখটা হাঁ করা। মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়াবহতা ফুটে উঠেছিল তার অপরূপ মুখশ্রীতে। শচী উপুড় হয়ে পড়ল তার বুকে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে পাগলের মত কাঁদতে লাগল। বল, বৌমা, কথা বল।

লক্ষ্মী অসহায়ভাবে যন্ত্রণায় মাথা নাড়ল খুব ধীরে। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠল সামান্য। সমস্ত দেহটা একবার ধনুকের মত একটু বাঁকল। তারপর সব স্থির হয়ে গেল। কেমন একটা ঘুমের মধ্যে যেন ডুবে গেল।

লক্ষ্মীর উপর প্রচণ্ড রাগ আর বিতৃষ্ণা শচীকে ক্ষণিকের জন্যে পাগল করে তুলেছিল। তাই, লক্ষ্মীর মৃত্যুতে একটা অপরাধবোধে তার বুক টাটাতে লাগল। নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারছিল না। কিন্তু সেকথা কাউকে

বলার নয়। তাই লক্ষ্মীর মৃত্যুর ঘটনায় বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া, গভীর ভালবাসা।*

লক্ষ্মীপ্রিয়া নেই। কিন্তু মনের অভ্যন্তরে রয়ে গেছে সে এক ভিন্ন অস্তিত্ব। কারণে অকারণে মনে হয় তাকে। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে বলে, ঈশ্বর লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইর বিয়েটা চায়নি। তাই, অকালে তাকে তুলে নিলেন। ঈশ্বরের কাজকর্ম কে কবে বোঝে? বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইর বিয়ে হোক, এটাই বিধাতার শেষ ইচ্ছা কিন্তু মাঝখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এমন ঘটনাই অহরহ হচ্ছে। নিমাইকে সেই কথাটা বোঝানোর মত কঠিন আর কিছু ছিলনা। তবু, নিমাইব জন্যে এই বাধা তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। কিন্তু কিছুতে সাহস করে কথাটা বলতে পারল না। অবশেষে ভাবল ঘটক কাশীনাথ মিশ্রকে দিয়েই নিমাইকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। কিন্তু সাংসাবিক বুদ্ধি দিয়ে শচী বুঝতে পারল, এতে তার নিজের অপমান হবে। নিমাইর চোখে নিজেকে দোষী ও অপরাধী করে তোলা হবে। কিন্তু সেত কোন দোষ করেনি। তা-হলে, এই ভয় কেন? শচী নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিল-ভয় নয়, লজ্জা। বড় লজ্জা। কিন্তু সন্তানের কাছে মায়ের কোন'ত লজ্জা থাকার কথা নয়। একমাত্র সন্তানই পারে মাকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে। এরকম একটা অনুভূতিতে মনটা ছেয়ে গেল।

মাতা-পুত্রে রোজ একসাথে মধ্যাহ্ন ভোজন করে। আহারের সময় সুযোগ বুঝে বিয়ের কথাটা নিমাইকে বললে ভাল বলে মনে করল শচী। কিন্তু তাকে কিছুই করতে হলনা। নিমাই নিজে তার এক অনুকূল অবস্থা তৈরী করল। শচী শুধু স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কূলে পৌছল। এজন্য মনে মনে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞচিত্তে অজস্রবার প্রণাম করল।

নিমাই আচমন করে ভাতে হাত দিয়ে নিজের মনেই বলল: সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরই পাইনা। দেখতে দেখতে বাবার মৃত্যু দশ বছর

*প্রভুর বিরহ লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প বিষে তার পর লোক হৈল॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

এই পংক্তিটিতে সর্পের দংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে এক সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। কবি প্রতীকের রূপ দিয়ে বলেছেন যে, বিরহের বিষ সর্পের আকার ধরে যেন তাকে ছোবল মারল! লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু নিছকই একটি আত্মহত্যা ঘটনা। নিমাই নিজের পছন্দে লক্ষ্মীকে বিয়ে করে। এই বিবাহের পরিণতিতে কিছু অন্তর্বেদনা ছিল বলেই আমার মনে হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইংগিতে তাকে বাচ্যার্থ করে তুলেছে।

হয়ে গেল। অথচ বাবার ইচ্ছেটা আজও করা হয়ে উঠল না। তাই ভাবছি আর দেরি করব না। এবার গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে আসব। তোমার অনুমতি পেলে যাত্রার আয়োজন করতে পারি।

স্বামীর কথায় শচীর মন খারাপ হল। দুই চোখ ছল ছল করল। বেশ কিছুক্ষণ বিমর্ষ চোখে নিমাইর দিকে চেয়ে রইল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল নিজের অজান্তে! বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল: মন যখন হয়েছে বাধা দেবনা। অনেক পথ। ফিরতেও অনেকদিন লাগবে। এসে দেখবি আমি নেই।

অমন কথা বলনা।

বলি কি সাধে? তোকে নিয়ে'ত আমার ভাবনা। সংসারে যার কোন বন্ধন নেই, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়।

কেন চিন্তা কর? পৃথিবীতে সব অনিত্য! তবু লোকে আমার আমার করছে। মায়া, মোহ জন্মগত সংস্কার। জীবনের অভিশাপ।

চমকানো বিস্ময়ে শচী ডাকল: নিমাই!

মা! তুমি ভয় পেয়েছ?

পাব না? আমার অবলম্বন যে তুই বাপ। তুই ছাড়া আর কেউ নেই। শচীর বুক ভাসিয়ে কান্না নামল। কান্না জড়ানো গলায় বলল: তোর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। বুকের ভেতরটা আমার হাহাকার করে উঠে। বড় মন্দ ভাগিনী আমি। এই সংসারে আমার আর রুচি নেই। শুধু তোর জন্যে পড়ে আছি। তোর কিছু না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি, শান্তি, সুখ কিছু নেই। মরেও আমি শান্তি পাব না। তোর বাবার মত আমারও একটা গতি করে দে-তাহলে।

নিমাই মৃদু মৃদু হাসল। বলল: তোমার অন্তিম ইচ্ছে কি বল?

শচী বাম হাত দিয়ে নিমাইর একখানা হাত চেপে ধরে বলল: তুই আমাকে কথা দে আবার বিয়ে-থা করে সংসার ধর্ম করবি!

আকস্মিক বিস্ময়কর চমকে নিমাই চমকে উঠেছিল। একটু থমকে শচীর দিকে চেয়ে রইল।

শচী পুত্রের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলল: মা হয়ে তোর কাছে ভিক্ষে চাইছি।

নিমাইর ভাষাহীন চোখ শচীর চোখের উপর স্থির হয়ে রইল। জননীর আকুল প্রার্থনা তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। ভীষণ অসহায় বোধ

করছিল। উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে সে ধীরে ধীরে কয়েকবার মাথা নাড়ল। তার অর্থ অস্পষ্ট। নানাবিধ মিশ্র প্রতিক্রিয়ায়। ইতস্তত করে বলল: মা তুমি অবুঝ হয়ো না। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

শচীর আর তর সইছিল না। ব্যস্ত ব্যাকুল গলায় বলল: এতে ভাবাভাবির কি আছে? বিষ্ণুপ্রিয়া'ত দেখতে খারাপ না। রূপে গুণে অনন্যা। বড় মিষ্টি মেয়ে।

শচীর চোখের উপর নিমাই চোখ রাখল। দৃষ্টি স্থির। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। খানিকটা অসহায় ভাবে মাথা নাড়ল। স্মিত হেসে বলল: বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাওয়া কি ভাল হবে মা?

শচী রাগল না, গর্ব করে একগাল হেসে বলল: সোনার আংটি আবার ঠেঁকা। আমার ছেলে কম কিসে? সনাতন মিশ্রের পয়সা আছে আমার ছেলে মানুষের হৃদয়ের রাজা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। সনাতন মিশ্রের অবলম্বন রাজশক্তি, আমার পুত্রের সহায় বিপুল গণশক্তি। কম কিসে?

শচীর কথাগুলো নিমাইর মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। বোবা বিস্ময়ে নিমাই জননীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ঐ সময় তার অনুভূতি জুড়ে কত কথা, আশঙ্কা, চাঞ্চল্য, অস্বস্তির স্রোত বয়ে গেল। এক ঘোর লাগা আচ্ছন্নতায় তার চোখ দুটি বিধুর হয়ে উঠল। অভিভূত গলায় বলল: মা আমার জীবনে কোন কিছুই নির্বিঘ্নে রাখেনি আমার অদৃষ্ট দেবতা। নিরাপদ সুখী জীবনের আনন্দ ভোগ আমার আমার ভাগ্যে নেই। বেশ বুঝতে পাচ্ছি, আমার ভেতর এক ঘুমন্ত আমির ঘুম ভাঙাতে অদৃষ্ট তোমাকে দিয়ে এই কাজ করে নিল। জীবন নাটোর এক অঙ্ক শেষ হল লক্ষ্মীর মৃত্যুতে। দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনা হবে সনাতন মিশ্রের কন্যাকে দিয়ে। এখানকার প্রবেশ মনে হচ্ছে বড়ই চমকপ্রদ।

নিমাইর কোন কথাই বোধগম্য হল না শচীর। তবু তার শান্ত সরল দুই চোখে উজ্জ্বল বিস্ময়। আত্মপ্রসাদে স্নিগ্ধ। ভারী অপরূপ দেখাল তাকে। কিন্তু মনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে মৃদু স্বরে ভর্ৎসনা করে বলল: তোর সব ব্যাপারে হেঁয়ালি। উল্টো-পাল্টা কথাগুলো মিলিয়ে রসোদ্ধার করব সে বিদ্যে কোথায়?

নিমাইর অধরে স্মিত হাসি। বলল: এ হল জীবন রহস্য। রহস্যকে বুঝে ফেললে'ত আর রহস্য থাকে না।

বিয়ে নিয়ে নিমাইর কোন কৌতূহল কিংবা আগ্রহ নেই, দুঃখিনী জননীকে সন্তুষ্ট করতে সে বিয়ে করছে। বিয়েটা তার অনিচ্ছাতে হচ্ছিল বলেই বিয়ে সম্পর্কে সে ভীষণ নির্বিকার এবং উদাসীন। লক্ষ্মীর অস্তিত্বটাকে সে ভুলতে পারছিল না। কেবলই তার মনে হতে লাগল এক জীবনে এক মনে দুটি নারীকে ভালবাসা যায়? লক্ষ্মীর কথাটা যতদিন মনে থাকবে ততদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তার মনের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। এক সঙ্গে অনেক মানুষকে ভালবাসার আশ্চর্য ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু সে ভালবাসার আর দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে তফাৎ অনেক। দাম্পত্য প্রণয়ের জগৎ এতই সীমিত যে একজনকে দেবার পর সে যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। লক্ষ্মী তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেবার মত প্রেম কোথায়? প্রেমের অভিনয় করার মধ্যে এক রকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। এক ধরণের পাশবিকতা আছে। নিমাইর তাই বারংবার মনে হতে লাগল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে একটু আদর কিংবা সোহাগ দেখানো মানে নিজের সঙ্গে ছলনা করা। এই ছোট্ট ছলনাটুকু তার সমস্ত সৌন্দর্যবোধ সমস্ত সুরুচিকে বিদ্রূপ করবে। তার সোহাগের নামে নিজের প্রতি জমে উঠা ঘৃণাটাই বিষের মত উগড়ে দেয়া হবে। তাই বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবটাকে সে মানিয়ে নিতে পারছিল না।

ফুরফুরে হাওয়ায় গাছের পাতার মত নিমাইর মনও আন্দোলিত হতে লাগল। মনে হল, একটা জীবনকে পূর্ণ করতে বোধ হয় অনেক জীবনের দরকার হয়। অনেক অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। সব কিছুর মধ্যে দিয়ে না গেলে, সমস্ত ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে নিজেকে না নিয়ে এলে বোধ হয় জীবন পূর্ণ হয় না। জীবনের সব কিছু পাওয়ার জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হয়। এক বৃহৎ জীবনের জন্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার উৎসর্গ বোধ হয় চায় বিধাতা।

নিমাই ভাবছিল নীরবে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। ফুলের মত নিস্পাপ জীবন চোখের সামনে ধূপের মত নিঃশেষ হয়ে যাবে এটা দেখাও যন্ত্রণার। তার নিজের এসব ভাবনার কথা অন্য কাউকে বলে কোন লাভ হয় না। হবে কি করে? একজন মানুষের ভাবনা যে এক এক স্তরের।

নানা অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা মনের মধ্যে ভীড় করে আসছে।

জীবনটা ঝর্ণার মত। অনেক বাঁক বাঁধা, রোদ ঝলমল ছায়া নিবিড় পাহাড় উপত্যকা পেরিয়ে এসে নদীতে পড়ছে সাগরে মেশার জন্যে। সাগরকে চির বহমান রাখার জন্যে উৎসের এই নিরন্তর অভিযাত্রার একটা মানে আছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তার এই বিয়েটারও একটা অর্থ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই।

বিয়ের দিন যত এগিয়ে এল ততই তার একটা ছবি ফুটে উঠল। তার বিয়ে নিয়ে গোটা নবদ্বীপের লোক চিন্তা করছে। কি করলে বিয়েটা রাজ-পণ্ডিতের কন্যার উপযুক্ত হয় তাই নিয়ে তাদের জল্পনা-কল্পনা। আড়ম্বরে জাঁকজমকে, বৈচিত্র্যে বিয়ের অনুষ্ঠানকে রাজকীয় করে তোলার কাজে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ ও সাধ্য নিয়ে মুকুন্দ, সঞ্জয় এবং অদ্বৈতাচার্যর পাশে এসে দাঁড়াল। নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্তখানও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

নিমাইর বিস্ময়ের অন্ত নেই। নিজের দুঃখ নিয়ে সে সকলের কাছ থেকে সরে ছিল। প্রত্যেক মানুষ নিজের দুঃখকে একা একাই বয়ে বেড়ায়। নিমাইও নিজের দুঃখ কষ্ট নিয়ে সে একেবারে একা। সত্যিই একা। সকলের মধ্যে থেকে ও একা। গাছের মতই একা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার ধারণা সত্য নয়। মানুষও গভীর জঙ্গলের গাছের মতই জড়াজড়ি করে ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। সবাইকে নিয়ে মানুষের সমাজ, মানুষের পৃথিবী। সকলে মিলে একসঙ্গে না থাকলেও একে অন্যের হাতে হাত রেখে, ছোটখাট অমিল নিয়ে, ছোটখাট সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে মানুষের এক না হয়ে উপায় নেই। মানুষ'ত আর গাছ নয়। গাছের মত একা, বিচ্ছিন্ন কিংবা নির্বিকার ঔদাসীন্য নিয়ে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর মানুষ পারেও না থাকতে। তার বিয়ে উপলক্ষ্য করে নবদ্বীপের মানুষ যেন সেই কথাটাই প্রমাণ করল শুধু একটু বাঁচার পরিবেশ হলেই তারা বেঁচে উঠতে পারে। সে পরিবেশ সমাজের হোক আর মনের হোক। সংস্কার, ধর্ম, বিশ্বাস, সামাজিক নিয়মকানুন সব কিছুকে ফেলে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সহ মানুষ তাদের প্রাণের নিমাইর বিয়েতে মিশে যেতে চাইছে। এটাই ভারতবর্ষের জীবনের মূল স্রোত। সবাইকে নিয়ে ভারতবর্ষ। পরস্পরের সঙ্গে মিলে যাওয়া, এক হওয়ার শুভ ইংগিত যেন বহন করে আনল বিয়েটা।

ভাবনাটা নিমাইকে বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল। এ রকম একটা পরিবেশের

সে কল্পনা করত। শ্রদ্ধা আর সম্মান নিয়েত মানুষের সমস্ত সম্পর্কের ভিত্ত গড়ে উঠে। প্রেমের বন্ধুত্বের। দেশের মানুষ যেদিন সর্ব শ্রেণীর মানুষকে সত্যিকারে সমানত্ব দেবে, মানবিকতার সম্মান ও মর্যাদা দেবে সেদিন সব মানুষ মাথা উঁচু করে আপন মর্যাদা ও গৌরবে শ্রেয় হয়ে উঠবে ! এটাই জীবন ধর্ম।

নিজের জীবনের ঘটনা নিয়েই যে সামাজিক মেলামেশার সেই মঞ্চটির ভিত স্থাপন করতে হবে নিমাই ভাবেনি কখনও। লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ে গিয়ে মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। বিষণ্ণ হাসি হেসে নিজের মনে বলল ঃ বাস্তব কি নির্মম, বিধাতা কি নিষ্ঠুর ! বড় কিছু পাওয়ার জন্যে বড় বেশি দাম দিতে হয় ! জীবনের কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর কখনও কখনও মানুষকে একা একাই দিতে হয়। এরকম কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত যেন মানুষের জীবনে না আসে। একটা লম্বা শ্বাসের সঙ্গে তার কথাগুলো বেরিয়ে এল।

বিয়েটা নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হল।

জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে নবদ্বীপের সব মানুষ নিমন্ত্রিত হল। এর ব্যয়ভার বহন করল নবদ্বীপ সামন্তরাজ বুদ্ধিমন্তখান। নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়নের সব দায়-দায়িত্ব নিমাই ইচ্ছে করেই যবন হরিদাসকে দিল। বুদ্ধিমন্তখান নিজে গোটা ব্যবস্থাপনার তদারকী করল। প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান সকল বর্ণের এবং ধর্মের মানুষের অবাধ মেলামেশার এক মঞ্চ হয়ে উঠল। নিঃশব্দে যেন এক সামাজিক বিপ্লব ঘটে গেল। সবার উপর মানুষ সত্য এই আদর্শের এক বাস্তব পরিবেশ তৈরী হল।

মানুষে মানুষে যে বৈষম্য নেই এই সরল সত্যটাকে সব মানুষ বুঝে গেল। ধর্ম মানুষের মিলনের পথে বাধা নয়, ধর্মের ছোঁয়াছুঁয়িতে জাত নষ্ট হয় না, মানুষ অশুচি হয় না। মানুষে মানুষে মধুর সম্পর্ক স্থাপনে ধর্ম কোন বাধা নয়। ধর্ম মানুষকে সৎ ও ধার্মিক করে। মানুষকে সুন্দর ও মহান করে। এ রকম একটা অনুভূতির রেশ বহুদিন মানুষের মন থেকে কাটবে না। এই বিবাহের স্মৃতিটা যতদিন তাদের মনে থাকবে ততদিন তারা ভুলবে না, মানুষের পরিচয়েই তারা অভিন্ন হতে পেরেছিল।

কিন্তু এতবড় একটা কঠিন কাজ কেমন করে সম্ভব হল ভেবে পেল না নিমাই। কার ইঙ্গিতে মানুষে মানুষে এই মিলন ঘটল? উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ,

মানুষের মধ্যে যেখানে বিপুল ব্যবধান সেখানে এরূপ এক সর্বালিঙ্গনকারী মহাযজ্ঞ করল কে? বিস্ময় মিশ্রিত এই সব জিজ্ঞাসায় তার ভেতরটা অস্থির হয়ে বারংবার মনে হতে লাগল, বিশ্বের যিনি নিয়ন্তা তিনি এই কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। তিনিই চালক। তার মধ্যে দিয়ে কেবল পালিত হচ্ছে। মুগ্ধ বিভোর নিমাই সেই বিরাটত্বকে বুকের গভীরে অনুভব করতে লাগল।

দূরে শিয়াল ডেকে উঠল। নিমাইর চমক ভাঙল।

রাত বোধ হয় এক প্রহর।

জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিল। ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল তার নাকে।

কিছুদূরে উচ্ছিষ্ট আহার্য ও এঁটো পাতা নিয়ে কুকুরে কুকুরে কাড়াকাড়ি, মারামারি এবং চিৎকারের শব্দ আসছে তখনও।

নিজেকে এখন নিমাইর বেশ হাল্কা এবং ভারমুক্ত লাগছিল। একটা খুশিমন নিয়ে জানলা দিয়ে বসন্তের উজ্জ্বল তারাভরা স্নিগ্ধ কালো আকাশ দেখছিল।

ঘরের ভেতর মিটমিট করে একটা সেজ জ্বলছিল। বাইরে অন্ধকার। আকাশ অন্ধকার। মানুষের যা কিছু সুন্দর অনুভূতি পাওয়া তাও এই অন্ধকারে পাওয়া। শিশির ধোয়া প্রথম বসন্তের অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু জোনাকির আলো স্পন্দিত হতে থাকে। এমনই হতে থাকবে সারা রাত।

নিমাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পুষ্প সজ্জিত পালঙ্কের এক কোণে লজ্জায় জড়সড় হয়ে বসে আছে নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। দুই চোখে আগ্রহের দীপ জ্বালিয়ে সে নিমাইকে দেখছে। তার চাহনিতে নীরব নিমন্ত্রণ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের উপর চোখ পড়ল নিমাইর। অমনি বুকের মধ্যে ভয় মিশ্রিত উত্তেজনার এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল। লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ল। ঘাড় নাড়ল নিমাই। মনে মনে বলল: আমার সমস্ত আমিকে তুমি কোনদিন পাবে না। যে আমি লক্ষ্মীর, যে আমি সকল মানুষের তাকে তুমি কোনদিন পাবে না বিষ্ণুপ্রিয়া। তা আমার দেয়ার ক্ষমতার বাইরে। এ ছাড়াও অনেক আমির টুকরো টুকরো সত্তা আমার মধ্যে আছে, সে সবও পাবেনা। যতটুকু নয়ন ভরে পাও ততটুকুই নাও। আর কিছু চেওনা। কথাগুলো নিমাই নিজেকে শুনিয়ে বলল।

বেশ কিছুক্ষণ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিষ্পাপ সরল স্বপ্নাতুর তুই চোখের উপর চোখ রেখে বলল : তোমার চোখ তুটি দীঘির পদ্মকলির মত সূর্যের দিকে যেন প্রার্থনায় মৌন হয়ে আছে। তোমার চাহনি যেন যুগান্তরের স্বপ্ন। মুখে স্নিগ্ধ আরাত্রিক পবিত্রতা। তোমাকে দেখে শ্রদ্ধা হয়। পূজার ভাব জাগে। দেবতার পূজার জন্যে তুমি নিবেদিত। তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও। তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।

বিষ্ণুপ্রিয়া একটু চমকে উঠেছিল। অধরে তার আধ ফোটা ফুলের মত হাসি। বলল : না, আমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়া। আমার হউক আরাধ্য শ্রী গৌরাঙ্গের চরণ।

নিমাইর বুকে মাদল বাজল দ্রিম, দ্রিম করে। তবু, একটা অদ্ভুত হাসি তার বুকের ভেতর থেকে উঠে এল ঐ সুখানুভূতির ভিতরেও। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। দৃঢ়স্বরে বলল : না, তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া কি যে বলবে ভেবে পেলনা। অবাক হয়ে চেয়ে রইল নিমাইর মুখের দিকে। তুটি চোখ তার তুটি পূর্ণ সরোবরের মত টলটল করতে লাগল।

নিজের ঘরের ভেজানো দরজার সামনে এসে বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়াল। ঘরে ঢুকতে কেমন অস্বস্তি আর ভয় করল তার। ভয়টা ভৌতিক নয়। সেরকম ভয়ের কোনও কারণ ঘটেনি। তবু, রাতে নিমাইর সঙ্গে ঘরে বাস করাটা তার কাছে কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই রোজকার দেখা নিমাইকে দেখবে। চোখ বোজা, চোখের পাতায় রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির নীল ছোপ, ঠোঁটশুকনো, চোখের চাউনি লক্ষ্যহীন, দৃষ্টি কেমন পাগল পাগল। আপন মনে ভাবতে ভাবতে কখনও মৃতু মৃতু হাসে, মাথা নাড়ে, একটু আধটু বিড় বিড় করে। পাড়া-পড়শীরা বলে নিমাইর তো মাথায় গোলমাল। বিকারগ্রস্ত লোক। কথাটা মনে হতে বুকের ভেতর বিত্যুৎ খেলে গেল। নিমাইর কৌতূহলহীন নির্বিকারত্ব তার মনের ভেতরে যা কিছু ক্রিয়া করছিল তা ভিতরে ভিতরে তাকে অশান্ত অস্থির করে রেখেছিল। একটা ভয়ধরা যন্ত্রণায় সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মাথার ভেতর এলোমেলো ভাবনা।

কতদিন আর বিয়ে হয়েছে? তবু, এর মধ্যেই সে অনেক কিছু জেনে

'ফেলেছে। নিমাইর নামে গাঁশুদ্ধ নয়, দেশ শুদ্ধ লোক বলে পাগল। লোক-গুলোকে বিষ্ণুপ্রিয়ার বোকা আর সরল মনে হয়। নিমাই তার চোখে অত্যন্ত আত্মসুখী, দুঃখবিলাসী পুরুষমানুষ। নিজস্ব ভাবনা, চিন্তা, খেয়াল, খুশিতে চলে। তবু মানুষটাকে অদ্ভুত লাগে তার। ভরা যৌবন তার ব্যক্তিত্বকে ধারাল ও বিশিষ্ট করে তুলেছিল। নবোদিত সূর্যের মত তার তারুণ্য, দীপ্তি, তেজ সারা শরীরে ঝকঝক করছে। অথচ এই বয়সে জীবনের সব খেলা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সংসার নিরাসক্ত এক বৈরাগী করে তুলেছে। সংসারে কোন কিছুতে তার মন নেই। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতিও মনোযোগ নেই। বয়ঃসন্ধি কিশোরী সে। শরীরে তার যৌবনের ঢল নেমেছে। ঋতুময়ী প্রকৃতির লাবণ্য, সৌন্দর্য, মাধুর্যে ভরা তার তনু-মন-প্রাণ। তবু তার অনাঘ্রাত। মিথুন কাকে বলে জানে না। পুরুষের শরীরের স্পর্শে তনুতে যে হর্ষ জাগে, শিহরণ ছড়ায়, উন্মাদনার সুখকর উল্লাস আনন্দ ও তৃপ্তি তার কিছুই পায়নি, এ সবই তার সমবয়সীদের কাছে শোনা গল্প; তার কল্পনা। পুরুষের যে আচরণ যুবতী রমণীকে মুগ্ধতার ওপাড়ে প্রত্যাশার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়, আশা জাগায়, তৃষ্ণা জাগিয়ে দেয় আকণ্ঠ—নিমাই তা কোনদিন পূর্ণ করেনি। তার কঠিন সংযম, নিরাবেগ, বিরাগ, বিতৃষ্ণা তার কিশোরী প্রাণে অধিকতর কষ্টে ও দুঃখে স্পন্দিত হয়। অভিমানের সাগর উঠলে উঠে। নারী হয়ে পুরুষকে জয় ও বশ করতে না পারার ব্যর্থতা, অক্ষমতার একটা আত্মগ্লানি তার মনকে ছুঁয়ে থাকে সর্বক্ষণ। নিমাইর মুখোমুখি হতে তাই তার নিদারুণ লজ্জা, ভয় ও সংকোচ।

বন্ধ দরজা হাত দিয়েও সে হাত সরিয়ে নিল। দেয়ালে শরীরটা ঠেস দিয়ে টান টান হয়ে দাঁড়াল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

ভিতর থেকে হঠাৎ দরজাটা একটু নড়ে উঠল! বিষ্ণুপ্রিয়া আতঙ্কিত চোখে দরজার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। অবোধ দৃষ্টি। নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে আসছে। দরজার ধারে দেয়ালে পিঠ দিয়ে টান-টান হয়ে দাঁড়াল।

নিমাই দরজা খুলে বেড়োল। আস্তে আস্তে চৌকাঠের বাইরে পা রাখল। কোনদিকে তাকাল না। নিশি পাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে সে নিঃশব্দে পায়ে চলে গেল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকের ভেতরটা একটু কেমন করছিল। কষ্টে তার বুক

টাটাতে লাগল। কয়েকটা মুহূর্ত ঠোঁট চেপে ধরে সে কান্নাটাকে দমন করল। কিন্তু আবেগ দমিত থাকল না। শব্দ করে কেঁদে উঠল। অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে পিছু ডাকল: শোন, শোন।

নিমাই যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার অনিন্দিত সুন্দর মুখে। ভারী অপরূপ দেখাল তাকে। সাধকের তদগত দৃষ্টি তার দুই চোখে কেমন ব্যথাতুর আর স্বপ্নাচ্ছন্ন।

বিষ্ণুপ্রিয়া একেবারে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। কিন্তু উচ্চতায় নিমাইর বুকের কাছে তার মাথা। ঘাড় উঁচু করে অশ্রু প্লাবিত স্বপ্নমদির চোখে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইর দিকে নিস্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। কেমন একটা উদভ্রান্ত উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছিল। বারবার দুঃখে রাগে শিহরিত হল সর্বাঙ্গ। এ রকম তার আগে কখনও হয় নি। এমন কি ফুলশয্যা রাতেও নয়। অমোঘ হতাশার মধ্যে ডুবে গিয়ে প্রমত্ত আবেগে নিমাইর গলা জড়িয়ে ধরল পঞ্চদশী বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাইর সতর্ক সাবধান হওয়ার আগেই বিষ্ণুপ্রিয়া ঠোঁট দুটি অকস্মাৎ চেপে ধরেছিল তার ঠোঁটে। এবং কয়েকটা মুহূর্ত সে নিমাইর বুকের ধক ধক শব্দ আওয়াজ শুনল নিজের শরীরের অভ্যন্তরে।

নিমাইর পাথরের মূর্তির মত স্থির। বিষ্ণুপ্রিয়া তার শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রইল। কিন্তু নিমাইর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। প্রতিক্রিয়া যা ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ের অভ্যন্তরে।

তীব্র অপমানে তার বুকের ভেতর জ্বালা করতে লাগল। কানের দুপাশ রি, রি করছিল। লজ্জায় অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে তার কান্না পেল। প্রবল বিতৃষ্ণায়, দুঃখে সে নিমাইর বুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। অনাদর অপমান তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। অপূর্ণতার যন্ত্রণায় পরাভবের বেদনায় তার বুক হাহাকার করে উঠল। সত্তার গভীরে ঝংকারে বাজল। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল: বলল: আমি কি করেছি? আমার শরীরটাকে যদি ঘেন্না কর তা-হলে বিয়ে করলে কেন? আমি'ত তোমার কোন ক্ষতি করিনি, তবে এ সর্বনাশ কেন করলে? কে চেয়েছিল তোমার মত নামী দামী লোকের অনুগ্রহ।

নিমাইর একটু বিব্রত হয়। একটু অপ্রতিভ হাসে। তাতেই বিষ্ণুপ্রিয়ার কোষে কোষে জ্বালা ধরে গেল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল: আমাকে কষ্ট দিয়ে কি

তোমার সুখ হয় ?

একটা দীর্ঘশ্বাসকে চাপা দিল নিমাই। ভূরু কুঁচকে বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল : তোমাকে আমি কষ্ট দেবার কে ? কষ্ট আমিও কি কম ভোগ করছি ? তুমি কি বিশ্বাস কর তোমাকে কষ্ট দেয়ার আমার খুব সুখ ?

দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়ার। বলল : সেটাত তুমি জানবে ; আমাকে জিগ্যেস করছ কেন ?

বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে নিমাই ভাল করে চাইতে পারছিল না। খারাপ লাগছিল ভীষণ। তীব্র বিরাগের সঙ্গে বলল : তুমি সুন্দরী। কিন্তু আমি তোমাকে পছন্দ করে আনিনি। সুতরাং আমার বেশি দায়দায়িত্ব নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে ফেলল। বলল : তবে এরকম বিয়ে করে আমার জীবনটা নষ্ট করলে কেন ? আমি'ত কোন অপরাধ করিনি। তবে কার দোষে আমাকে সারা জীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ? কেন ?

ঠিক কথা। আমার মা চেয়েছিল সংসার দাঁড়ে বসানোর জন্যে তোমার মত এক সুন্দরী মেয়েকে। পাখীকে খাঁচায় ভরলে সে কি তার উড়ার আকাশকে ভুলে যায় ?

আমার মাথা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি কি করব ? বিষ্ণুপ্রিয়ার গলাটা ভারী শোনাল। ঠোঁট কামড়ে ধরে সে কান্নাটা সংযত করল। বলল : বাড়ীর পোষা বিড়াল কুকুর থাকলেও তার জন্যে মায়া হয়। সেই সামান্য করুণাটুকুও কি আমি পেতে পারি না ?

নিমাইর ভিতরে প্রতিক্রিয়াটা শুরু হল এখন, এই মুহূর্তে। নিজের ভিতর একটা অস্থিরতা টের পাচ্ছিল সে। ভারী অবশ লাগছিল শরীর। বিবেকের ভেতর একটা দাহ মোমের মত গলে গলে পড়ছিল। বলল : ঈশ্বর যাই করেন তার পেছনে একটা যুক্তি নিশ্চয়ই থাকে। সেই যুক্তি খোলা মন নিয়ে আমরা বুঝতে পারি না। সমস্ত রকম অনুভূতির ভেতর দিয়ে এই যে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন এর পেছনে কোন গভীর উদ্দেশ্য হয়ত আছে। তাঁকে বা তাঁর স্বরূপকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই বলেই হয়ত মনে হয় ঈশ্বর নিষ্ঠুর।

স্তব্ধ বারান্দায় বিষ্ণুপ্রিয়ার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠল নিমাইর। যান্ত্রিকভাবে সে বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে

বলল ঃ কেঁদো না কৃষ্ণপ্রিয়া। ঈশ্বরের পূজার নৈবেদ্য তুমি। বৃহৎ একটি কাজের জন্যে তুমি আমি নিবেদিত। এক কঠিন ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে তোমাকে আমাকে যেতে হবে। আমার সহ ধর্মিণী তুমি। দু'জনের সমান সংযম আর কঠিন ত্যাগে যে আমাদের এগোতে হবে। মায়া মোহ লোভ জয় করতে হবে। নইলে ব্রত নষ্ট হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া একটু শান্ত হল। চোখের কোণ তার শুষ্ক। নিমাইর কথা সে শুনছিল না। তার বুকের গভীরে ঝংকারে বাজছিল, সে একজন অতি সাধারণ মেয়ে। স্বামী সংসারের সুখই তার প্রার্থনা। সে চায় স্বামীর, সোহাগ, মমতা, ভালবাসা। কিন্তু এ সব কিছুই বলতে পারল না। অতি কষ্টে সম্মোহিতের মত উচ্চারণ করল ঃ আমাকে একটুও ভালবাস না ভালবাসলে দুঃখ দিতে না।

নিমাই একটু চমকে উঠে বলল ঃ আমার জীবনটা কম ঘটনাবহুল নয়। আমার জীবনে সব কিছু নির্বিঘ্ন করে রাখেনি অদৃষ্ট দেবতা। খুব ধীরে সুস্থে আমার ভিতরে এক ঘুমন্ত আমির ঘুম ভাঙাতে অনেক কিছুর দরকার হয়েছে। তেমনি তুমিও এক ইন্ধন। তোমার সঙ্গে, বিয়ে হল বলেই জানা হল. মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত নিঃস্ব, কত দুর্বল, অথচ কি বিরাট, ব্যাপক, ভয়ানক তার বেঁচে থাকার দাবী। মানুষ এমন ব্যাকুলভাবে চায় বলেই তার পাওয়ার তৃপ্তি নেই। এতো দিতে চায় আর নিতে চায় বলেই দিয়ে নিতে পারে না, নিয়ে পারে না দিতে। ভাবতে অবাক লাগে, নবদ্বীপের সব মানুষ মিলে আমার বিয়ের প্রীতিভোজের সমাবেশে যে অভূতপূর্ব সম্মান ও মর্যাদা দিল তার যোগ্য যদি নিজেকে না করে তুলতে পারি তা-হলে তাদের অপমান হবে। ওসব তুমি বুঝবে না। জাতপাতের জন্যে অনেককাল ধরে অনেক দাম দিতে হচ্ছে সকলকে। এজন্য হারাতে হচ্ছে অনেক। তবু চৈতন্যোদয় হয়নি। আমাদের বিয়ের সমাবেশে তার প্রথম উন্মেষ। তোমার সঙ্গে বিয়েটা হল বলেইত এতবড় একটা বিজয়ে সৌভাগ্য আমার হল।

বিষ্ণুপ্রিয়া ফ্যাল ফ্যাল করে বোকার মত তার দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু তার মুখের অভিব্যক্তিতে বিস্ময়ের পরিবর্তে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্তি, নিমাইর দৃষ্টি এড়াল না। একটু অপ্রতিভ হেসে বলল ঃ তুমি ঘরে যাও। আমি মা'র ঘরে যাব।

নিমাইর কথা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া হাঁ, না কিছুই করল না। নীরবে প্রস্থান করল।

অদ্বৈতাচার্য খুব বিস্মিত হয়ে নিমাইর দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল: তোমার গয়া যাওয়া এখনই জরুরী হল বিশ্বম্ভর?

নিমাই গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। মধুর স্বরে বলল: মায়ের অনুমতি পেয়েছি। বেশ বুঝতে পারছি, একটা বড় কিছু ঘটবে আমার জীবনে। হয়ত খুব শীঘ্রী। এখন না হলে বোধ হয়, আর, পিতার শেষ ইচ্ছা রক্ষার সময় পাব না।

অদ্বৈতাচার্য একটু সন্ধানী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল বিশ্বম্ভরকে। মানুষের মুখ দেখে লোকচরিত্র নিরূপণের অভিজ্ঞতা তার নেই। বিশ্বম্ভরের অপাপবিদ্ধ সুন্দর মুখশ্রীর দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, বুক ঠাণ্ডা হয়। রোজকার দেখা বিশ্বম্ভরকে দেখে আজ তার কেমন একটা ভয় হল। আস্তে আস্তে বলল: বিশ্বম্ভর তুমি'ত সব জান। তোমাকে নতুন করে কিছু শোনানো মানে হয়না। তবু মূল সমস্যাটা কি এবং কেমন তা তোমার জানা দরকার। এদেশের মানুষ বড় নির্বিকার। নিজস্ব জগতেই তাদের বাস। গণ্ডীর বাইরে জীবন সম্পর্কে তাদের কোন কৌতূহল নেই। চেনা মহলের বাইরে তাদের নিয়ে যাওয়ার মানুষ নেই। তোমার আকর্ষণে তারা খোপের মায়া কেটে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভয় দূর হয়েছে। নিজের অস্তিত্ব তারা অন্ততঃ হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে জানান দিতে পেরেছে, এই সুখে উল্লাসে তারা কীর্তনে মেতে উঠেছে। ধর্মপ্রাণ মানুষ হরিভক্তিতে কতখানি গদগদ জানিনা, অন্ততঃ তোমার মত একজন মানুষের সঙ্গে তারা আছে এটুকুই তাদের গর্ব এবং বাস্তব প্রাপ্তি। তুমি চলে গেলে সেই আকর্ষণ তাদের থাকবেনা।

বিশ্বম্ভর অবাক হয়ে বলল: সে কি! আমি-তো উল্টো ভাবছিলাম।

অদ্বৈতাচার্য বলল: না। দেশের বিভিন্নস্থান থেকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবেরা এসেছেন। এর আগেও তাঁরা বহুবার নবদ্বীপে যাওয়া আসা করেছেন। কিন্তু আজকের মন নিয়ে আগে আসেনি কখনও। তুমি তাঁদের বিস্ময়। তোমার আকর্ষণে তাঁরা সমবেত হয়েছেন। তুমিই তাদের পথ ও প্রেরণা। তুমিই তাঁদের নেতা। তোমার অনুপস্থিতিতে এঁরা স্ব-স্ব মর্যাদার গৌরবে, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এঁদের সমবেত করা, সংঘবদ্ধ করা শক্ত কাজ।

এঁদের দম্ভ অহংকারের পাত্র এখনও শূন্য হয়নি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনরকম সংস্রব এঁদের পছন্দ নয়। এঁরা জনগণকে বাদ দিয়ে চলতে চায়। কিন্তু জনগণই অগণিত। বৈষ্ণবের প্রাণ, বৈষ্ণবের শক্তি। জনগণকে বাদ দিলে বৈষ্ণবধর্মের গণতান্ত্রিক আদর্শ থাকেনা। হরিনাম সংকীর্তনের উদ্দেশ্য'ত শুধু নামকীর্তন নয়। ঈশ্বরের নামে ধর্মপ্রাণ মানুষকে একত্রিত করা, উদ্দীপিত করা, সংঘবদ্ধ করা, সংঘচেতনায় এবং সর্বশক্তিতে আস্থাবান করা। তাদের নির্ভর করা, মনকে শক্ত ও সবল করা। কাউকে প্ররোচিত না করে শুধু হরিনাম করে শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের যে নিঃশব্দ ঢেউটি সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিতে চেয়েছ তুমি, তার সকল কর্মসূচী তোমার অনুপস্থিতিতে গ্রামে গঞ্জে নগরে কতখানি পৌঁছবে আমার যথেষ্ট সংশয় হচ্ছে। এখন সবদিক ভেবে তোমার কর্তব্য স্থির কর।

নিমাই নীরব। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেছিল। তাকে ভীষণ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে মৃদু স্বরে বলল : আচার্য, আপনি সংশয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। রাজনীতির আক্রমণে আর অত্যাচারে শুধু নবদ্বীপ নয়, গোটা দেশকে দীন দুর্বল করে তুলেছে। এ থেকে সকল বঙ্গবাসী পরিত্রাণ চায়। স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষায় এক মহৎ আকাংখায় সকলে মিলিত হয়েছে নবদ্বীপে। হরিনাম শুধু তাদের এগিয়ে যাওয়ার গান। সশস্ত্র রাজশক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষও যে অহিংস জেহাদ ঘোষণা করতে পারে আমি শুধু তার পথটাকে চিনিয়ে দিয়েছি। অভিযান এবার নিজেই নিজের পথ করে নেবে। আমি নিমিত্ত।

অদ্বৈতাচার্যের দুই চোখে যুগপৎ বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা। বলল : বিশ্বম্ভর তুমি আমি চিরকাল থাকব না। কিন্তু দেশটা থাকবে, হিন্দুধর্ম থাকবে। হিন্দুদের একটা ভবিষ্যৎ আছে, তাকে নিরাপদে বাড়তে হবে, এগোতে হবে। তুমি এত পরিশ্রমে যা করেছো তা হিন্দুধর্মের ভবিষ্যতের জন্যে। এত সহজে তুমি তাকে ব্যর্থ হতে দিওনা। এই বৃদ্ধ বয়সে আমি তা সইতে পারবনা।

নিমাই একটু হেসে বলল : আপনার মত আমিও চিন্তা করেছি। সামনে বিরাট কর্মের আহ্বান। তার আগে আমাদের সকলকে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। এ আমার অনুপস্থিতি নয়, অনুশাসনের কাল। আমি না থাকলেই জনসাধারণের নিজের কাজের যোগ্যতা প্রমাণ করা সহজ হবে। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবেরা জনসেবা করে দেশের সংকট ও সমস্যার বাস্তব অবস্থাকে

জানবে। জনসাধারণের কাছে তার যোগ্যতা প্রমাণ দেবে। ভাবাবেগ এবং আদর্শবাদে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে নয়, যথার্থ জনসেবা করে, বাস্তব নেতৃত্ব করার কৃতিত্বে তারা মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করুন। জনস্বার্থের সঙ্গে, দেশের সর্বব্যাপী আকাংখার সঙ্গে প্রত্যেকে নিজের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শ মিলিয়ে নিক। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র নিজ গড়ে নিক। যেমন এক দিন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণ গড়েছিলেন। বৈষ্ণব নেতৃত্ব একেবারে দেশের জনগণের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসুক। যদি মাটি থেকে না উঠে আসে তা-হলে বৃহৎ গণ-আন্দোলনের কখনও শরীক হতে পারবে না। নিজের অর্জিত নেতৃত্ব না হলে জনগণ তাকে মানবে কেন? দেশের শাসকই-বা তাকে ভয় পাবে কেন? প্রত্যেক বৈষ্ণব নেতা যদি কর্মশক্তিতে ও সেবার নেতৃত্বের সোপান বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে পারে তবেই সে সার্থক হবে। আমার অনুপস্থিতিতে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

অদ্বৈতাচার্যের সংশয় তবু ঘুচল না। মনের মধ্যে একটা ব্যথা জমে বসল। একটা অস্বস্তি নিয়ে বলল: আমি এত বুঝি না। তোমার হাতে যা শিব হতে পারে অন্যের হাতে তা এক ভয়ানক অজগরও হতে পারে। ইতিহাস বিচিত্র পন্থায় মানুষের উপর প্রতিশোধ নেয় এটা মনে রেখ।

এ রকম আশা পোষণ করার কোন বাস্তব কারণ নেই।

আছে বিশ্বম্ভর। রাজধর্মের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে। রাজা চুপ করে বসে থাকবে না। জিতবার জন্যে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কারকে অস্ত্রের মত ব্যবহার করবে।

নিমাই স্তম্ভিত। যুগপৎ চিন্তিত ও বিমর্ষ। ললাট দেশ ও ভ্রুক যুগল কুঞ্চিত হল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নাভিমূল কাঁপিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল: গুরুতর প্রশ্ন। তবু উপায় নেই। এও এক কঠিন পরীক্ষা। একটু থেমে বলল: আপনি'ত রইলেন।

॥ আট ॥

আশ্বিন মাস।

মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য এবং আরো কয়েকজন পড়ুয়া ছাত্র নিয়ে নিমাই পদব্রজে গয়াধামে যাত্রা করল।

হাঁটা পথে বহু নগর, গ্রাম, জনপদের ভেতর দিয়ে তারা যেতে লাগল। বহু মানুষের গৃহে আতিথ্য নিল। স্বদেশের বাইরে এক বৃহত্তর মানব সমাজকে নিমাই নতুন চোখে দেখল। সব হিন্দুই অভিশপ্ত সমাজে জন্মেছে। এই অভিশাপ থেকে কারো মন মুক্ত নয়। গোঁড়ামি, সংস্কার, বিশ্বাসই মানুষের জীবনে কারাগার। এখানে তারা চিরবন্দী। তাদের আকাশ এবং অনুভূতির বৃত্ত ও ছোট্ট হয়ে গেছে। সব মানুষের কেমন একটা নিরুপায় অসহায় অবস্থা। এই অবস্থাটাই তাদের জীবনীশক্তির লক্ষণ। প্রত্যেকের নিজের নিজের মনে এর প্রতি এক সুগভীর আকর্ষণ আছে। সুতরাং এ থেকে মানুষকে মুক্ত করাই হবে সবচেয়ে সামাজিক বন্ধন এবং প্রতিবন্ধক। মানসিকতার এই কারাগারের রুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে মানুষকে। এ জন্যেই বোধ হয় মানুষের বুকে নিজের প্রতি যতখানি মমতা, ভালবাসা এবং গর্ব থাকে ঠিক ততখানিই থাকে নিজের প্রতি তার নিজের ঘৃণা।

এ সব চিন্তা করে নিমাইর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে সাতদিন হল।

দূর থেকে মন্দার পর্বতের মাথায় মধুসূদন মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। ঐ দিকে মুখ করে নিমাই সঙ্গীদের সঙ্গে এগোতে লাগল। গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে মধ্যাহ্নের সূর্যের দিকে চেয়ে তারা দিক ঠিক করে হাঁটছিল।

পাহাড়ী পথ ধরেই গয়ার দিকে চলল। পায়ে হাঁটা পথের দু'ধারে বড় বড় গাছের গভীর ঘন বন। দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে আছে নিচেটা। তাদের পদশব্দে সচকিত হয়ে কয়েকটা খরগোশ, দু একটা ছোট হরিণ শিশু ভয় পেয়ে ছুটে পালাল। তাদের চকিত পলায়নে পাখীরা চমকে ডেকে

উঠে উড়ে গেল। আরো কিছু উপরে উঠতে পাহাড়ের মাথায় জ্বলন্ত গোলার মত মধ্যাহ্নের সূর্য দেখল। সমস্ত পাহাড়টা রোদে ঝলমল করছে।

ময়ুরের কর্কশ ডাকে হঠাৎ চমকে উঠল পাহাড়ের নিস্তব্ধতা। খুব কাছেই একটা কিছু ঝাপ্টানোর শব্দ হচ্ছিল। ময়ুরটাই একটা সাপ ধরে ধারাল চঞ্চু দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে ক্ষতবিক্ষত করল। আর সাপটার দেহ অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে লাগল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নিমাই। এ রকম দৃশ্য কখনও দেখেনি আগে। অনেকক্ষণ ধরে দৃশ্যটা দেখতে লাগল! বিবর্ণ বিমর্ষতায় তার মুখখানা আঁধার হল। দু'চোখের কোল বেয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল। অবরুদ্ধ কান্নার আবেগ দমন করতে উপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। উদ্‌ভ্রান্ত আর শূন্য দৃষ্টিতে দূরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে পথ হাঁটতে লাগল।

প্রকৃতির অপরূপ শোভা স্নিগ্ধ নম্রতা হরেক রকম ফুলের মন ভোলানো গন্ধ আর সৌন্দর্যে তার দৃষ্টি কেড়ে নিল। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গেল তার সমস্ত চেতনা।

ময়ূরের অপরূপ অঙ্গকান্তির মধ্যে সে শ্রীকৃষ্ণকে দেখল। মানুষের প্রেমের দেবতা, অমৃত প্রেমময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণও একদিন অত্যন্ত নীচ, বেইমান, মানুষের স্বার্থবিঘ্নকারী, দুষ্ট অভিসন্ধিপরায়ণ, কুচক্রী এবং এক বিদ্রোহের অনুচর কালীয়নাগকে অনুরূপ লাঞ্ছনা পীড়ন করে শিক্ষা দিয়েছিল। দারুণ যন্ত্রণা পেয়ে পাষণ্ড কালীয়নাগ বুঝেছিল দেশের বিরুদ্ধাচরণ ও জনগণের ক্ষতি করার শাস্তি কী ভীষণ।

মাথার ভেতরটা নিমাইর কেমন করে উঠল। আর মুহূর্তে অসংলগ্ন কেমন বিশৃংখল হয়ে গেল তার চেতনা। মহৎ একটা আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে সে ঝড়ের বেগে মন্দিরের দিকে এগোতে লাগল।

আকাশ গভীর নীল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। হেমন্তের কবোষ্ণ মিষ্টি রোদে পাহাড়ী রাস্তা ভাঙতে খুব কষ্ট হচ্ছিল না। মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল নিমাইর নিরাবরণ অঙ্গে ও মুখে।

মন্দির যত নিকটবর্ত্তী হল ততই এক অপার্থিব সুখেও আনন্দে তার চিত্ত বিহ্বল হল। আশ্চর্য একটা প্রশান্তিতে ক্রমে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের বিশাল নীল আকাশ কিংবা পাহাড়ী ঐশ্বর্য কিছুই দেখছিল না। মধুসূদন মন্দিরের বিগ্রহের এক কাল্পনিক মূর্তি তার চোখের তারায় জ্বলজ্বল

করছিল। তার কল্পিত মধুসূদনের কণ্ঠে নেই মুক্তার মালা, বাহুতে নেই স্বর্ণাভরণ। একেবারে নিরাভরণ, নিরাবরণ। কেবল হাতে মোহন মুরলী। মনে হল, তার অন্তরের ভেতরে, সমস্ত সত্তার ভেতরে দূরাগত বংশীর স্নিগ্ধ মধুর ধ্বনির মত বাজতে লাগল। দিগন্তবিসারী আকাশের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল তার সুর। আর, কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর মধু-স্রাবী কণ্ঠের এক বাণী শুনতে পেল নিমাই—তুমি মধুসূদনের কৃপা পাবে, তার করুণায় ধন্য হবে।

এ দৈববাণী, না তার গভীর অভ্যন্তরের কথা—বিবাদ করার মত মনের অবস্থা ছিলনা নিমাইর। সে তখন বাহ্যজ্ঞানহীন। প্রেমবিকারে উন্মাদ। ভেতরটা তার ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে দৌড়ে গেল মন্দির প্রাঙ্গণে। তার এই আকস্মিক ভাবান্তর আচার্য চন্দ্রশেখর এবং তার পড়ুয়াদের খুব অবাক করল। তারাও নিমাইর পিছন পিছন দৌড়তে লাগল।

পাথরে বাঁধানো মন্দির চত্বর রোদে তেতে উঠেছে ভীষণ। পা রাখাই দায় হল। নিমাইর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মহৎ একটা আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে সে ঝড়ের বেগে মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকল।

মন্দিরের অভ্যন্তরে তখন ভোগ ও আরতি চলছিল। পুরোহিত পাণ্ডাদের কোন বাধা নিষেধ না মেনেই সে দ্বার ঠেলে মন্দিরে ঢুকল।

আলো বাতাস শূন্য গবাক্ষহীন সেই জমাট আচ্ছন্ন ঘরে অনেকগুলি দীপাবলির আলোয় মধুসূদনের বংশীবদন মূর্তি অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝলমল করতে লাগল। শ্বেতপাথরের মেঝেতে অনেকগুলি পাত্রে বিবিধ ভোগ,পূজার বিবিধ উপকরণ পাশাপাশি সাজানো। কক্ষ জুড়ে সুগন্ধ অগুরুর সুবাস।

বিগ্রহের বেদীর সম্মুখে নিমাই থমকে দাঁড়াল। তীব্র একটা আবেগে তার হৃদয়টা যেন ঐ বিগ্রহের পদতলে লুটিয়ে পড়তে চাইল। কি এক গভীর সুখকর আবেশে তার দুই চোখ বোজা। পূজারী ভক্তের মত বিনম্র-ভঙ্গীতে দুইহাত জোর করে দাঁড়াল। বিগ্রহকে অনন্ত মহিমার কাছে নিবেদিত এক সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটে উঠল তার প্রার্থনায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর সংজ্ঞাহীন হয়ে নিমাই ঠাকুরের নিবেদিত ভোগ ও নৈবেদ্যের পাশে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তার দক্ষিণ হস্ত বেদী স্পর্শ করল।

ততক্ষণে পুরোহিত, প্রহরী, পাণ্ডারা হৈ-হৈ করে পড়ল তার উপর।

তাদের চিৎকার, চেঁচামেচি, তর্জন-গর্জন, শাসনে মন্দির কক্ষ গমগম করতে লাগল।

কতদিন ধরে কত পথ হাঁটল নিমাই এবং তার সঙ্গীরা। কত কি দেখল এবং জানল। তবু অভিজ্ঞতার শেষ হয়না। মানুষ নিজেই যেন একটি গ্রন্থ। এর প্রতি পৃষ্ঠায় বিস্ময় আর চমক।

মানুষ গণ্ডীবদ্ধ জীব। গণ্ডীর বাইরে যাওয়া তার কাছে খুবই কষ্টকর। যেতে হলে তার একটা নিজস্ব পরিচয় তৈরী করে নিতে হয়। তার জন্যে অনেক দাম দিতে হয়। খুব কম মানুষ সে মূল্য দিতে পারে। একার চেষ্টায় ভাঙতে পারেনা গণ্ডীর অনেক কিছুই। ফলে, যে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানেই থাকে!

আসলে হিন্দুর সমাজটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত। কোন দ্বীপের সঙ্গে কোন দ্বীপের যোগাযোগ নেই! যার যার জীবন, তার তার; এমন কি নিজের ধর্মের, জাতের, বর্ণের পরিচয়-এসব কিছুই। একেবারে নিজের মত করে বাঁচা। এটা কোন বাঁচা নয়। শুধু নিজেকে জীবিত রাখার চেষ্টা। এখানে মানুষের হৃদয়টা দ্বীপের মতই চারদিক দিয়ে বেষ্টিত। এই অভিশাপগ্রস্ত দ্বীপে নিজেকেই অভিশাপগ্রস্ত মনে হয় নিমাইর।

কিন্তু প্রকৃতির কোন গণ্ডী নেই। অবারিত পৃথিবীর সবটা জুড়ে সবুজ বননী আর সবুজ চিকন ঘাসে ভরা। আর উন্মুক্ত বিশাল আকাশের সবটাই নীলিমায় নীল। কোথাও কোন কার্পণ্য নেই। কেবল মানুষের সমাজে যত পার্থক্য, বৈষম্য, ভেদাভেদ। এক জাত, এক ধর্ম, এক বর্ণের মানুষ হয়েও তারা আলাদা। মানুষ যেন বিধাতার গরলে অমৃত তৈরী এক জীব। তার প্রাণে প্রেমের সুধা যেমন আছে, তেমনি ঘৃণার বিষও আছে। যে প্রেমে পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠতে পারত, সে প্রেমে কৃপণ হয়ে পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে তুলল কেন? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পায় না নিমাই। কেমন একটা হতাশা জমে বুকের ভেতর। তারই নীরব হৃদয় ভাঙা হাহাকার তাকে একটু একটু করে বদলে দেয়। তার সংকল্প দুর্বল হয়।

মানুষের যুগ যুগান্তরের সামাজিক সংস্কার, বিশ্বাস ভেঙে ফেলা খুবই শক্ত কাজ। এই সংকীর্ণতা থেকে এবং অশিক্ষা থেকে সুস্থ জীবনে প্রত্যাবর্তন করা অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার মত বড়ই যন্ত্রণার। ব্যর্থতা, হতাশা,

নিমাইর মস্তিষ্কের কোষে কোষে এখন ডানা নাড়ছে। সত্য যা তা এমনি অমোঘভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। নিজের উপর তাই নিয়ন্ত্রণ হারাল নিমাই। নিজের অজান্তে সে এক অন্য জগতের মানুষ হয়ে উঠল।

ঝর ঝর বয়ে যাচ্ছিল পুনা নদী। নদীর ধার দিয়েই তারা যাচ্ছিল। নদী স্রোতের একটানা কল কল শব্দে আনমনা হয়েছিল নিমাই। নিজের অস্তিত্ব, নদীর অস্তিত্ব, সূর্যোজ্জ্বল বনের অস্তিত্ব, সবই তার চোখের সামনে থেকে চেতনার মধ্যে থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল। মানুষের মুক্তি চাইতে সে এক অদৃশ্য বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল। মানুষের নিষ্ঠুরতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থ-পরতা প্রকৃতির উদারতা, ব্যাপ্তি, বিশালতা, সর্বব্যাপী সমতা তাকে এক অদৃশ্য শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করল। যে শক্তি নিমাই অন্তরে অনুভব করে,, দৃপ্ত সূর্যালোকে, শান্ত চন্দ্রলোকে, পাহাড়ে, বনে, নদীতে, মনের চোখে প্রত্যক্ষ করে বারবার বিস্মিত হয়েছে, যে শক্তির সৌন্দর্য ও মাধুর্যে এই পৃথিবী আরো সুন্দর অপরূপ হয়ে উঠেছে ; তার করুণায় নিমাই ধন্য হতে চায়। গভীর আধ্যাত্মিক সুখের এক ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাব তাকে উদাস করে দেয়।

নিমাইর পরিবর্তন আকস্মিক এবং সুদূরপ্রসারী। তাকে দেখলে দুশ্চিন্তা হয় চন্দ্রশেখরের। ভয়ও পায়! তার ভিতরে এক অফুরন্ত কৌতুহলই তাকে ভয়ের মুখে এক ধরণের অফুরন্ত সাহস দেয়। পথে যেতে যেতে বলল : নিমাই, তুমি কয়দিনে ভীষণ বদলে গেছ। কেন গেছ জানি না!

প্রথমে নিমাই একটু চমকে উঠল। মগ্নতা ভাঙতে কয়েকটা মুহূর্ত সময় নিল, তারপরে হাসল। অনাবিল প্রসন্নতার হাসি। বলল : বদলানো স্বাভাবিক জীবনের ধর্ম। না বদলানো মানে থেমে যাওয়া। নদী বহতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে তার গতিপথ বদলায়।

চন্দ্রশেখর থমথমে গলায় বলল : তুমি কত বদলে গেছ, তবু হেঁয়ালী ছাড়নি। তোমার মত হেঁয়ালী করে কথা বলতে জানি না।

নিমাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। চন্দ্রশেখরের দিকে তাকিয়ে বলল : ভবিষ্যতের কথা ভেবে আজকের মনের খুশি নষ্ট করার তো কোন মানে নেই।

চন্দ্রশেখর গাঢ় স্বরে বলল : তুমি নিজের কষ্ট কোনদিন জানাও নি কাউকে? কিন্তু তোমার সঙ্গে ছায়ার মত থাকতে থাকতে এই কয়দিনে তোমার কোথায় কোন ব্যথা লেগেছে, কতটা লেগেছে, এ সব টের পেয়েছি।

নিমাই চন্দ্রশেখরের দিকে এক গভীর কৃতজ্ঞতায় চেয়ে রইল। আস্তে বলল: জীবনের কটা কথাই বা রাখা যায়? মিথ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকে বড় বেশি ঢেকে রাখে। তাই, সাধারণ মানুষের কাছে মিথ্যেটাই একটা জীবন। এই মিথ্যেটাই বোধ হয় একটা খাঁটি মানুষের জীবন ধারাকে বদলে দিল। মেশোমশাই, যে মানুষের কাছে মানুষের মুক্তি ছিল সবচেয়ে জরুরী, এবং গণ্ডীর বাইরে তাকে আনার মহান সংকল্প ছিল তার কাছে এই ঔদাসীন্যের ব্যাপারটা যে কতখানি তা হয়ত তুমি বুঝবে না। কতখানি যে আমার হারাল, তা আমি কাউকেই বোঝাতে পারব না।

নিমাইর কথাটা শুনে চন্দ্রশেখরের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

একদল বুনো পাখি কোয়াক কোয়াক করে উড়ে গেল পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে।

চন্দ্রশেখর গম্ভীর বিস্ময়ে বিষণ্ণ গলায় বলল: নিমাই, মানুষের মত মানুষকে হারানো অত সোজা নয়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর একজন মানুষকে হয়ত ভেঙে ফেলা যায়, নষ্ট করে দেয়া যায়, কিন্তু কখনই তাকে হারানো যায় না। অন্ততঃ আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

পুণা ও ফল্গু নদীর সঙ্গমে পৌঁছল।

দ্বিপ্রহর।

হেমন্তের ঝিমধরা নেশারু রোদে চারদিকটা কেমন নিঝুম। নীল আকাশে ছিন্ন সাদা মেঘের সমারোহ। সঙ্গীহীন, একক। বহুদূর পর্যন্ত অবারিত মুক্ত নদী আর দিগন্তলীন পৃথিবী। পূর্বদিক থেকে পাল তোলা নৌকো মন্থর গতিতে চলেছে পশ্চিম দিকে। নিমাই উদাস নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হেমন্তের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ নীল আকাশের বুক থেকে একঝাঁক পাখী এসে অন্তঃসলিলা ফল্গুর বিশাল চরে এসে বসল। ঘুরে ঘুরে লেজ দুলিয়ে মনের সুখে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল। এ-ওর দিকে ধেয়ে যায় আনন্দে, কিংবা সুখের উল্লাসে। মাটি ছুঁয়ে একটু উড়ে গিয়ে আবার বসে দলের মধ্যে। কিচির মিচির শব্দ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী প্রাণী এরা। অবাধ, মুক্ত, স্বাধীন। কোন মায়া নেই, বন্ধন নেই, বাধা নেই। কিন্তু এক আশ্চর্য সৌহার্দ্দ সূত্রে বাঁধা। নিমাইর খুব ইচ্ছে হল, পাখী হয়ে ডানায় ধূলোর গন্ধ মেখে উড়ে যেতে। মানুষ হয়ে জন্মানো অনেক জ্বালা। পরের জন্মে সে পাখী হয়ে জন্মাবে। আর রোজ ভোরে সূর্যোদয়ের আগে পাহাড়চূড়ার ওপার থেকে

আলোর বার্তা আনবে। অন্ধকারের মধ্যেও যা একটি আলোর বিন্দুর মত জ্বলবে, স্পন্দিত হবে। কথাগুলো মনে হতে বেশ হাল্কা আর ভারমুক্ত লাগে নিজেকে।

স্পন্দিত বুক ও উদ্দীপিত এক আনন্দ নিয়ে নিমাই নদীর শীতল জলে অবগাহন করল। কয়েকদিন ধরে পথশ্রান্তির গ্লানি তাতে অবসান হল। মনটা নির্মল, পবিত্র এবং প্রফুল্ল বোধ হল।

সদলবলে গয়াধামে পৌঁছতে নিমাইর দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হল। গয়াধামে পদার্পণ করে নিমাই গয়াধামের ধূলি মাথায় নিল, গায়ে মাখল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দণ্ডী কাটতে কাটতে মন্দিরদ্বারে উপনীত হল।

পরদিন একে একে ষোড়শ গয়াকৃত্য সমাপন করে ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন ও তর্পণাদি করল। সবশেষে শ্রীবিষ্ণু পাদদর্শন করতে চক্রবেড়ের ভেতর প্রবেশ করল। সেখানে নানা দেশের মানুষ বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করছে। কেউ পিণ্ডদান করছে, কেউ বা পাণ্ডাদের মুখে শ্রী পাদপদ্মের মাহাত্ম্য শুনছে। এইসব মানুষ কোন জাতের, কোন বর্ণের, কোন দেশের কোন ধর্মমতের এসব দেখছে না কেউ? এরা সকলে মোক্ষ পিপাসু মানুষ। এরা হিন্দু। এদের গোত্র ও ধর্ম এক। নিমাই খুব আশ্চর্য হল। ভারতবর্ষের এইরূপ কোথাও তার দেখা হয়নি। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে মিলন মহান ভারতবর্ষের এই হল প্রকৃত রূপ! বিষ্ণুপাদদর্শন, করতে এসে, এ কোন ভারতবর্ষকে সে দর্শন করল, ভাবতেই সারা শরীরে এক অজ্ঞাত অভূতপূর্ব শিহরণের বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিষ্ণুপাদপদ্ম বিশাল ভারতবর্ষের মানুষকে একজায়গায় করেছে। সব বৈষম্য, ভেদাভেদ ভুলে মানুষ সমবেত হয়েছে। এক উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছে। এক লক্ষ্যে পৌঁছতে জাত-পাতের বিচার, মুছে গেছে। সংস্কারের পাত্র শূন্য হয়েছে। মুক্তির বিশ্বাসে যে কোন ত্যাগে অকুণ্ঠ।

কেমন একটা স্বপ্নের মধ্যে এক পা, দু-পা করে বিষ্ণুপাদপদ্মের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বুকের কাছে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে ধরা। দুই চোখে বিভোর বিহ্বলতা। আগ্রহের প্রদীপ যেন জ্বলছে। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির অপলক নেত্রে দেখছে শিলালিপির বুকের উপর বিষ্ণুর পাদপদ্মের ছাপ। পাশে দাঁড়িয়ে একজন পুরোহিত দর্শনার্থী ভক্তদের শ্রীপাদপদ্মের মাহাত্ম্যকথা শোনাচ্ছিল। সেই উপাখ্যান নিমাইও তন্ময় হয়ে শুনছিল।

পুরোহিত সুবক্তা। তার মধুনিঃসৃত কণ্ঠে-গোটা উপাখ্যানটাই চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল।

যমরাজ বিপন্ন। চিন্তিত এবং বিমর্ষ। দিন দিন যমপুরী শূন্য হচ্ছে। পাপী তাপী সব গয়াসুরের কৃপায় উদ্ধার পেয়ে যাচ্ছে। নিরুপায় হয়ে যমরাজ বৈকুণ্ঠপ্রতি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হল। করজোড় করে নিবেদন করল: ভগবান বিষ্ণু আপনিই জগৎ পরিত্রাতা। কিন্তু মর্তধামের গয়াসুর বহু তপস্যাবলে আপনার সেই বিদ্যা অধিগত করেছে। তার প্রতি আপনার এই করুণা কেন? সে এখন মর্তের ঈশ্বর। তাকে দর্শন করলেই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে। তার ক্ষমতার অপব্যবহারে আমার যমপুরীতে আর মর্তের মানুষ প্রবেশ করেনা। গোটা পুরী খাঁ খাঁ করছে! আপনিই এর বিধান করুন।

বিষ্ণুর অধরদ্বয় অনিন্দ্যসুন্দর হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠল। সকৌতুকে বলল: গয়াসুরের অপরাধ কোথায়? সে'ত যথার্থ বৈষ্ণবের মত আচরণ করছে। বৈষ্ণবের কাছে সব মানুষ সমান। তার কাছে জাত-ধর্ম কিছু নেই।

ভগবান বিষ্ণু, আপনার করুণা পেয়ে অসুর দেবলোকের কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে চলেছে। দেবগণের প্রধান হয়ে আপনি চুপ করে তা সহ্য করবেন? এতে যে সমগ্র দেবতাদের অপমান হবে। এর বিহিত আপনাকে করতেই হবে।

গয়াসুর নির্দোষ। তার কি অপরাধ?

সাধারণ মানুষ গয়াসুরকে দর্শন করলেই যদি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়—তা-হলে আমার রাজ্য জনশূন্য হয়ে যাবে। বৈকুণ্ঠও সাধারণ মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আজ সংখ্যালঘু ভেবে তাদের উপেক্ষা করা ঠিক নয়। একদিন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আপনার শ্রেষ্ঠত্বকে কেড়ে নেয়ার জন্য জোট বাঁধবে। আপনার বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে। স্বর্গরাজ্য জয় করবে। এইভাবে মানুষ পাঠিয়ে গয়াসুর ভক্ত সেজে আপনাকে রাজ্যচ্যুত করার কৌশল এঁটেছে। সময় থাকতে আপনার সাবধান হওয়া দরকার। এতে স্বর্গের কল্যাণ হবে। দেবতারা স্বস্তি ও শান্তি লাভ করবে।

বিষ্ণুর ললাটে চিন্তার বলিরেখা গভীর হল। তাকে বিমর্ষ ও চিন্তিত দেখাল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভুরু কুঁচকে বলল: বেশ, তাই হবে। যেভাবে হোক তাকে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

বিষ্ণুর আশ্বাস পেয়ে যমরাজ খুশি মনে ফিরে গেল।

গয়াসুর দু'চোখ বন্ধ করে ধ্যানে তন্ময় হয়ে গেছে। বিষ্ণু তার সম্মুখে আবির্ভূত হল। নর্ম চোখে ভগবানের দর্শন পেয়ে ভক্ত গয়াসুর কৃতার্থ হয়ে গেল। কৃতাঞ্জলিপুটে বলল ঃ ভগবান, কিংকরের প্রতি তোমার অসীম অনুগ্রহ। তোমার দর্শনলাভ করে ধন্য হলাম আমি। এখন করুণা করে তোমার আগমনের কারণ বল। তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই।

বিষ্ণুর মুখে কুটিল হাসি। বলল ঃ গয়াসুর তোমার ভক্তিতে আমি অভিভূত। তোমার ভক্তিতে বৈরিতা, শ্রদ্ধায়, অনুরাগে বিশ্বাসঘাতকতা।

বিষ্ণুর অভিযোগে গয়াসুর চমকে উঠল। গভীর দুঃখে মর্মরিয়ে উঠল তার বুক। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ঃ ভগবান তোমার মন্ত্র আমার জপতপ। তোমার বিশ্বলোককে মানুষের বাসযোগ্য করে যাব আমি ; এ আমার অঙ্গীকার। আমি সে কর্ত্তব্য কি করছি না? আমার ব্রত ভঙ্গ হয়েছে কি? তুমি কথা বলছ না কেন? বেশ, এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি অক্ষম হও তা-হলে তোমার ক্ষোভের কথাই না হয় বল।

বিষ্ণু কয়েকমুহূর্ত চিন্তা করে বলল ঃ বৎস, আমি সাধ্যের বেশি, উচিতের বেশি তোমাকে আগলে এসেছি। কিন্তু মর্ত ধামের পাপী তাপীকে নির্বিচারে তোমার বৈকুণ্ঠে পাঠানোর ব্যাপারটা এত দূর গড়িয়েছে যে আর চুপ করে থাকা যাচ্ছে না। তাই নিরুপায় হয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

গয়াসুর প্রাণ খোলা হাসল। বলল ঃ সে ত তোমারই মাহাত্ম্য। আমাকে মিছে দোষী করছ কেন ভগবান? তুমি আমায় যে আশীর্বাদ করেছিলে এত তারই ফলশ্রুতি। তোমার করুণা কেবল আমার মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে।

বিষ্ণু বেশ একটু বিব্রত হল। প্রশস্ত কপালে চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন। শান্ত গম্ভীর গলায় বলল ঃ যা ঘটেছে তা নিয়ে হৈ-চৈ করা বৃথা। কিন্তু দেবতারা তোমার উপর প্রসন্ন নন। অবস্থাটা যে কোনদিন এ রকম দাঁড়াবে ভাবিনি।

গয়াসুরের মুখে হাসি। চোখে কৌতুক। বলল ঃ ভগবান, তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কি? তোমার বিষণ্ণ, মলিন মুখ দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে নিঃসংকোচে তোমার দুর্ভাবনার কথা বলতে পার।

গয়াসুর, মর্তধামে যারাই তোমার দর্শন পায়, তারাই বৈকুণ্ঠে যায়! কিন্তু অত মানুষের জায়গা কোথায় বৈকুণ্ঠে?

গয়াসুর হাসল। বলল ঃ তোমার বর তোমার বৈরী। আমি কি করব?

তোমাকে দুর্ভাবনা মুক্ত করতে আমায় কি করতে হবে ?

বিষ্ণু বলল : তোমাকে দর্শন করলে মানুষ মোক্ষ পাবে—এই বর'ত আর ফিরিয়ে নিতে পারি না। তোমাকে শিলাতলে ঢেকে রাখলে এই সমস্যার একটা সুরাহা হয়।

গয়াসুরের মুখে বিচিত্র হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল : ভগবান তোমাকে হতাশ করব না। কিংকরের কাজ হল সেবা করা। তোমার বিষণ্ন মুখে প্রসন্ন হাসি দেখব বলেই তোমার প্রস্তাবে রাজি হলাম।

শিলাতলে গয়াসুরের অফুরন্ত প্রাণ শক্তি কিন্তু চাপা পড়ল না। সে সচল রইল। পুণ্য বলে দেবতার ভার তার কাছে তুলাসম বোধ হল। দেবতারা দুর্ভাবনায় পড়ল। দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু আবার গয়াসুরের কাছে এল। এবার বিষ্ণুর আগমনের উদ্দেশ্য গয়াসুর বুঝতে পারল। ভক্তির সুযোগ নিয়ে বিষ্ণু তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। দেবতাদের ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথও ছিল না। বিষ্ণুকে দেখা মাত্র সে প্রশ্ন করল : ভগবান, এবার কোন ছলনা নিয়ে আবার এলে তুমি ?

বিষ্ণুর ভেতরটা একটু কেঁপে উঠল। চমকানো বিস্ময়ে বলল : ছলনা বলছ কেন, বৎস ?

কৌশল বলি, তা-হলে ?

বল, ভক্তের ভক্তির পরীক্ষা ?

আর কত পরীক্ষা করবে আরাধ্য দেবতা ?

তুমি নিশ্চল হও।

এই মনোবাসনাই যদি ছিল তোমার মনে, তা-হলে এত ছলনা করে নিজেকে ছোট করলে কেন ? বিশ্বাসের সাম্রাজ্য হারিয়ে কি নিয়ে বাঁচব আর ?

গয়াসুর, আমার প্রাণাধিক তুমি।

তাই যদি হও, তবে তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূরণ করব দুটি শর্তে।

ভিক্ষা নিতে এসেছি।

তোমাকে ভিক্ষে দেবার স্পর্ধা নেই আমার। দেবতাকে ভিক্ষা ?

তোমা হতে দীন আমি।

তবু হীন ছলনা তোমার। তাই দুটি শর্তে অবশ্য পূরণ করব তোমার মনোবাঞ্ছা।

তোমার শর্ত কি ?

আমার উপর যে প্রস্তর শিলা আছে তার উপর তুমি সহ সমস্ত দেবতাকে দণ্ডায়মান থাকতে হবে চিরকাল। এক পাষাণ ফলকে ভক্ত ও ভগবান বাধা থাকবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, আত্মার সদ্গতি কামনা করে কেউ ,পিণ্ডদান করলে তারা তোমার অভয় চরণ পাবে। তাদের আত্মা বৈকুণ্ঠগতি প্রাপ্ত হবে।

নিরুপায় বিষ্ণু বলল ঃ তথাস্তু।

পরম পুণ্যবান অসুর সেই মুহূর্তে কঠিন শিলায় পরিণত হল। আর সেই শিলার উপর শ্রীবিষ্ণু পদচিহ্ন রেখে গেল চিরকাল।

নিমাই অভিভূত। দুই চোখ বোজা। তার চেতনার ভেতর, আত্মার ভেতর আর এক আশ্চর্য অনুভূতির আলো এসে পড়ল। এই উপাখ্যান বিষ্ণুর মাহাত্ম্যকে কিছুটা কলংক লেপন করেছে। বৈষ্ণব বিরোধী ধর্মমতের এ এক চতুর কার সাজি। বৈষ্ণব ধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রাধান্য স্থাপনের গল্প। নিমাই পণ্ডিতের যুক্তিশীল মনটি তারই বিচার বিশ্লেষণ করছিল মনে মনে। বিষ্ণুভক্ত গয়াসুরের জাত-পাতহীন নিবিড় মানবপ্রীতি আর সৌহার্দ্দ পৃথিবীকে এক স্বর্গলোক করে তুলেছিল। মানুষের মন থেকে বিদ্বেষ, ঘৃণা, উচ্চ নীচ বোধ কর্পূরের মত উবে গিয়েছিল। এক অবারিত মুক্ত পৃথিবীতে তারা সুখেই বাস করত। কিন্তু বিভেদকামী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তা সহ্য হল না। সাধারণ মানুষের উপর ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব খর্ব হওয়ার আশংকা করে তারা মানুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ উস্কে দিল। ভক্তিহীন আচার সর্বস্ব জীবন মানুষের জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতাকে রুদ্ধ করল। গয়াসুরের উপর প্রস্তর শিলা চাপিয়ে দেয়া তারই রূপক। আর তার উপর দেবতাদের অবস্থান হল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য স্থাপনের প্রতীক। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম বিদায় নিল কিন্তু একেবারে মুছে গেল না, বিষ্ণুপাদ পদ্ম তারই চিহ্ন।

কথাগুলো মনে হতে মাথার ভেতরটা নিমাইর কেমন করে উঠল। কেমন যেন বিদ্যুৎ চমকের মত মনে হল বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম ও অহিংসার বাণী একদিন দুর ভবিষ্যতের অনাগত কালের মানুষকে দুঃখ দুর্যোগের অন্ধকারে আলোর সন্ধান দেবে। তাই গয়াসুরের মৃত্যু নেই, মৃত্যু হতে পারে না। মহৎ একটা আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে তার মন চলে গেল কোন উর্দ্ধলোকে। আশ্চর্য এক প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তার ভেতরটা।

নিমাই পাদপদ্মের দিকে অপলক স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে। আর তার সমস্ত চেতনার ভেতর, আত্মার ভেতর জ্যোর্তিময় এক সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করল। বিষ্ণুপাদপদ্মেই যেন বলছে প্রত্যেক মানুষের ভেতর ঈশ্বর আছেন। ভক্ত ও ভগবান কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়। ঈশ্বর গয়াসুরকে পরিত্যাগ করেনি। এই অনুভূতি জাগতেই তীব্র আবেগে তার ভেতরটা শির শির করে উঠল। আর এক অপার্থিব সুখের উল্লাসে, গভীর আবেশে তার ভেতরটা টৈটুম্বর হয়ে গেল। দুই চোখ বুজে এল। চোখে মুখে তার আরাত্রিক পবিত্রতা।

কিছুক্ষণের জন্যে স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল নিমাই। তার নয়ন সম্মুখে এক অপরূপ দৃশ্য। বিষ্ণুর পাদপদ্মের ছাপ যেখানে, সহসা এক মূর্তির আবির্ভাব ঘটল সেখানে। সেই মূর্তি শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী স্বয়ং বিষ্ণুর। আর তার মাথার পিছনে সূর্যমণ্ডলের মত প্রদীপ্ত জ্যোতি। নিমাইর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। নিমাই সম্মোহিত, বাহ্যজ্ঞানরহিত। তার মুখাবসনে এক গভীর মুগ্ধতার ভাব। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রস্তর শিলার মত নিশ্চল, শান্ত। প্রগাঢ়:ভক্তির আবেগে তার দুগাল বেয়ে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল। পাদপদ্মে আবির্ভূত বিষ্ণু-মূর্তি তার দিকে মায়াবী চোখে চেয়ে আছে। অধরে স্মিত হাসি। নিমাইর গায়ে কাঁটা দিল। তার ভেতরটা অফুরন্ত বিস্ময়ে, আনন্দে, আরামে, সুখে টৈটুম্বর হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য শারীরিক অনুভূতি। এই অনুভূতি তার শরীরে ও মনে ঘুঙুরের মত বাজছিল। আর এক অনির্বচনীয় অলৌকিক তৃপ্তিতে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। অলৌকিক প্রত্যাশা তার বুদ্ধির কেন্দ্রটা শিথিল করে দিল। বিষ্ণুর জ্যোতির্ময় মূর্তিছাড়া আর কিছু দেখছিল না। তার একাগ্র সত্তা ঐখানে স্পন্দিত।

বিষ্ণুর অস্তিত্বের স্পর্শকে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করার প্রবল ইচ্ছে নিমাইকে স্থির থাকতে দিলনা। তার ভিতরটা কাঁপছিল আবেগে, আনন্দে, উত্তেজনায়। শরীরের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনে পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। আকাশ জোড়া বিদ্যুৎ চমকের মত চমকিত হতে লাগল তার ভেতরটা। কি যেন ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল নিমাই। অমনি মাথাটা ঘুরে গেল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ নক্ষত্রের মত তার শরীরের ভেতর পাক খেতে লাগল। ঝড়ে আন্দোলিত বৃক্ষশাখার মত নিমাইর বিশাল দেহটা দুলতে লাগল।

কিন্তু সে কয়েকমুহূর্ত্ত মাত্র। তারপরেই মূর্চ্ছা গেল।

নিমাইর চৈতন্য ফিরলে দেখল ঈশ্বরপুরী তার শিয়রের ধারে বসে আছে। একখানা হাত তার কপাল স্পর্শ করে আছে। চোখ খুলে নিমাই প্রথম তাকে দেখল। ঘোলা ঘোলা দুই চোখের চাহনিতে অবাক বিস্ময়। আশ্চর্য আর অদ্ভুত অনুভূতিতে সারা শরীরে তার শিহরণ বয়ে গেল। দু'চোখের কোণে জল দেখা দিল। স্নিগ্ধ হাসির আভায় অপরূপ দেখতে লাগল তাকে। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল: আপনি! এখানে!

নিমাইর সঙ্গে কথা বলতে গেলে ঈশ্বরপুরীর বুকের ভেতর কেমন একটা উথলে ওঠার ভাব হয়। নিমাইর বিস্ময়ে, মৃদু একটু হাসল। বলল: এখন কেমন বোধ করছ?

নিমাইর অবাক প্রশ্ন: আমার কি হয়েছিল?

জানিনা। সে এক স্বপ্নাদৃশ্য। দেখে, সার্থক হল জীবন।

কেন, আমার কি হয়েছিল?

তুমি বোধ হয়, কিছুক্ষণের জন্যে মানুষ ছিলে না। তোমার সমাধি হয়েছিল জীবাত্মা পরমাত্মার অদ্বয় সম্বন্ধ অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। উচ্চ-মার্গের সাধকদের শুধু এই ক্ষমতা থাকে। তুমি সেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী।

নিমাইর গায়ে কাঁটা দিল। সম্মোহিতের মত ঈশ্বরপুরীর দিকে চেয়ে রইল। তার ব্যক্তিত্বের তীব্র চৌম্বক আকর্ষণে থর থর করে কেঁপে গেল নিমাইর ভেতরটা। ঈশ্বরপুরীর কাছ ঘেঁষে বসল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল: মহাত্মন, আমার এখনও বিস্ময় লাগে, যিনি অবাঙ্মনসগোচর, যিনি অদৃষ্ট, তাঁকে স্পষ্ট দেখলাম। ধ্যানে নয়, কল্পনাও নয়, স্বপ্নেও নয়—এই যেমন আপনাকে দেখছি। তবে, তাঁর সঙ্গে কোন কথা হয়নি। কিন্তু হাতছানি দিয়ে তিনি আমাকে কাছে ডেকেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হেসে ছিল। চোখের চাহনিতে তার অব্যক্ত আহ্বান। সে দৃশ্য দেখে আমি অভিভূত, দিশেহারা। কথা বলব কি? আনন্দেই যে তখন কাঁদছি। তারপর আমার কেমন সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। আমার শরীর ভীষণ হাল্কা বোধ হল। মনে হল মাটিতে আমার পা নেই। আমি হাঁটতে পারছি না, দাঁড়াতে পারছিনা। শূন্যে মহাশূন্যে মেঘের ভেতর দিয়ে আমি উড়ে চলেছি। আর শঙ্খ চক্র-গদা পদ্মধারী কেশব আমার দিকে তাকিয়ে

মৃদু মৃদু হাসছে। দুই চোখে তার স্নিগ্ধ কৌতুক। আমিও হাসছি। সে এক আশ্চর্য মানসিক অনুভূতি। কিন্তু তারপর হঠাৎ বুক ভাসিয়ে আমার কান্না এল, ভয় লাগল। চিৎকার করে বললাম : কেশব নিষ্ঠুর হওনা। আমার বড় ভয় করছে, আমাকে মাটির পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে চল। আমি মায়া ত্যাগ করতে পারলাম না। কেন এমন হল? নিমাইর কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। দেয়ালে শরীরের ভর রেখে সে চোখ বুজে রইল কেমন একটা দিশে-হারা ভাব তার চোখে মুখে। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলনা।

ঈশ্বরপুরী নীরব। অবাক চোখে সে নিমাইকে দেখছিল।

চন্দ্রশেখর ঈশ্বরপুরীকে মাথায় আঙুল দিয়ে ইশারা করে বোঝাল, নিমাইর মাথাটা একটু গণ্ডগোল আছে। কিন্তু ঈশ্বরপুরী নির্বিকার। তার কোন ভাবান্তর নেই। চন্দ্রশেখর বিস্মিত।

ঈশ্বরপুরী খুব চিন্তিত ভাবে হাঁটুর উপর ডান হাতের কনুই রেখে তেলোতে থুতনীর ভর রেখে কিছুক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থাকল। বুক কাঁপিয়ে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিস্ময় বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলল : নিমাই তুমি যা দেখলে এবং অনুভব করলে তার ভেতর এক গভীর দর্শন আছে। শ্রেয় এবং প্রেয় নিয়ে মানুষের জীবন। বৈষ্ণব বলে মানুষ হচ্ছে তটস্থ, অর্থাৎ সমুদ্রতেও নয়, ডাঙাতেও নয়—তটে। সমুদ্র ও প্রান্তরের মাঝামাঝি তার জীবন। যদি সমুদ্র হয় শ্রেয়, প্রান্তর তবে প্রেয়—মানুষের এই দুটি দিকই স্বীকার করেছে তারা। একদিকে যেমন সে বদ্ধ, অন্যদিকে সে মুক্ত। সৃষ্টিকর্তা মানব সৃষ্টি করার সময় পঞ্চভূত করলেন, যার সমবায়েই হল মানব দেহ। ক্ষিতি যুক্ত করল মানুষকে পৃথিবীর সঙ্গে, ব্যোম তার আকাশ গোত্রতা এনে দিল। অপ্, তেজ, ও মরুৎ করল শূন্য পূরণ। এই শ্রেয় ও প্রেয়র অনন্ত ব্যবধানের মধ্যে এমন মানুষের আবির্ভাব হল যাঁর পদদ্বয় পৃথিবীর মাটিতে থাকলেও, মাথা আকাশে গিয়ে লেগেছে। মানব জীবনের দিগন্তে দাঁড়িয়ে, আকাশ প্রান্তরের মিলনে তিনি মধ্যস্থতা করে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এমন একজন মানুষ। তুমি যা তাঁর ছায়া এটুকু তোমার স্বপ্ন থেকে, দর্শন থেকে বুঝতে পারলাম। তুমি সেই পরম বৈষ্ণব নবদ্বীপ ধামে তোমাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম। তুমিই পারবে শ্রেয় ও প্রেয়ের বাণীতে চরম সামঞ্জস্য এনে দিতে।

অস্ফুট একটা শব্দ করল নিমাই। তবে বোবা শব্দ, ভাষা ছিল না তাতে।

একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর থেকে কিছুক্ষণ পর নিমাই বলল ঃ গুরুদেব আমার হৃদয়ে প্রেমময় কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মন্ত্র দিন।

চমকানো বিস্ময়ে ঈশ্বরপুরী উচ্চারণ করল ঃ নিমাই !

গুরুদেব আমার অন্তরের অস্থিরতা চাপা দিতে জপমন্ত্র চাই।

ঈশ্বরপুরী স্তম্ভিত। মৃদু স্বরে বলল ঃ আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে আমি কি মন্ত্র দেব ? শ্রেষ্ঠ যোগী তুমি। সিদ্ধ তপস্বী।

তবু গুরুর প্রয়োজন হয়। গুরু বিনে একাগ্রতা আসে না, অহংকার ঘোচে না। আমার সব অহংকার আপনার পায়ে দিলাম।

ঈশ্বরপুরীর ভিতরটা ভীষণ কেঁপে উঠল। সভয়ে উচ্চারণ করল ঃ নিমাই !

আর বিলম্ব নয়, এবার আমাকে দীক্ষা দিন। আমি উন্মুখ হয়ে আছি।

নিমাই আমি প্রস্তুত নই, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

গুরুদেব বেশী ভাবলে সব ঘুলিয়ে যায়। উপর উপর ঢেউ দিলে দীঘির জল স্বচ্ছ হয়ে উঠে কিন্তু বেশি ঢেউ দিলে ঘুলিয়ে যায়। আমাদের মনটা এই দীঘির মত। যত বেশি ভাববে ততই যুক্তি তর্কে, দ্বিধায়, বাধায়, কণ্টকিত হবে মন। চিত্ত যখন জেগেছে, তখনই মন প্রস্তুত হয়ে আছে। অকারণ বিলম্বে কাজ কি ?

নিমাই জননীর অনুমতি না নিয়ে'ত তুমি সন্ন্যাসী হতে পার না।

আমি মায়ের অনুমতি পাব।

তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া আছে।

আমি তাঁকে কৃষ্ণ সেবায় অর্পণ করেছি।

নিজেকে এমন করে নিঃস্ব রিক্ত করে তুমি কার সন্ধানে ছুটে চলেছ ? এ পথ কঠিন জেনেও তুমি নিজেকে মনে মনে বন্ধন মুক্ত করেছ। তোমাকে আমি ঠেকাব কি করে ?

আমার সমস্ত মন প্রাণ কৃষ্ণ পদে সঁপেছি। তাকে ছাড়া আর কিছু চাই না। কৃষ্ণ আমার ধ্যান, জ্ঞান।

নিমাই কার্য কারণ সূত্রে বাঁধা বিশ্ব প্রকৃতি। কারণ ছাড়া কার্য হয় না তুমি কি হেতু সন্ন্যাস নিতে চাইছ।

জানি না, কৃষ্ণপদ লাভের আকুল বাসনা জেগেছে মনে। কৃষ্ণের অভয় দুটি চরণ ছাড়া আর কোন চিন্তা মনে আসছে না।

নিমাই, এ যে তোমার ভাবাবেগ নয়, কেমন করে বুঝব ? আর কিছুদিন

থাক, তারপর চিন্তা করব।

পক্ষকাল পরের ঘটনা। তখন মধ্যাহ্নকাল।

একটু আগেই স্বপাক রন্ধন শেষ করে নিমাই আহারের আয়োজন করছে। এমন সময় ঈশ্বরপুরী উপস্থিত হল তার কুটীরে। কোন ভূমিকা না করেই বলল: নিমাই বড় ক্ষুধার্ত আমি। আহারের বিলম্ব সইছে না।

নিমাই মৃদু হেসে বলল: এ-ত বড় আনন্দের কথা। আমার রন্ধন প্রস্তুত। আপনি আসন গ্রহণ করুন।

ঈশ্বরপুরী সবিস্ময়ে বলল: সে'ত তোমার আহার্য! আমাকে দিলে তুমি খাবে কি?

নিমাইর অধর প্রান্তে এক টুকরো হাসির ঝিলিক দিল। বলল: গুরু সেবা শেষ হলে আমি আহার প্রস্তুত করে নেব। আপনি আহারে বসুন।

তা কেমন করে হয়। তুমিও ক্ষুধার্ত। বরং যা আছে দুজন মিলে ভাগ করে খাই।

তাতে কারো আত্মাই পরিতৃপ্ত হবে না। আপনি দ্বিধা না করে আহারে বসুন। এবার পরিতৃপ্ত হয়ে ভোজন করুন। তাতে আমার আত্মা তৃপ্ত হবে।

কথাগুলো বলা শেষ করে নিমাই পাত্র ভরে জল আনল। নিজে ঈশ্বর পুরীর পাদ প্রক্ষালন করে দিল। তারপর একটা সাদা উত্তরীয় দিয়ে তার পা মুছে দিল। হাত ধরে আসনে বসাল। থালায় অন্ন ব্যঞ্জন সাজিয়ে দিল। তারপর পাশে বসে হাওয়া করতে লাগল।

ঈশ্বরপুরী বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল নিমাইর দিকে। একটা সৌজন্যমূলক স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। ঈশ্বরপুরী নিঃশব্দে ভোজন করতে লাগল। মুখে স্মিত হাসির আভা।

ঘরটা অকস্মাৎ শব্দহীন হয়ে গেল। মনের মধ্যে ঈশ্বরপুরীর নানারকম কথার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল।

আহার পর্ব চুকে গেলে নিমাই তার পদ প্রান্তে এসে বসল। ঈশ্বরপুরীর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল: পৃথিবীতে স্নেহ-মমতা, আত্মীয়তার বন্ধনগুলোও সন্ন্যাসীদের কাছে ভারী পলকা। সংসার যতই তাকে আপন করতে চাক্, নিবিড় বন্ধনে বাঁধতে চাক্ না কেন সংসারকে সে ফাঁকি দেবেই।

এ কথা বলছেন কেন? নিমাই বলল।

ঈশ্বরপুরী ব্যথিত হয়ে বলল: নিজেকে দেখেই'ত বুঝতে পারি।

সন্ন্যাসীরা বড় স্বার্থপর, সংসারকে তারা বড় দুঃখ দেয়। পৃথিবীটা নিজেরাও ভোগ করে না, অন্যদের জন্যে কিছু রেখেও যায় না।

নিমাই একটু হাসল। বলল: এ হল আপনার অভিমানের কথা। বহু-দিনের সাধনায় তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন উপলব্ধি। তাঁরা পথদ্রষ্টা। পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমাদের তমসাচ্ছন্নকে পথকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যেতে চাই। আপনি আমাকে তার দীক্ষা দিন।

ঈশ্বরপুরীকে ভীষণ উৎফুল্ল দেখাল। বলল: নিমাই, তুমি আমাকে দুর্ভাবনামুক্ত করলে। কৃষ্ণ কখনও সন্ন্যাসগ্রহণ করেনি। কিন্তু মানব সেবা ছিল তাঁর সন্ন্যাস। মানুষের হিতের জন্যে, কল্যাণের জন্য, তিনি সর্বসুখ বিসর্জন দিয়েছিলেন। অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানবকুলকে প্রবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর জীবন সাধনা। প্রেমে মানুষকে সুন্দর করা ছিল তাঁর জপমন্ত্র। তোমাকে আমি সেই দশাক্ষর মন্ত্র দেব। কিন্তু তুমি সে মন্ত্র নিয়ে কি করবে?

ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষে নানাভাবে নিপীড়িত, অধঃপতিত বিপথগামী, সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করব।

সেদিন আর কোন কথা হল না। ঈশ্বরপুরী নিজের কুটীরে প্রত্যাবর্তন করল। তারপর শুভ দিন, শুভক্ষণ দেখে বিষ্ণুপাদপদ্মের সামনে দাঁড়িয়ে বলল: তুমি পণ্ডিত চূড়ামনি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করুণা তুমি পেয়েছ। তোমাকে আমি কি দীক্ষা দিতে পারি? লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং অবতারী মন্ত্রগ্রহণ করেন, মন্ত্র হল শক্তি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বোধ হয় ইচ্ছে, তুমি আমার কাছ থেকে দীক্ষা নাও। তারপর কানের কাছে মুখ এনে সম্মোহিতের মত বিড় বিড় করে বলল: নিমাই উচ্চারণ কর সেই দশাক্ষর মন্ত্র! "গোপীজন বল্লভায় স্বাহা"।

নিমাইর শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার চোখ বোজা। দু'চোখের কোণ বেয়ে প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

॥ নয় ॥

নিমাইর অন্তঃকরণ কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের ভাবাবেশে বিহ্বল ধ্যানের ভেতর কৃষ্ণের দিব্যমূর্তি দেখতে পায়। পরম আবেগে নিমাইর দু'চোখ বুজে যায়। আর ধীরে ধীরে কেমন একটা অনাস্বাদিত পূর্ব সুখের অনুভূতিতে তার চেতনা আবিষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত সত্তার ভেতর কৃষ্ণ তখন নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করে। মনে হয়, সে যেন ভুবনজোড়া আলোর রাজ্যে এসে পড়েছে। নামে যে এত মাধুর্য আছে আগে জানা ছিল না। হৃদয়ের ভেতর সেতারের মত মধুর ঝংকারে বাজে দশাক্ষর মন্ত্রর বাণী।

যে নাম শুনলে এত প্রেম জাগে অন্তরে সেই নামের দেশ না জানি কত প্রেম আছে। মথুরা ভগবানের জন্মভূমি মথুরায় যাওয়ার জন্যে তার চিত্ত আকূল হল। সঙ্গীদের নিয়ে নিমাই মথুরায় যাত্রা করল।

পথের দু'ধারে গাছ আর গাছ। ছোট বড় গাছের সারি তার ফাঁকে ফাঁকে হারিয়ে যাচ্ছিল নিমাইর দৃষ্টি ও চিন্তা। শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবতে গিয়ে বারংবার তার মনে হতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের বিরাট কর্মময় জীবনের যত বৈচিত্রই থাকুক তার জীবনেও বৈচিত্র কম নয়। বরং সে আরো আশ্চর্য এবং অভিনব। নিমাইর দৃষ্টি তার গন্তব্যপথে নিবদ্ধ থাকলেও সে তার অতীতকে দেখছিল। বহু ঘটনা তার মনে পড়ল! চোখের পাতা স্মৃতি সুখে ভারাক্রান্ত হল। কেমন একটা স্বপ্নাচ্ছন্নের ঘোর তার চাহনিতে ফুটে উঠল।

নিজেকে নিয়ে মাধুর্যের বিস্ময়ের অন্ত নেই। অতীতের ভেতর নিজেকে খুঁজে খুঁজে বার করার ভেতর এক ধরণের আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দ আছে। সে জীবন কাহিনীর পাতায় পাতায় কত বিস্ময়, আনন্দ, সুখ-দুঃখ, উত্তেজনা, সংঘাত, চাঞ্চল্য, অস্বস্তি, আরো কত কিছু। ভাবতে অবাক লাগে, এক অদৃশ্য রূপকার যেন নিজের অজান্তে তাকে বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে তিল তিল করে তৈরী করছিল। অদ্বৈতাচার্য তাকে বহুবার বলেছে, সে মহাকালের সৃষ্টি। মহাকাল তার ভেতর দিয়ে প্রকাশ হতে চায়। কাল পূর্ণ হলেই

তার রথচক্রে বেগ সঞ্চারিত হয়। যেমন ফুল নিজের নিয়মে ফোটে। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। নবদ্বীপে থাকতে হবে। নবদ্বীপে তার কর্মের ক্ষেত্র তৈরী হয়ে আছে। এখানকার কর্মের সাফল্য গৌরব এবং জয়ের উপরে তার অন্যত্র প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে। সুতরাং এই মুহুর্তে তার নবদ্বীপ ত্যাগ করা উচিত নয়। নিজের কর্তব্যের প্রতি এ ধরণের উদাসীন দেখানোও ঠিক নয়।

মথুরায় গিয়ে একা সে কি করতে পারে? নিজেকে প্রশ্ন করল নিমাই। ভাবাবেগে ভেসে মথুরায় যাওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে গৌরব অর্জন করা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। রাতারাতির কাজ নয়। তার একটা পরিচিতি দরকার। বলতে কি এখন সে ধরণের কোন যশই তার হয় নি। তারপর মথুরা'ত মুসলমান শাসিত দেশ। সেখানে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টা করা কিংবা হিন্দুধর্মের অনুকূলে কিছু করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তাতে মুসলমান রাজশক্তির সন্দেহভাজন হয়ে রাজরোষে পড়তে হবে। এতে মথুরার মানুষের কোন কল্যাণ কিংবা মঙ্গল হবে না। নবদ্বীপেরও কোন লাভ হবে না। অতঃপর মথুরায় যাওয়ার আবেগটা তার খুব দীর্ঘ স্থায়ী হল না।

নবদ্বীপে ফিরে যাওয়াই কর্তব্যবোধ করল। নবদ্বীপের অবস্থা এখন খুবই সংকটাপন্ন। সেখানে প্রত্যেক হিন্দুকে এবং সাধারণ মানুষকে প্রতি মুহুর্ত লড়তে হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এবং কুপিত মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে। কিন্তু সে লড়াই প্রত্যক্ষ নয়। সমাজের গর্ভদেশে তার উত্তাপ জমা হয়ে আছে। সেই সংঘাতকে সবাকার দৃষ্টির সামনে, খোলা রাজপথে প্রকাশ্য করতে না পারলে এই তাপ নিঃশেষ হবে না, লড়াইও শেষ হবে না। মানুষের তন্দ্রা ভাঙানোর জন্য এবং বিধর্মী রাজশক্তির ধর্মের উপর আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চালাতে নিমাই সাধারণ মানুষের সমতলে নেমে এসেছে। মথুরায় গেলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও সুবিধা বিপন্ন হবে। তাদের মানবিক মর্যাদা ও গৌরব আরো অবনতি হবে। শুধু তাই নয়, এদের চোখে সে নিজেও ছোট হয়ে যাবে। শত্রুরা হাসবে। নানা রকম নিন্দে এবং মিথ্যে কুৎসা রটনা হবে। তার অকলঙ্ক চরিত্রে কিছুটা কালিমা লেপন করবে। এইসব চিন্তা করে নিমাই আর মথুরায় গেল না। পথ থেকেই নবদ্বীপেব পথে ফিরল।

পথে বেরোলেই নিমাইর মনটা মুক্ত হয়ে যায়। সে তখন অনেক কিছু মুক্ত ভাবে কল্পনা করতে পারে। আসলে, পথে বেরোলে জীবনের আর কোন আড়াল থাকে না। অনেকদূর পর্যন্ত জীবনকে দেখা যায়। অভ্যাসের বাইরে, একঘেয়েমিতার বাইরেও যে বিরাট মুক্ত জীবন আছে যার অনেক কিছু প্রতিদিনের সংসার যাত্রার ভেতর দেখা হয় না, পথেই তাকে আশ্চর্য ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

এই পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস যেখান থেকে সুরু হয়েছিল সেখান থেকে মানুষ আজ অনেক দূরে এসেছে। এক এক সময় এক একজন রাজা এসেছে। রাজার উত্থান পতনের সঙ্গে মানুষের ভূগোল, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন সব কিছু বদলে গেল বারবার। ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সূত্রতে জট পাকালা। বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা, উদারতার জায়গায় বিচ্ছিন্নতা এসে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিল। অন্যদিকে তেমনি বিরোধ বাধল দেশের সঙ্গে দেশের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের. ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধনীর সঙ্গে দারিদ্রের, কালোর সঙ্গে সাদার, ভাষার সঙ্গে ভাষার, জাতির সঙ্গে জাতির। তারপর সেই বিরোধ এসে ঢুকল পরিবারের ভেতর! এখানে প্রত্যেকের নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে, সংস্কারের সঙ্গে তার ঝগড়া। প্রত্যেক মানুষের সব বিরোধ বোধ হয় তার নিজের সঙ্গে। চিরদিনের জন্যে নয়ত দীর্ঘ দিনের জন্যে। সেই ঝগড়া কেউ থামাতে আসে না। জীবন ভরা ঝগড়া দ্বন্দ্ব নিয়ে একটানা দীর্ঘপথ চলা তার জীবনে বড় ক্লান্তির, বড় একঘেয়েমির। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। খুব কাছ থেকে নিমাই তাদের কষ্ট দেখেছে। একি কম বিপর্যয়।

যে হাঁটা রাস্তা গেছে সেই পথ ধরে নিমাই নিঃশব্দে হাঁটছিল। গাছতলার ছায়ার ভেতর দিয়ে নানাকথা তার মনে পড়ছিল। অবাক বিস্ময়ে নিজের মনে মনে বলল: অথচ, এইসব মানুষ নিয়েই'ত তার সমাজ, তার দেশ। এই মানুষকে গড়ে তোলার জন্যে এই ভারতবর্ষে একজনের পর একজন অবতারের আবির্ভাব হয়েছে। একজনের পর একজন মহাপুরুষ এসেছে। হাসি মুখে প্রাণ দিয়েছে কত মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী, ধর্মীয় গুরু। তবু এই মানুষ অধঃপতন থেকে, অবক্ষয় থেকে, তার করুণ দুর্দ্দশা থেকে মুক্তি পেল না কেন? ঠিক সেই সময় একটা বুনো পাখি গগন বিদারী চিৎকার করে উড়ে গেল।

নিমাইর বুকের ভেতরটা সহসা কেঁপে গেল। তার আকুল করা জিজ্ঞাস পাখীর ডাকের সঙ্গে মিশে গিয়ে হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ল নিখিলে অকস্মাৎ নিমাইর চিন্তাটা কোথায় যেন একটা ধাক্কা খেল। একটা চমকাে ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল। তার ভেতরে এ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল। এক যন্ত্রণাবিদ্ধ জিজ্ঞাসার কাছে সে উৎকর্ণ বোবা ছলছল চোখে কি গভীর মায়া আর করুণা তার।

নিমাইর চোখের তারায় ব্রাহ্মণ শাসিত হতশ্রী ভারতবর্ষের এক ছা ভেসে উঠল। হিন্দু সমাজে হিন্দু বড় পরাধীন। গোষ্ঠির মানুষের জ হিন্দু সমাজে কোন দয়া, মায়া করুণা নেই। বর্ণ-বৈষম্য এবং জাত-পাতে অভিশাপে হিন্দুসমাজ খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন। নিম্নবর্ণের হিন্দু নিজের সমাজে পতিত, অস্পৃশ্য, লাঞ্ছিত, এবং নির্বাসিত। হিন্দুয়ানী কতকগুলি যুক্তিহী আচার, প্রথা সংস্কারের গোঁড়ামিতে পরিণত। ব্রাহ্মণেরা বর্ণ শ্রেষ্ঠ'র গ গর্বিত, যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের একমাত্র অধিকারী হওয়ার অহংকারে দাম্ভিক প্রেমহীন সমাজের প্রতি হিন্দুর আনুগত্য, তাই শিথিল হয়ে পড়ল। বিধ শাসক সমাজ হিন্দুসমাজের এই দুর্বলতার সুযোগ নিল। তাই আসন্ন ধ্বং থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার প্রশ্ন বড় হয়ে উঠল। কিন্তু মুসলমান ধর্মকে বৈ করে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন নয়। প্রেমের আদর্শে, সৌভ্রাত্রের বন্ধনে সম সামাজিক রীতিনীতির ঊর্দ্ধে, আচার বিচার প্রথা, কুসংস্কারের বাই মানবিকতার মহান আদর্শে বড় হয়ে উঠা। কৃষ্ণপ্রেমের ভাবাবেগের স্রো জীবনের সব কলঙ্ক, কালিমা, দুর্বলতা তখন কেটে যাবে। সবার স সবাকার মিলনের এক অপূর্ব সুযোগ হবে।

এলোমেলো হাওয়ায় নিমাইর চুল উড়ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর উঁ গভীর শ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে তার জমা করা উদ্বেগটা বেরিয়ে গেল ফিসফিস করে নিজের মনে বলল : ঘৃণায়, বিদ্বেষে, হিংসায় যাকে একি হারিয়েছি তাকে প্রেমে ফিরে পেতে হবে। জাতটা কিছু নয়, মনটাই আস সেই মন প্রেমের পরশে গলে। কিন্তু—

নিমাইর চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল পথে ক মুহূর্তের জন্যে। তার শান্ত ও হিসেবী মনটা কোন ব্যাপারে অসতর্ক ন তা-হলে এই ভাবনাটা তার মনে জাগল কেন? এর কোন সুস্পষ্ট উত্তর ত জানা ছিলনা। তবে, এই চিন্তাটা মনে হওয়া থেকে একটা অস্বস্তি ত

ভতরটায় ছড়িয়ে পড়ল। এক নিরন্তর আত্ম অন্বেষণে তার মনটা প্রসারিত য়ে গেল বহুদূর পর্যন্ত। চিন্তার আলোকে স্বচ্ছ হয়ে উঠল চেতনা।

জাতপাত হীন, বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমাজ সচেতন সাধকের সংগ্রাম তুন কিছু নয়। আগেও বহু ভারত সাধক এই পথের পথিক হয়েছেন। প্রমে তারা সর্বশ্রেণীর মানুষকে আপন করে নিয়েছে। সব মানুষকে সমান চাখে দেখেছে, সমান হতে বলেছে। এখন'ত সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে জাতপাতহীন এক মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে। কবীর, নানক, সুরদাস, নামদেব, বীরশৈব বাসত্তাপ্পা, ায় রামানন্দ, শঙ্করদেব, সব ভক্ত সাধক বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে সহজ সরল করে য়েছে। সব ধর্মীয় সাধকই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছে। মুসলমানদের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করেছে। সেও তাই করছে। তা-হলে তার সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায় থাকল?

নিমাই যেতে যেতে কারণটা ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু তার চিন্তাশক্তি ভাল কাজ করছিল না। মাথার ভেতরটা বড় শূন্য বোধ হচ্ছিল। এই শূন্যতার অর্থ সে অন্য কিছু নয়, নিজেকেই খুঁজছিল। সত্তার যে অংশ নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারছেনা এ তারই বেদনা।

পৌষের শেষ।

নিমাই গয়া থেকে গৃহে ফিরল। সঙ্গে তার সঙ্গীরা। চন্দ্রশেখর শচীর পদধূলি নিয়ে বলল: তোমার নিমাইকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। আমার দায় শেষ। তুমি নিমাইর সঙ্গে কথা বল। আমরা আসি।

চন্দ্রশেখর আর দেরী করল না। সেও অত্যন্ত পথশ্রান্ত ছিল। সঙ্গীদের নিয়ে প্রস্থান করল।

কিন্তু নিমাইকে দেখে শচীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। এক যন্ত্রণাবিদ্ধ জিজ্ঞাসার কাছে সে উৎকর্ণ বোবা। এ কোন নিমাইকে চন্দ্রশেখর দিয়ে গেল? তার রোজকার দেখা নিমাই মাত্র কয় মাসের ভেতর এত বদলে গেল? নিমাই কত রোগা হয়ে গেছে। তার সে রঙ কোথায়? চোখের সেই দীপ্তি কই? হাসিতে তার মুক্ত ঝরেনা কেন? সোনার বর্ণ এত তামাটে হল কি করে? চোখে মুখে এত কালি কে মাখাল তাকে? তার শান্ত সুন্দর দুই

চোখের তারা দুটি এমন আধো ঘুমে ডুবে আছে কেন? তার নাড়ি ছেঁড়া ধনকে মন্ত্র করল কে?

শচীর বিস্ফারিত দুই চোখে ব্যথা ঘন হয়ে উঠল। কেমন একটু বিষণ্ণ ও মলিন দেখাল তাকে। ভিতরে একটা অস্থিরতার ঢেউ দাপিয়ে বেড়াল। কথার সমুদ্র তোলপাড় করে উঠল। এক অবোধ রহস্যময় অনুভূতিতে সে বোবা, উৎকর্ণ। বুকে এক প্রগাঢ় যন্ত্রণা থাবা গেড়ে বসেছিল। কোন ব্যথা বেদনা জ্বালা নয়, একটা ভয় আশংকায় তার বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছিল আর ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছিল নিমাইকে! চোখের কোণায় কোণায় তার অশ্রু বিন্দু টলটল করছিল। ঠোঁট দুটো অবরুদ্ধ আবেগে মৃদু কাঁপছিল

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিমাইকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেখল। বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। নিমাইর পরিবর্তনটা এত অস্বাভাবিক যে বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে নিমাইর সামনে দাঁড়াবে, গলবস্ত্র হয়ে তাকে প্রণাম করবে, সেটুকু শক্তি পর্যন্ত তার ছিল না। জড়বৎ দেহটি প্রবল এক সম্মোহনে স্থির হয়ে রইল বারান্দার প্রান্তে। যদিও বুকে তার নানা মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া। নিমাইর আধো ঘুমন্ত দুই চোখে চোখ রেখে নিঃশেষ করে দেখল। আর কেমন একটা আবেগে, অনুরাগে শ্রদ্ধায়, সুখে তাব হৃদয় টৈটুম্বুর হয়ে গেল। বোবা স্বরে বলল: লাখ লাখ যুগে হিয়ে হিয় রাখলুঁ তবু হিয় জুড়ন না গেলঁ। তার বিস্ময়ের কোন শব্দ ছিল না

স্থানটা বেশ কিছুক্ষণ শব্দহীন হয়েছিল। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য নিমাইর বিভ্রম ঘটল। জননীর ছলছলে করুণ গভীর দুই চোখের দিকে অপলক চাহনি স্থির হয়ে রইল। কতক্ষণ, কে জানে? শচীর অস্ফুট কান্নার শব্দে তার চমক ভাঙল। বুকের মধ্যে দুরন্ত গতিময় তীরের মত গিয়ে বিদ্ধ করল তা। চকিত বিদ্ধ যন্ত্রণায় সে ডাকল: মা, তুমি কাঁদছ? আমাকে নিমাই বলে একবারও ডাকলে না'ত? খুব রাগ করেছ বুঝি?

শচী কথা বলতে পারল না। তার বুক ভাসিয়ে নামল করুণা, মমতা স্নেহ। দু'কুল প্লাবী স্রোতের মত অনন্ত মাতৃস্নেহে সে নিমাইকে বুকে টেনে নিল। উদ্গত আনন্দাশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গেল মাতা ও পুত্রের নয়ন দরবিগলিত ধারায় ঝরতে লাগল অশ্রু! কতবার শচী নিমাইর গণ্ডে এঁকে দিল স্নেহ চুম্বন। নিজের মুখের উপর চেপে ধরল তার মুখ। শচী আঁচল দিয়ে নিমাইর চোখ মুছে দিল। কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল

কত রোগা হয়ে গেছিস বাবা? মুখখানা শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কত একা আর নিঃস্ব তুই। পৃথিবীতে কেন তোর কেউ আপনজন নেই! দেখলে কষ্টে বুক ফেটে যায়। তোর এই দশা আমি সইতে পারছি না!

শচীর কথা শুনে নিমাই স্বপ্নাতুর চোখে হাসল। সে হাসি বড় অদ্ভুত আর রহস্যময়। উদ্বিগ্ন স্নেহময়ী জননীকে একটু স্বস্তি ও সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল: পথ শ্রান্তির ক্লান্তিতে অনাহার জনিত কষ্টে দু'চোখে ঘুম নেমে আসছে। তুমি কিছু ভেব না। দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটা গভীর তৃপ্তির শ্বাস পড়ল শচীর। বলল: স্নান করে, দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নে বাপ। শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে। তারপর বিষ্ণুপ্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল: বৌমা, তুমি ওর স্নানের জল, গামছা গুছিয়ে দাও। আমি একটু পাড়ায় খবর দিয়ে আসি। কথাটা বলে শচী চলে গেল।

নিমাই ঘরে ঢুকলে বিষ্ণুপ্রিয়া মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আগ্রহের দীপ জ্বালিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইর নম্র শান্ত, স্নিগ্ধ দুই চোখের উপর চোখ রাখল। দামামার শব্দ বেজে যাচ্ছিল বুকের ভেতর।

নিমাই পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। হঠাৎ নিদারুণ একটা উপেক্ষায় আর অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন। হীনমন্যতার আত্মগ্লানিতে দুঃখে, কষ্টে বুকের ভেতর তার জ্বালা করতে লাগল। ভেতর তার অপমানে পুড়ে যাচ্ছিল। দীন এক অনুগ্রহ প্রার্থীর মত সসংকোচে গলবস্ত্র হল নিমাইর পদতলে। বিষ্ণুপ্রিয়া তার পায়ের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চোখের জলে নিমাইর পা দুটো ভিজে গেল। কয়েকমুহূর্ত পরে আবার বিষ্ণুপ্রিয়া তার অপর্যাপ্ত কোমল কৃষ্ণবর্ণ রেশমের মত চুল দিয়ে নিমাইর পা দুটো মুছিয়ে দিল। মাথা নিচু করে কান্না থরো থরো অস্পষ্ট গলায় বলল: প্রভু আমিই শুধু তোমার করুণা বঞ্চিত হয়ে থাকব?

নিমাইর বুক ভাসিয়ে নামল করুণা, দরদ, সহানুভূতি। সস্নেহে দু'হাত ধরে তাকে তুলল! তীব্র আনন্দে উত্তেজনায় বিষ্ণুপ্রিয়ার ভেতরটা কেঁপে গেল, প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানা। আর মুহূর্তে বদলে গেল সেই শোকম্লান বিষণ্ণ মূর্তি। তার সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বলতা।

অনির্বচনীয় সুখ আর পরিতৃপ্তিতে দেহ শিথিল হয়ে গেল। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত শক্তি ছিল না। নিমাইর দু'হাতের উপর তার শরীরটা তখন স্থির নিস্পন্দ। নিমাই শরীরের অসংখ্য ধমনীতে বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্তের দপ্‌দপানি অনুভব করল।

নিমাই একটু হাসল। অনাবিল প্রসন্নতার হাসি। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি এক গভীর দরদ আর সহানুভূতিতে তার বুকটা আর্দ্র হয়ে গেল। মধুর আর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল: বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার দুঃখটা আমি বুঝি। তাই কৃষ্ণপদে তোমাকে সঁপেছি। কৃষ্ণের করুণা থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। তুমি সুখী হবে। ধন্য হবে। আমার কি ক্ষমতা আছে তোমাকে করুণা করার? আমি তোমার করুণারও অযোগ্য। গভীর সহানুভূতির রসে ভিজিয়ে কথাগুলো বলল নিমাই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই চোখে বিস্ময়। তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে দিল চোখ দুটো জলে ভরে এল। ক্লান্ত, বিষণ্ণ শ্বাস পড়ল খুব ধীরে। বলল এ কথা বলছ কেন? আমার অন্তরের মধ্যে যে ধ্যানের দেবতা বসে আছে তার সব নির্দ্দেশ আমি শুনব। তোমার আদেশের ভাল মন্দ বিচার করার আমি কে? আমার দুঃখ শুধু এই যে তোমার এত কষ্ট আমায় দেখতে হচ্ছে। আমি যা পেয়েছি অতুলনীয়। আমার কোনো ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। শুধু দুঃখ আমি তোমার মনে কাঁটার মত বিঁধে আছি। আমার কথা তুমি আর ভেব না। তোমার সুখই আমার সুখ। তোমার আনন্দই আমার আনন্দ।

নিমাই হাসল। বড় সুখের সে হাসি। স্নিগ্ধ স্বরে বলল: আমি জানতাম, তুমি পারবে। তোমার নামের একটা গুণ'ত আছে।

গয়া থেকে নবদ্বীপে নিমাই এক অন্য মানুষ হয়ে ফিরল। ঈশ্বরপুরীর মন্ত্রের অর্থ তাব অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সে মনে মনে বিচার করে, বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগল। মনের বিবিধ অনুভূতির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সে মন্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যকে অন্বেষণ করতে লাগল। তাই সব সময় কেমন একটা পাগল পাগল উদ্‌ভ্রান্ত ভাব।

কিন্তু অনুভূতির মধ্যে তাকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে না পারার এক অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলল। কারণ এ ধরণের অভিজ্ঞতার জন্যে হয়ত কোনো ভাষা হয়নি। কিন্তু মন্ত্রটায় তার সত্তা মন্ত্রাবিষ্ট হয়ে

আছে। নিমাই বেশ বুঝতে পারছিল কে যেন তার সমস্ত মনটাকে নিজের অজান্তে বদলে দিচ্ছে। রোদের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে যায় তেমনি একটা রূপান্তর অনুভব করছে। সত্তার ভেতর কে যেন বলছে সত্যকে দেখ, সত্যকে দেখ।

সত্যকে দেখতে গিয়ে স্মৃতির দীপ জ্বলে উঠল প্রাণে। বিস্ময় লাগল ; লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু এবং তার স্মৃতিটা এখনও মন থেকে মুছে যায় নি। স্মৃতি-সূত্র ধরে অগ্রজ বিশ্বরূপের মুখখানা মনে পড়ল। সে তার বিস্ময়। তার প্রতি শ্রদ্ধার আসনটা হৃদয় জুড়ে পাততে না পাততে উধাও হয়ে গেল। সেই শূন্যতা কাটার আগেই পিতা মায়া কাটাল। এই পৃথিবীতে কিছু ধরে রাখার নয়। কিছুই থাকে না। তবু, মানুষ নিজেকে নিজে কষ্ট দিতে ভালবাসে। এই কষ্ট পাওয়ার কোনো মূল্য নেই। তবু ভারবাহী পশুর মত কষ্টের বোঝা সে বয়ে বেড়ায়। কেন ? মৃত্যুই কি জীবনের শেষ ? মৃত্যু মানে কি অন্ধকার ? এর উত্তর তার চাই। সত্য কি তাকে ভাল করে জানতে হবে। কিন্তু সেই ধারণাটা কিছুতেই স্বচ্ছ হচ্ছিল না।

সংসারের প্রতি, তার আকর্ষণ দিন দিন ক্ষীণ হতে লাগল। কিন্তু তার এই অতন্দ্র ব্যাকুলতা যা অহরহ কোন অকারণ বেদনায় অনির্দেশ অভিসারে বেরিয়ে পড়তে চায়, সে কি কখনও নিজের সুখের জন্যে হতে পারে ? না, আর কোন অবস্থান থেকে কোনো শক্তি তাকে ডাকছে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে। কি সেই অনির্দেশ আহ্বান ? এই পৃথিবীর মানুষের জন্যে যে তার কিছু করার আছে এরকম একটা অনুভূতি বাল্য থেকে তাকে জ্যোতির্ময় করে রেখেছে। গভীরের মন যেন বলে এ হল সেই আহ্বান। বিশ্বের কাছে যাওয়ার আমন্ত্রণ।

ঈশ্বরপুরীর দেয়া মন্ত্রের অর্থ একটু একটু করে তার কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল। টোলের পড়ুয়াদের পড়াতে গিয়ে পাঠ ভুলে নিমাই বলে, ভগবান স্বর্গের ধরাচূড়া পড়ে মাটিতে নেমে আসে না। মাটি যখন স্বর্গ হয়ে ওঠে তখন মাটির মানুষ তাঁকে দেবতার ধরাচূড়া পড়ায়। আসলে যাকে দেবতা বলি তিনি মানুষের সন্তান। মানবী মাতার মধ্যে দিয়ে তিনি সৃষ্টি হয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় কোনো সত্তা নেই। বিশ্ব সৃষ্টির আদি অনন্ত স্বরূপ হয়ে ঈশ্বর অন্তরে বিরাজ করছেন। তাঁকে শুধু চিনে নিতে হয়। মানুষের বোধ বুঝি এবং বিবেচনা'ত ভগবানকে জানার জন্য। কিন্তু তোমরা সেই অবাঙ্মনম-

গোচরকে চোখ বুজে অন্ধের মত ধ্যান কর, প্রার্থনা কর। কিন্তু তাঁর বিরাট প্রকাশকে অন্তরে কেউ উপলব্ধি কর না। এই মাটির পৃথিবীতে বিশ্বনিয়ন্ত্রা কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বও এল, পৃথিবীর মানুষ তার সঙ্গ পেল এমন কথা ভেবেছ কখনও? কৃষ্ণ বিরাট বিশ্বকে আমাদের একেবারে ঘরের কাছে এনে দিয়েছে। সেই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার মন্ত্র 'গোপীজন বল্লভায় স্বাহা'। এই গোপীজন কারা, জান? বৃন্দাবনের সাধারণ মানবকুল। যাদের কেউ ছিলনা, কিছু ছিল না। এরা এমনিতে ভীষণ নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ছা-পোষা মানুষ। তারা রাজনীতি, জনস্বার্থ কিছু বোঝে না। তারা জানে না কি চায় তারা?

পড়ুয়ারা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। কিছু বুঝতে না পেরে নিজেদের মধ্যে অধ্যাপককে নিয়ে হাসাহাসি করল। কিন্তু নিমাই এর কিছুই দেখছিল না। তার দুই চোখে সাধকের তন্ময়তা এবং বোজা। আপন মনেই নিমাই বলছিল, শ্রীকৃষ্ণ গোপীজন বল্লভ হল কেন? তিনি যে গোপীকুলের নয়নের মণি। কৃষ্ণ ছাড়া বৃন্দাবন যে অন্ধকার। গোপীজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের বিপন্ন, নিঃসহায়, গৃহহীন, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত মানুষের জীবনের সান্ত্বনা, আনন্দ, আশ্রয় এবং অবলম্বন। গোটা মথুরা বৃন্দাবনের মানুষ তার জন্যে কাঙাল। হবে না কেন বল? মথুরা বৃন্দাবনকে যে, কৃষ্ণ স্বর্গ বানিয়েছে। মানুষের যা কিছু সুন্দর মহৎ, সত্য ও শুভ তাই'ত মানুষের দেবত্ব। ঐ দেবত্বটুকু ব্যক্তির চরিত্রের শক্তি, অন্তরের সৌন্দর্য, তার মানসিক বল ও স্থৈর্য। কংসের অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস গোটা মথুরাবাসীর প্রাণে জাগাল কৃষ্ণ। কংসের রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করল, তার রাজশক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল-একি কম কথা।

ছাত্ররা নিঃশব্দে যে যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। নিমাই টের পেল না। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরছিল। টোলের সামনে থমকে দাঁড়াল। দেখল, ছাত্র নেই। টোল শূন্য। কিন্তু নিমাই আপন মনে চোখ বন্ধ করে পড়ুয়াদের পড়ানোর মত করে বলছে, কংসের সমর্থন পুষ্ট হয়ে যারা নির্বিচারে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছে সেই সব পাষণ্ডদের সে একে একে হয় বধ করেছে, নয় দমন করেছে। ভাবত, এটুকু ছেলের কি বিপুল শক্তি, অসীম সাহস আর তেজ।

বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাণ্ড দেখছিল। দেখে হাসি পেল না। চোখে জল এল। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। যে মানুষটাকে

সে চোখের সামনে দেখছে সে আর প্রকৃতিস্থ মানুষ নেই। পড়ুয়ারা পর্যন্ত তাদের অধ্যাপককে পাগল ভেবে ছেড়ে চলে গেছে। দুঃখে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। অঙ্গারের মত ধিক ধিক করে জ্বলছিল। সে আর স্থির থাকতে পারল না। নিজের অজান্তে তার ডান হাতটা নিমাইর পিঠের উপর উঠে এল।

নিমাই তার স্পর্শ মাত্র চমকে চকিতে লাফিয়ে উঠল। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন ভাবের ভেতর উল্লাসে সে চিৎকার করে উঠল, "সংসারিম্ সংহারিম্। মুক্তি নেই, মুক্তি নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভীষণ ভয় পেয়েছিল। নিমাইর হুংকারে তার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। আর তাতেই আঁচল থেকে কলসীটা পড়ল মাটিতে। নিমাইর গায়েও জলের ছিটে লাগল।

নিমাইর ঘোর কাটল কয়েকমুহূর্তে। সে ভীষণ লজ্জা পেল। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া তখন চোখের জলে দিশেহারা।

অপরাধ বোধে নিমাইর বুক টাটাতে লাগল। সংকোচে অস্ফুট স্বরে বলল : আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আসলে আমি যা কল্পনা করছিলাম, তা তোমার স্পর্শে প্রাণময় হয়ে উঠল। দেহমনে আমার স্বপ্ন এক আশ্চর্য অনুভূতি এনে দিল। সত্যিই তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া আমাকে তুমি পূর্ণ করতে এসেছ। এ জগতকে দেখার এক তৃতীয় নয়ন তোমার স্পর্শে লাভ করলাম। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।

কথায় যে এত সুধা বিষ্ণুপ্রিয়ার জানা ছিল না। কি এক অব্যক্ত অনুভূতি তার বুকের ভেতরে মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল। নিজেকে সে কিছুতেই শান্ত করতে পারছিল না, উত্তাল কান্নায় ভেঙে পড়ল। নিমাই অভিভূত। অজ্ঞাত গভীর থেকে এক আবেগ এসে তার মনোভূমির রুক্ষ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছিল। আর সে কেমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এক অপার্থিব মুগ্ধতায়। নিমাই মুগ্ধ কণ্ঠে বলল : আজ আমার কি ভাগ্য। কৃষ্ণ কথা শুনতে কৃষ্ণপ্রিয়া পেয়েছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থাকল নিমাইর দিকে। তারপর চারদিক চেয়ে দেখল। একটা বড় শ্বাস পড়ল আস্তে আস্তে। ভয় দ্বিধা সব বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে। বলল : তোমার কি হয়েছে বলত! সব সময় কি ভাব? ভীষণ অন্যমনস্ক? তোমার খুব কষ্ট তাই না?

নিমাই একটু হাসি হাসি মুখ করল। বলল : না। কষ্ট হবে কেন ? শুধু মনে হয় আমি যা করতে এসেছি তা যেন করা হল না। আমি যা চেয়েছি—তা যেন পাওয়া হল না। এটা বোধ হয় খুব স্বাভাবিক জিনিস নয়।

তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা হয়।

ভাবলে শুধু কষ্ট বাড়ে। ভাববে না। ভেবে কিছু সুরাহা হয় না। গ্যাখ না ঈশ্বরপুরীর মন্ত্র আমার চোখ খুলে দিয়েছে। এত দিন যে পথটা চিনতে পারিনি আজ সে পথের সন্ধান মিলেছে। পথের বাধাও কিছুটা দূর হয়েছে। কিন্তু ভাবনাটা রয়ে গেছে।

কিসের ভাবনা ?

তুমি শুনবে।

স্বামীর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন হাতে স্বর্গ পেল। মনে হল সে যেন খোলা বাতাসে এসেছে। তার বুকের কান্নাটা মুক্তি পেয়েছে। উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে বিহ্বল কণ্ঠে বলল : বল।

বালক কৃষ্ণের ভয়ে কংস বিব্রত, অসহায়, অশান্ত। আসলে এ হল কৃষ্ণের এক মহাজাল। শিশু কৃষ্ণের দাপটে কংস অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ ভাল করেই জানে তাকে বন্দী করলে কংসের গৌরব বাড়বে না। মর্যাদাও থাকবে না। কংস এক নিরুপায় রাগে অপমানে ছটফট করছে। হিংস্র রাগের জ্বালা জুড়োতে সাধারণ মানুষের উপর তার জুলুম অত্যাচার কেবলই বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার ফন্দী। কিন্তু গোকুলের মানুষ তাতে বিভ্রান্ত হল না। তাদের মনে তখন অন্য বিশ্বাস। স্বর্গে ভগবান বলে সত্যি কেউ আছে কিনা জানে না—কিন্তু গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভগবানের ঐশী শক্তিকে তারা প্রত্যক্ষ করেছে। কৃষ্ণ তাদের কাছে তখন জীবন্ত ভগবান। মানুষের এই বিশ্বাস, কংসের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করল। কংসের মনোবল ভেঙে পড়ল। তার সত্তা পরাজয়ের ভয়ে অস্থির হয়। অতবড় মহাবল দানবকে শেষে বালকের হাতেই জীবন দিতে হল। অথচ কি আশ্চর্য, এত বড় একটা মহা বিপ্লব করতে কৃষ্ণকে কোনো যুদ্ধ করতে হল না। রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে যেতে হল না। শুধু বুদ্ধি আর কৌশলে সে এক বিরাট জয় আদায় করে নিল। তার বিজয়ের মন্ত্র ছিল প্রেম। প্রেমের মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে তার বিশ্বকে, তার দেশকে, তার প্রিয়াকে। প্রেম সব কিছুকে নির্মল করে।

প্রেমের পরশে সব পবিত্র হয়ে ওঠে। প্রেমে কোনো ভেদাভেদ নেই। প্রেমে সকলে মিত্র হয়। শত্রুও আপন হয়। প্রেম হৃদয় অন্ধকারকে আলোকিত করে। বায়ুর মত হিল্লোলিত করে জীবনকে। প্রাণহীন দেশে একমাত্র মুক্ত প্রেমই বহিয়ে দিতে পারে আনন্দ স্রোত। একমাত্র প্রেমেই মানুষ ফিরে পায় আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস, নির্ভরতা, শক্তি।

শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ নিমাইর বুকের ভেতর ঢেউ দিয়ে গেল। গভীর সুখানুভূতির আবেগে নিমাইর দুই চোখ বুজে গেল। মুখ মণ্ডলে উজ্জ্বল হাসির দীপ্তিচ্ছটা। একটা মহৎ উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। নিমাই অনুভব করল তার মধ্যে এক দিব্য-শক্তি এসেছে। সে এমন একটা কিছু যাকে আগে কখনও অনুভব করেনি। অন্তরের মধ্যে হঠাৎ এই যে একটা বিপুল আবেগ সঞ্চারিত হল—এ জিনিষটা কি? বুকের ভেতর তার প্রেমময় কৃষ্ণের মধুর মুরলী ধ্বনি বাজতে লাগল। আর কল্পনায় বৃন্দাবনের বসন্তোৎসবের দৃশ্য দেখতে লাগল। রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তিতে দাঁড়িয়েছে উৎসবের মধ্যস্থলে। রাধাকৃষ্ণ দু'জনেই ধরে আছে মোহন মুরলী। কিন্তু বাঁশি বাজাচ্ছে কৃষ্ণ। দুই চোখ বন্ধ করে এক গভীর সুখানু-ভূতির আবেশে বিভোর হয়ে গেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেন কল্লোলিত হচ্ছে বাঁশির সুরে। গোটা নৃত্যস্থলী যেন সমুদ্রের দোলায় দুলছে। প্রত্যেকের জীবনের ভেতর এসে যেন ঢুকেছে তার স্রোত। মানুষের সব ব্যবধান গেছে ঘুচে। বহুকালের দেয়ালটা যেন দুকুল ভাসানো প্রেমের স্রোতে ভেসে গেছে। মুক্ত জীবন আর মুক্ত প্রেমের আশীর্ব্বাদ যেন দেবতার অকৃপণ দানের মত নেমে এসেছে বৃন্দাবন বাসীর জীবনে।

নিমাই নিজের মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সে নীরব নিস্পন্দ। তার স্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার বুক কেঁপে কেঁপে উঠল। বিব্রত ভয়ে সে তার দিকে চেয়ে রইল। সুতীব্র একটা কষ্টে তার বুকটা টাটাচ্ছিল। খুব কষ্টে নিজের হৃদয় বেগ দমন করল। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগার চমকানো বিস্ময়ে ডাকল: স্বামী। সন্ধ্যের অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে, ঘরে যাবে না?

নিমাইর উদাস চোখে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাজল কালো চোখের দিকে তাকাল। শিরশির করে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকের ভেতরটা। তার মুখে অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। চোখ নামিয়ে নিল।

নিমাইর চেতনার উপর নেমে এসেছে এক বিহ্বল স্বপ্ন। তন্দ্রাচ্ছন্ন

চেতনার ভেতর অস্পষ্ট কুয়াশার মত ফুটে উঠল শ্রীবাস অঙ্গনে উদ্দাম হরিনাম সংকীর্তনের দৃশ্য। আর কৃষ্ণনামের মাধুরী গায়ে মেখে মত্ত আবেগে তারা নৃত্য করে চলেছে। তার সত্তার গভীরে জ্বলজ্বল করতে লাগল বংশী-বদনরত কৃষ্ণের রূপ। কৃষ্ণ যেন নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। আর তার মৃদু মধুর সুর ধ্বনিত হচ্ছিল তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে। তার চেতনা কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল।

নিমাই আর বাঁশির সুর নয়, হৃদয়ের মধ্যে মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে হরি-নাম কীর্তন শুনছে। বাঁশীর সুরের সঙ্গে মৃদঙ্গের ধ্বনি যেন এক হয়ে গেছে। তাদের কোন তফাৎ নেই। ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল নিমাই। স্বপ্নাচ্ছন্নের মধ্যে বলল: কৃষ্ণের বাঁশির চুম্বক আকর্ষণ বৃন্দাবনের মানুষকে স্থির থাকতে দেয়নি। সব কাজ ফেলে, সব কিছু ছেড়ে তারা গৃহের বইরে যে বিশাল পৃথিবী সে দিকেই ছুটল। কোথায় চলেছে, কোথায় যাচ্ছে, এসব ভাববার, প্রশ্ন করবার অবকাশ পায়নি। তখন বেরিয়ে পড়াটাই ছিল সত্য। বিভেদের দেওয়াল ধ্বসে পড়ল, আড়াল গেল ঘুচে, পায়ের বাধা গেল সরে। মুক্ত দৃপ্ত মহাজীবনের প্রাণোল্লাসের এক স্বর্গ যেন নেমে এল সেখানে। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে গোপকুলের প্রাণের বীণায় বাজিয়ে তুলল রুদ্রের বীণা। তার ভেতর সৃষ্টিছাড়া ভৈরব জেগে উঠল। পায়ে জাগল ছন্দ, মুখে এগিয়ে চলার মন্ত্র। দেশের মানুষের চাওয়া বাঁশীর সুরের পাওয়ার সঙ্গে মিলল। গোটা বৃন্দাবন যেন অভিসারিকা রাধা।

বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইর খুব কাছেই ছিল। কথাগুলো তার বুকে মোহ সৃষ্টি করল। নিমাই নীরব। তার উদাস চোখ দুটো ঘনায়মান সন্ধ্যার আকাশের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে যেন নিজের স্বপ্নের ভেতর মগ্ন হয়ে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া বেশ বুঝতে পারছিল নিমাই আরো কিছু বলতে চায়, কিন্তু তার থৈ হারিয়ে গেছে। আর চোখের চাহনিতে কেমন একটা ব্যথায় নিবিড় হয়ে উঠল। বিষ্ণুপ্রিয়া তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, সহজ করে কিছু ভাবাটাই নিমাইর পক্ষে কঠিন। তাই সে একটু হেসে, গাঢ় স্বরে বলল: তোমার হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রাণমাতানো নৃত্যে, বাদ্যে, গানে আছে কৃষ্ণের বাঁশির মত আহ্বান করার শক্তি। মানুষকে নাড়া দেবার ক্ষমতা। হরিনাম সংকীর্ত্তন হল পথ চলার গান, মানুষকে ডাকার গান, এগিয়ে চলার মন্ত্র হল হরিনামৈব কেবলম্। এ শুধু পথ চলা নয়! এ হল জীবনের অভিসার।

নিমাই বুকের ভেতরটা উথলে উঠার ভাব। কিন্তু সে কথা বলতে পারল না। কেমন একটা মুগ্ধতায় তার দুই চোখ আবিষ্ট হয়ে রইল। আর তার অন্তরের ভেতর সমস্ত সত্তার ভেতর বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাগুলো দূরাগত দৈববাণীর মত স্নিগ্ধ গম্ভীর মধুর সুরে বাজতে লাগল। আর সে কল্পনায় দেখল কত লোক চলেছে দলে দলে খালি পায়ে। বিচিত্র ধ্বনি উঠছে বাতাস ভেদ করে। সে জয় ধ্বনি প্রতিটি মানুষের কানে এসে মন্ত্রের মত অভিভূত করে দিচ্ছে, যারা ঐ মিছিলে যোগ দেয়নি, তাদেরও মন টানছে নেমে যেতে। যারা তখনও দ্বিধা করছে, হরিনামের চুম্বক আকর্ষণ ব্যাকুল করে তুলেছে তাদের। তারপর দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ফেলে মানুষ একটা সমুদ্রে পরিণত হয়েছে।

॥ দশ ॥

গয়া থেকে ফেরার পর নিমাই এক অন্য মানুষ হয়ে গেল। আগে দেখা নিমাইরসঙ্গে তার কোন মিল নেই। এ যেন এক অন্য নিমাই। এই নিমাই নবদ্বীপের মানুষের চির অচেনা। তাই তার সর্ব কার্যে লোকের কৌতূহল। বিস্ময়ের অন্ত নেই। দলে দলে মানুষ ছুটে আসছে নিমাইকে দেখতে। নবদ্বীপে সে এখন সর্বাধিক দর্শনীয় মানুষ। হৃদয়ে শুদ্ধভক্তি সঞ্চার হলে কি ধরণের ভাবান্তর হয় নিমাইকে দেখে লোকে তা প্রথম অনুভব করল। একজন ভক্তের অবাঙ্মনসগোচর ভগবানের জন্যে চোখে যে এত জল, হৃদয়ে যে এত ব্যাকুলতা, কাতরতা, এত সকরুণ আর্তি থাকতে পারে তা ছিল মানুষের অকল্পনীয়। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণপ্রাণা প্রেমময়ী রাধা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল নিমাইর মধ্যে।

শান্তিপুরে বসে অদ্বৈতাচার্য বিশ্বম্ভরের এই বিস্ময়কর ভাবান্তরের সব খবরই পেল। যারাই তাকে দর্শন করছে, তারাই অবাক হয়ে গেছে। উদ্ধতের চূড়ামণি, দাম্ভিক, পাণ্ডিত্যাভিমানী বিশ্বম্ভর ভক্ত বিশ্বম্ভরে পরিণত। বিশ্বম্ভরের আকস্মিক ভাবান্তর, প্রেমোন্মাদনা অদ্বৈতাচার্যকে শুধু অবাক করল না, ভাবিয়ে তুলল। যে ধর্ম বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি ও

ভক্তি থাকলে মানুষকে ভক্ত বলা হয় বিশ্বম্ভরের মধ্যে তা ছিলনা। যা সে বিশ্বাস করত, যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করত তাই নিয়ে ছিল তার অহংকার, তার সংগ্রামের তৃপ্তি। তা-হলে, এ কোন নতুন জিজ্ঞাসায় আর্ত্ত হল তার মন? কার জন্যে তার অন্তরের এই ব্যাকুলতা? যে সমস্ত বিশ্বাস দিয়ে, অহংকার দিয়ে তার মনের জগৎটা গড়ে উঠেছিল সেখানে এই ভাঙনটা এল কোথা থেকে? ফাটলটা যে ঠিক কোথায় ধরেছে অদ্বৈতাচার্য তা ঠিকমত ধরতে পারছিল না।* তবে বড় একটা ওলোট-পালোট যে ঘটেছে তার অনুভূতির রাজ্যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে, যুগপৎ এমন আর্ত ও ব্যাকুল হত না। সে যা শুনছে তাতে এ ধরণের প্রেমবিকার কোন আস্থার বাইরে বস্তু হতে পারেনা। অন্তরে তার আয়োজন সুসম্পন্ন হলে তবেই বাইরের স্পর্শে তা উচ্ছ্বসিত হতে পারে।

অদ্বৈতের বুকের ভেতর গুর্ গুর্ করে উঠল। কত আশা, প্রত্যাশা নিয়ে বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! বিশ্বম্ভরের মুখে সে তার ধ্যানের দেবতাকে দেখে, তার অবতারীকে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রত্যয়টা বিশ্বম্ভরের মানুষকে আহ্বান করা এবং তার ভেতরটা নাড়া দেবার শক্তির থেকেই তার মনে জেগেছিল। মনে হয়েছিল, সে বিশ্বকে পথ দেখাতে এসেছে! অন্ধকারের ছায়া ভেবে সে মানুষকে ডাকছে। তার ডাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে গেছে তার দিকে। তাদের বদ্ধপ্রাণে যেন দখিনা বাতাস এসে লাগলো। অদ্বৈতাচার্যের নিজের প্রাণেও কি এক ব্যাকুল আর্তি জাগল। সে কি শুধুই আকাশ কুসুম কল্পনা? তার ভেতর কি কোন সত্য ছিল না? এক নতুন জিজ্ঞাসা অদ্বৈতের মনকে আর্ত্ত করল।

বুকের অভ্যন্তর থেকে সহসা শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল তার আকুল করা উত্তর—বিশ্বম্ভর কোন কাজটা না রহস্যের? এই অদ্ভুত আচরণেরও একটা মানে আছে। এটা নিশ্চয়ই তার কোন "মহাজাল", কিংবা "অপার চাতুরী" কিছু।*

থেকে থেকে অদ্বৈতাচার্যের মনে হতে লাগল, বিশ্বম্ভর তার আচরণ দিয়ে

*পরম অদ্ভুত কথা, মহা অসম্ভব।
নিমাইঞি পন্ডিত হইলা পরম বৈষ্ণব॥

—চৈতন্য ভাগবত

হয়ত কিছু বোঝাতে চাইছে। কিন্তু সেটা অব্যক্ত বলেই এত রহস্যময়।

পূজায় বসে অদ্বৈতাচার্য স্থির মনে দেব ভজনা করতে পারল না। ক'দিন ধরেই মনটা তার ভীষণ অশান্ত এবং অস্থির। শুধু বিশ্বম্ভরের কথা ভেবে মনটা তার বিচলিত অস্থির হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি বিচলিত করছিল তার নিজের অনুরাগীদের কয়েকজনের বিশ্বম্ভরের বিরোধিতা। মদনমোহনের প্রাণহীন পাথরের মূর্তির সামনে চোখ বুজে ধ্যান করার সময় অদ্বৈতাচার্যের বারবার ধ্যান ভেঙে যাচ্ছিল। দৃষ্টিপথে দেশ শাসনের জটিল সব সমস্যা যেমন প্রতিভাত হচ্ছিল তেমনি মানসপটে মৌন গম্ভীর ভাবাবেশ বিভোর মুদিত আঁখি বিশ্বম্ভর এসে দাঁড়াল।

তথাপি, অদ্বৈতাচার্য নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা শেষ করল। তারপর প্রণাম করতে যাবে, এমন সময় মন্দিরের বাইরে থেকে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ আচার্য, আমি এসেছি।

দীপশিখার মত কেঁপে উঠল অদ্বৈতাচার্য। আর প্রণাম করা হল না। বুকের ভেতর আনন্দে মথিত হতে লাগল। চমকানো বিস্ময়ে আবেশ বিভোর গলায় অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ বি-শ্ব-ম্-ভর-অ। দেহ মন জুড়ে এক আশ্চর্য ঝংকারে বেজে যাচ্ছিল সুরের তরঙ্গ। কতদিন বিশ্বম্ভরকে দেখে না। অদ্বৈতাচার্য আর স্থির থাকতে পারল না। পড়ি-মরি করে মন্দিরের দ্বার খুলে বাইরে এল।

বিশ্বম্ভর চুপ করে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। কপালে একটা চন্দনের টিপ। টিপ পড়ে তাকে পবিত্র দেখাচ্ছে। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ঘেরা তার সুন্দর মুখের উপর প্রভাতের আলো পড়েছে। কি সরল নিস্পাপ তার আলোয় ধোঁয়া মুখ। উজ্জ্বল চোখ দুটিতে সাধকের তন্ময়তা। অদ্বৈতাচার্যের শরীরের ভেতর শির শির করে উঠল। গায়ে কাঁটা দিল।

আগ্রহের দীপ জ্বালানো স্নিগ্ধ দুটি চোখে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতাচার্যের দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অদ্বৈতাচার্য আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। এই অনুভূতির উৎস তার শরীরে, না মনে বিচার করার মত মনের অবস্থা ছিল না। শুধু মনে হল, সে ডুবে যাচ্ছে কোন অতলে।

বেশ কিছুক্ষণ নিমাইর স্নিগ্ধ চাহনির অপরূপ স্পর্শটা অদ্বৈতাচার্যের মনে লেগে রইল। শুধু দৃষ্টিপাত মাত্র এরকম একটা প্রতিক্রিয়া শরীরের ভেতর কেমন করে হল? এই বিস্ময়টা যতক্ষণ তার মনে ছিল ততক্ষণ সে একটিও

কথা বলতে পারলনা।

অদ্বৈতাচার্য নীরব। নিস্পন্দ। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেবতার আশীর্বাদের মত রোদ এসে পড়েছে! রোদের আলপনা আর আঁকিবুঁকি ছড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে, মন্দিরের প্রাঙ্গনে। ভারী সুন্দর আবহ রচনা করেছে।

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতাচার্যের দিকে চেয়ে একটু হাসল। ভারী সুন্দর দেখাল তাকে। গম্ভীর গলায় বলল ঃ আচার্য, গয়া থেকে কবে ফিরলাম, সেখানে কিরকম কাটল, এ সব'ত জিগ্যেস করলেন না।

অদ্বৈতাচার্য একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ল। একটু বিব্রত বোধ করল। লজ্জায় তার মুখ তাম্রাভ হয়ে গেল। ভিতরকার অস্বস্তিতে তার গলা শুকিয়ে গেল। বেশ কয়েকবার ঢোক গিলে বলল ঃ তোমার সব খবরই আমি পাই।

তোমার খবর এত বেশি রাখি যে, তুমিও তা জান না।

নিমাই একটু হাসল শুধু।

অদ্বৈতাচার্য বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলল ঃ তোমার কি হয়েছে বলত?

আমার কি হবে আবার?

আমাকে তুমি লুকোতে পারবে না। অন্যদের মত আমি তোমাকে বাইরেটা দেখি না, তোমার ভেতরটা, তোমার আত্মাকে দেখি। যেখানে তুমি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখ। বোধ হয়, নিজের কাছ থেকে নিজেকেও লুকিয়ে রাখ।

নিমাই বিস্ময়ে চমকে উঠল।

অদ্বৈতাচার্য তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ঃ বিশ্বম্ভর, তুমি আমাকে আর ফাঁকি দিতে পারবে না। একদিন আমার স্বপ্নলব্ধ মদনমোহন মূর্তি সম্পর্কে তুমি বলেছিলে, ওটা নিছকই মনের ব্যাপার। ওর ভেতর কোন সত্য নেই। কাকতালীয় ভাবে স্বপ্নটা বাস্তবে ফলে গিয়েছিল। আজ বিষ্ণু পাদপদ্মে দিনদুপুরে জাগ্রত অবস্থায় অসংখ্য লোকের মধ্যে তুমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলে, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

নিমাইর অধরে হাসির নির্ঝর। বলল ঃ এটাও আমার মনের ব্যাপার। আমার স্বপ্ন। কিন্তু একেবারে অলীক নয়। কোথায় একটা সত্য লুকোন আছে। মনের ভেতর আমি তাকে নতুন করে আবিস্কার করছি।

আবিস্কার করে তুমি পেলে কি ?

মনে মনে সত্যিই একজনকে খুঁজছি আমি।

কে সে ?

ভাবি, সে ঈশ্বর। কিন্তু কেমন সে জানি না। তবু হিন্দু'ত। হিন্দুর পৌত্তলিক বিশ্বাস যাবে কোথায় ? ঈশ্বরের এক কাল্পনিক মূর্তি দেখলাম মনের ভেতর। কিন্তু বিচারক মনটা কিছুতে মেনে নিল না। মনের'ত একটা প্রবোধ দরকার। নইলে যে সর্বহারা হয়ে যাই। তাই তাকে খুঁজছি মনের অভ্যন্তরে।

অদ্বৈতাচার্য হাসল। বলল : এই হল মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, আর মনের সংস্কার। একে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু ভাঙা যায় না। তুমি নাস্তিক্য দিয়েও তোমার মনের সত্যটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

নিমাই ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ অদ্বৈতাচার্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দুই চোখে তার কি গভীর তন্ময়তা। স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে আস্তে আস্তে বলল : আচার্য, গয়া না গেলে ভারতবর্ষকে দেখা হত না। আমার প্রথম ভারত দর্শন হল গয়ায়। দেশ দেশান্তরের বহু ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে এবং ভারতবর্ষকে দেখলাম। কী ভীষণ ধর্মান্ধ এই দেশ। একটা গণ্ডীর মধ্যে পাক খাচ্ছে। তার বাইরেও যে একটা বিশাল পৃথিবী আছে তার ডাক এসে পৌঁছয় না তাদের অন্তরে। এই জিজ্ঞাসা মনকে আর্ত করল। নিজেকে আমার জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে, বিশাল ভারতবর্ষের মানুষ তাদের সকল বৈচিত্র আর বিশ্বাস নিয়ে মিলিত হচ্ছে কোন আশায় ? সবাই'ত আসে মুক্তি চাইতে, মুক্তি পেতে। কিন্তু কার মুক্তি তারা চায় ? মৃত ব্যক্তির আত্মার, না তার নিজের ? ধর্মান্ধতাও এক ধরণের মৃত্যু। এই ভয়ংকর মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে অব্যহতি পেতেই যেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ দলে দলে ছুটে আসছে অসুরের সমাধি ক্ষেত্রে। অমৃতের সন্ধানে। যে অসুর নিজ পুণ্যবলে মাটির পৃথিবীকে স্বর্গ করেছিল, অমৃতের সন্ধান দিয়েছিল। মহাসুপ্তি থেকে তাকে জাগানোর প্রার্থনা নিয়ে যেন মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে এখানে আসছে, আমার অনুভূতির জগতে বিপ্লব ঘটে গেল। মানুষের মুক্তি আকৃতি আমার চোখের সামনে খুলে দিল এক নতুন দিগন্ত। আমার জন্মান্তর হল। অন্তরের ভেতর মুক্তির তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে ফিরলাম। এই ব্যাকুলতা বোধ হয় প্রেম। প্রেমের আলো সবচেয়ে

জ্যোতির্ময়। আমার সমস্ত মনটাকে বদলে দিচ্ছে।

অদ্বৈতাচার্য মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল তার কথা। বিস্ময়ে দুই চোখ তার সুনিবিড় হয়ে উঠল। এক অনির্বচনীয় আনন্দে মনটা ভরে গেল। বুকের ভেতরটা তার কেঁপে গেল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল এক অশুভ চিন্তা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল: বিশ্বম্ভর তোমার আগমনের কারণ বললে না'ত?

নিমাইর মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতা নেমে এসেছে। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেছে তার চেতনা। তার সমস্ত চেতনার উপর নেমে এসেছে বিহ্বলতা। তন্দ্রাভিভূতের মত নিজের মনেই বলল: লক্ষ হাত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কৃষ্ণের হাতছানির অর্থটা বুঝতে পারি। ভারতাত্মা কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে আমাকে ডাকছে, সে ডাক ভুলে আর ঘরে তিষ্ঠতে পারছি না। বেরনোর জন্যে মন আমার উন্মুখ হয়ে আছে।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! মনে মনে বারবার বলল অদ্বৈতাচার্য। বিস্ময়ের ঘোর তার আর কাটতে চায় না। এক পরিপূর্ণ আনন্দে তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে লাগল। কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপর মুখ তুলে তার শ্রীময় মুখখানা ভরে একটা ভারী সুন্দর হাসি হাসল। বলল: অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু হরিনাম সংকীর্তন এক শ্রেণীর মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তারা নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। অপপ্রচার, অনাচার, কুৎসা প্রচার করে বৈষ্ণবদের অতিষ্ঠ করে তুলছে। শাক্তেরা হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ করার জন্যে রুদ্ধদ্বার গৃহের সামনে মদ্য, মাংস, রেখে দিয়ে, বৈষ্ণবদের অপমান করছে! মুসলমানরা মৃদাঙ্গ করতাল সহযোগে নৃত্য ও গানে বাধা সৃষ্টি করছে। এই রকম একটা তীব্র বিরোধিতার মুহূর্তে বিরাট কিছু করার আগে চিন্তা ভাবনা আবশ্যক।

আচার্য, আমার হৃদয় কোন বাধা মানছে না। সর্বদা মনে হয়, ঈশ্বর ধর্মান্ধতার অভিশাপ থেকে ভারতভূমিকে মুক্ত করার এক মহান দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে। নইলে, এমন হয়ে ছুটে আসব কেন?

এমন সময় সেখানে একা হরিনাম কীর্তন করতে করতে এক দীর্ঘদেহী যুবা প্রবেশ করল। বিস্ময়ে নিমাইর দু'চোখে পলক পড়ে না। অপলক দুটি চোখ তার চোখের উপর পেতে রাখল।

যুবকের দীপশিখার মত গৌরবর্ণ তনুদেহে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের মাধুর্য, বড় বড় আধবোজা দুই চোখে সাধকের তন্ময়তা কেমন সুদূর উদাস দৃষ্টি। এই পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে এক অনন্ত আনন্দ লোকের অপার মহিমায় নিমগ্ন সেই আশ্চর্য প্রশান্ত সৌম্য মূর্তির দিকে বিভোর নয়নে তাকিয়ে রইল নিমাই। নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে বলল: আচার্য। এঁকে'ত চিনলাম না। ইনি কে? কোথায় বাস?

যুবকের মধ্যে এমন একটা সহজ সরল অস্পষ্ট ভাব আছে যে, অদ্বৈতাচার্য কিছু বলার আগেই সে চটপট বলল: আমি নিত্যানন্দ। বারো বছর বয়স থেকে তোমাকে খুঁজছি। ভারতবর্ষের কত দেশ ঘুরলাম, কত বিচিত্র মানুষ আর ধর্ম দেখলাম। কিন্তু যাকে খুঁজছি তার দেখা পেলাম না কোথাও। উনিশ বছর পর তার দেখা পেলাম নবদ্বীপে। নিত্যানন্দের চোখ ছল ছল করল। বড় একটা শ্বাস ফেলে থমথম গলায় বলল: তুমিই আমার সেই। কত কষ্ট দিয়েছ আমাকে। নিত্যানন্দ সহসা বালকের মত আকুল কান্নার ভেতর তলিয়ে গেল।

নিমাইর ভেতরটা অধীর হল। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে নিত্যানন্দকে বুকে চেপে ধরল। আশ্চর্য সেই শারীরিক অনুভূতি। মনে হল, সহসা স্বর্গ থেকে কোন দেবতা এসে যেন তার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছে। যা কিছুতে শেষ হতে চায় না, যার আনন্দ বা বেদনা কিছুতে ফুরোয় না। মনের ভেতর তার স্পর্শ সুখ অনেকক্ষণ লেগে রইল।

নিত্যানন্দকে দেখেই নিমাই তার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝল এই সাধু মানুষটির ভেতর এমন একটা চমৎকারিত্ব এবং অসাধারণত্ব আছে যে তাকে সহজে ভোলা যায় না। তার ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণে, হৃদয় মুগ্ধ হয়, চিত্ত চঞ্চল হয়। তার অকপট সারল্য এবং মধুর বচন বড় উদ্দীপিত করে। নিতাইকে এক ঈশ্বর প্রেরিত মানুষ মনে হল। আর কেমন একটা অনাস্বাদিত পূর্ব সুখের অনুভবে তাকে বুকের মধ্যে আরো নিবিড় করে টেনে নিতে লাগল। আনন্দে, মুগ্ধতায় নিমাইর দু'চোখ বুজে গেল। বুকের ভেতর তখনও নিতাই মধু নিঃসৃত কণ্ঠের বাণীগুলো দূরাগত মন্ত্রের মত নিঃশব্দে গুঞ্জিত হতে লাগল। আচ্ছন্ন গলায় বলল: তোমাকে পেয়ে আমি সম্পূর্ণ হলাম। কৃষ্ণ বলরামের মত আমি তুমি অভিন্ন। আমরা এক শক্তির প্রকাশ। তুমি আমার বলরাম।

নিমাই নিত্যানন্দকে অগ্রজের সম্মান দিয়ে তৎক্ষণাৎ তার হৃদয় জয় করে নিল। তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। নিত্যানন্দ অনুভব করল তার বুকের মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেছে, সে এমন একটা কিছু যাকে আলিঙ্গনের আগে কখনও অনুভব করেনি। এ অনুভূতিটা তাহলে কি? নিজের মনের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে মনে হল, এতকাল সে ঘুমিয়েছিল। সহসা ঘুম থেকে জেগে উঠল যেন। হঠাৎ কেন যেন বিদ্যুত চমকের মত তার বুকের ভেতরটা উদ্ভাসিত হল, কৃষ্ণের পথেই মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরবে। তবে কি নিমাই তাকে সেই অভিষেক করল? বুকের ভেতর শির শির করে উঠল নিত্যানন্দের। জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পরিবর্তন বোধ অন্তরে জাগল কেন? কেমন হয়ে গেল নিত্যানন্দ। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল: তোমার হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার আগে পৃথিবীর এত মধুর হয়ে উঠেনি কখনও। এখন আমার সকল আবেগ, ভালবাসা যেন বলরাম হয়ে উঠছে।

নিমাইর চোখে অপরূপ মুগ্ধতা। মুখে পূর্ণতার হাসি।

অদ্বৈতাচার্যের বুকে সমস্ত ঘটনাটা এক মোহ জাগাল। প্রাণের গভীরে কিসের হর্ষ যেন ঝর্ণার মত এক দুরন্ত গতিতে তাকে নিয়ে চলেছে অন্য এক অপার্থিব অমরলোকে। তার ভেতরটা চিন চিন করছিল আনন্দে। সে আর স্থির থাকতে পারল না। নিমাই নিত্যানন্দকে দু বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কত স্বপ্ন দেখি। তোমাকে নিয়ে কত কথা ভাবি। আজ মনে হচ্ছে আমার চাওয়া সার্থক হয়েছে। মহাকালের ঘণ্টা বেজেছে। কৃষ্ণ বলরাম এক হয়েছে। আমার ভাবনা গেল ঘুচে। নবদ্বীপের মাটিতে পড়েছে, আমার অবতারী কৃষ্ণের পায়ের ধূলো। ওরে, কে কোথায় আছিস, সবাই হরি ধ্বনি কর।

নবদ্বীপের আকাশ বাতাস হরিনামে মুখর হল। জাত-পাতের বেড়া ভেঙে গেল। মানুষের মধ্যে ছোট বড়, উচ্চ নীচ, অধম-অস্পৃশ্য বলে কিছু থাকল না। হরিনামে সকলের অধিকার। সকলে অমৃতের সন্তান। সকলে এক ঈশ্বরের স্নেহ ধন্য। সকলেই মানুষ। গুণ ও কর্ম-অনুসারে মানুষের মধ্যে দুটো শ্রেণী আছে—সৎ আর পাষণ্ড। পাষণ্ডরা নিমাইকে সহ্য করতে পারল না। তার হরিনাম সংকীর্তনকে ভাল মনে গ্রহণ করল না। ভাল চোখে দেখল না। নিমাইকে তারা হিন্দু ধর্মের শত্রু ভাবল।

নিমাই হিন্দুধর্মের ক্ষতি করছে। সে মূর্তিমান বিদ্রোহ। হিন্দুধর্ম সংহার করতে এসেছে। হরিসংকীর্তনের নামে ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য, অবহেলিত মানব-সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস তার সংস্কারকে আঘাত করছে। তার আশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, যুক্তিতর্ক অসামাজিক কার্যকলাপ, অধার্মিক আলোচনা সমাজের এবং মানুষের কোন উপকার করবে না। সমাজের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণাগুলিকেও সে উল্টে দিতে পারবে না। কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের উন্মাদনায় সস্তা লোক ক্ষেপানো জনপ্রিয়তা অর্জন করে সহজ সরল মানুষগুলোকে ধর্মের নামে অধর্মেতে মাতিয়ে তুলেছে। আর অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস এর মত কয়েকজন সরল ধর্মপ্রাণ ভক্ত বৈষ্ণবকে বিভ্রান্ত করে, মায়ায় মোহাচ্ছন্ন করে লোকদের বিপথগামী করছে। সুতরাং, সমাজে এই ধরণের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয়া আর উচিত নয় বলে মনে করল গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং শাক্তরা। তারা একজোট হয়ে নবদ্বীপের নগরপালদ্বয় জগদানন্দ এবং মাধবানন্দর সমীপে উপস্থিত হল।

ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি হয়ে শ্রীভট্ট বলল : আমাদের জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে নিমাইকে এতদিন আমরা নাস্তিক, দাম্ভিক, উদ্ধত বলে জেনে এসেছি। গয়া থেকে ফিরে সে মহাবৈষ্ণবের ভেখ ধরেছে। হিন্দুধর্মের সমূহ ক্ষতি করছে। ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য, মুসলমান সকলকে নিয়ে একটা খিচুরী ধর্ম আর খিচুরী সমাজ বানাচ্ছে। তার কাঁচা বয়সের পাগলামিতে হিন্দুধর্ম রসাতলে যেতে বসেছে। এখনও সময় আছে। আমরা আপনার হস্তক্ষেপ চাই।

উপস্থিতরা একযোগে মাথা নাড়ল। সমস্বরে বলল : আমরা হস্তক্ষেপ চাই। আপনি বিহিত করুন।

অভিযোগকারীদের মধ্যে বয়স্ক এক শাক্ত ব্রাহ্মণ কাঁপা গলায় ভাঙা স্বরে বলল : জগদানন্দ, যা করবে বাপু খুব ভেবে চিন্তে কর। ছেলেটি বয়সে কাঁচা, কিন্তু বুদ্ধিতে পাকা। আট-ঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে। সহজে ঠেকাতে পারবে না।

মাধবানন্দ হঠাৎ প্রশ্ন করল—কি রকম।

দ্যাখ, সমাজে যাদের আমরা বেশি শ্রদ্ধা করি, মান্য করি, সেইসব পণ্ডিত এবং বিদ্বানজন নিমাই বলতে অজ্ঞান। এতগুলো জ্ঞানী গুণী, নামী দামী ব্যক্তিকে বশ করা, বোকা বানানো সহজ নয়। লোকে শুধু নিমাইকে দেখে নয় এদের দেখেও ছুটে আসছে। বলতে কি এঁরাই চুম্বক। এঁদের না

পেলে নিমাইর এতবড় বিজয় হত না। শুনতে পাচ্ছি, শ্রীহট্টের পুণ্ডরী বিদ্যানিধির মত পণ্ডিত, ধনী-বিলাসী, আরাম প্রিয় জমিদারও স্বেচ্ছায় সব কিছু ত্যাগ করে নিমাইর অনুগামী ও অনুরাগী হচ্ছে। এ কি কম কথা।

আরো ভাববার আছে। ব্যাস পুজায় নিমাইর নেতৃপদে অভিষেক হয়েছে। সেখানে অদ্বৈতাচার্য নিজে থেকে তাকে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে। সমস্ত বৈষ্ণবরা নিমাইকে তাদের নেতা মেনে নিয়েছে।

জগদানন্দর মুখ থেকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হুঁস শব্দ বেরোল। তারপব প্রসঙ্গটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল : একদিন বাগ্দীদের মেয়ে বিধবা হরিমতীকে মাধবের দলবলের হাত থেকে উদ্ধার করে নিমাই তাকে এক বৈষ্ণব বণিকপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। তার সে অপমান আমি ভুলিনি। বোধ হয় মাধবের মন থেকেও মুছে যায়নি তার ক্রোধ।

সে কথা শুনে মাধবানন্দ মাথা নাড়ল। চোখে মুখে তার ক্রোধের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। ভুরু কুঁচকে গেল। পিঠ টান টান করে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্য করে বলল : বিদ্রোহ! বিপ্লব! এসবের মানে কি? উন্মাদের মত দু'হাত উর্দ্ধে তুলে নাচলে আর বেসুরো গলায় হাউ হাউ করে হরিনাম করলে কি স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হয়? শুধু নাচন-কোঁদন করে কি মানুষের এতকালের সমাজটাকেও বদলে দেওয়া যায়?

উপস্থিত অভিযোগকারীরা তার বক্তব্যকে সমর্থন করল একসঙ্গে। বটেই'ত। কখনই না। নিমাইর সঙ্গে আমাদের নমস্য বিদ্বজনেরাও পাগল হয়েছে। পাগল ছাড়া কোন সুস্থ মানুষ পথে ঘাটে অমন লম্ফ ঝম্ফ করতে পারে না।

বয়স্ক ব্রাহ্মণ বলল : ঈশ্বরেতে পাগল হলেই আর লজ্জা থাকে না। শুচি অশুচি থাকে না।

মাধবানন্দ একটু হেসে বলল : নিমাইতে আপনি পাগল হয়েছেন।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল বৃদ্ধের। বলল : পাগল আর হলাম কৈ? শাক্তের অহংকার, বংশ গৌরবের অভিমানই ছাড়তে পারলাম না। নিজেব চারপাশের গণ্ডীটাকেও ভাঙতে পারলাম না। আমি পাগল হব কেমন করে? বৈষ্ণবের ব্যাকুলতা আমার কোথায়?

বৃদ্ধের কথায় কেউ কান দিল না। জগদানন্দ তার কথার ভেতর প্রশ্ন করল : আপনাদের খুশির জন্যে আমি কি করতে পাবি।

উপস্থিত ব্রাহ্মণদের ভেতর থেকে একজন বলল : আপনি নগরপাল। আপনার অনেক ক্ষমতা। নগরের শান্তি রক্ষার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারেন।

জগদানন্দ হেসে বলল : বেশত, কি করলে সমাজের মঙ্গল হয়, সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষা পায়—বলুন।

ব্রাহ্মণের মুখে হাসি ; অভিব্যক্তিতে দ্বিধা ও সংকোচ। জগদানন্দের মুখের দিকে চেয়ে কাপড়ের খুটো আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল : মানে বলছিলাম, কাজী যদি শয়তানদের ধর্মচ্যুত করে—তাহলে

জগদানন্দ একটু হেসে বলল : তা-হলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়—তাই-না ?

লোকটি খুশিতে বিগলিত হয়ে বলল : আপনার অনুমান যথার্থ।

জগদানন্দ এবং মাধবানন্দ দু'জনে অবাক বিস্ময়ে ব্রাহ্মণের দিকে চেয়ে হাসল। দু'জনে খানিকক্ষণ নীরবে গড়গড়া টানতে লাগল চোখ বুজে। আর প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করছিল অভিযোগকারীদের মধ্যে কেউ হয়ত এ কথায় আপত্তি করবে। কিন্তু সময় বয়ে গেল। কেউ টুশব্দ করল না। কিন্তু জগদানন্দর বুক জুড়ে একটা ঘৃণা রাগ আর ধিক্কারে ঝড়ে বয়ে যাচ্ছিল। সে কিছু সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। অনেকক্ষণ গরগর করে ধূমপান করল। আর ভাল লাগছিল না। বিরক্তিতে লম্বা নলটাকে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল : আমি খুব ভাল লোক নই। কিন্তু আপনাদের মত নীচ না। নিমাইকে আমি পছন্দ করি না। সে আমার পয়লা নম্বরের শত্রু। তবু তার বিপক্ষে এত বড় কঠিন কথাটা আমার জিভে আসত না। ব্যাপারটা সত্যিই বড় লজ্জার। ভাবতেও ঘৃণা করে। যাই হোক, আমি দেখছি, কি করতে পারি। আপনারা আসুন।

নিমাই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝল হিন্দুধর্ম এবং মন্দির ধ্বংসকারী মুসলমান রাজশক্তি এবং প্রশাসকের সংগে সংঘাত অনিবার্য। খুব বেশিদিন এই সংঘাত এড়িয়ে হিন্দু অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয় ! মুসলমান রাজশক্তির প্রবল হিন্দু বিদ্বেষ হিন্দু ধর্মের প্রতি বৈরীতা এবং ইসলাম ধর্মের উগ্র সম্প্রসারণ নীতি নব নব সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। সংঘাতের জন্যে যারা তৈরী, যাদের নীতি হল সংঘাত বাড়ান, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ

নিরস্ত্র, সম্বলহীন জনতার সম্ভব নয়। এমন কি মুখোমুখি সংঘাত অনিবার্য হলেও সে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মুখে নিরস্ত্র মানুষকে ঠেলে দেয়া যাবে না: তবে জনগণ যে দুর্বল নয়, জনতা যে একটা বিরাট শক্তি এবং তাকে উপেক্ষা করে যে রাজশক্তি টেকে না এ রকম একটা অবস্থা সম্বলহীন মানুষদের নিয়ে করা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু তার জন্যেও প্রয়োজন সুচতুর পরিকল্পনা। প্রতিপক্ষ রাজশক্তি আঘাত হানার আগেই তার মনের অভ্যন্তরে এক সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। রাজশক্তির যারা প্রধান, যাদের বুদ্ধি ও পরামর্শে রাজাকে চলতে হয়, কৌশলে তাদের নিষ্ক্রিয় বিচ্ছিন্ন এবং অকেজো করে রাখা হল রাজশক্তি পঙ্গু করার নীতি। সকলের অগোচরে নিমাই তার একটা ছক মনে মনে তৈরী করে অগ্রসর হল। কিন্তু কাকপক্ষীতেও জানতে পারল না তার মনেব অভিপ্রায়।

নীতির সফল রূপায়ন করতে নিমাই শ্রীবাস অঙ্গনে রুদ্ধদ্বার গৃহে অদ্বৈতাচার্যর সংগে তার শলা পরামর্শ করল। চাপা স্বরে বলল: আচার্য, কীর্তনকে আর রুদ্ধ ঘরে আটকে রাখা ঠিক হবে না। ঈশ্বরও বোধ হয় চায় না। জগদানন্দ মাধবানন্দর আদেশে রুদ্ধ ঘরে কীর্তন যখন বন্ধ হয়েছে তখন আমরা তাকে পথে নিয়ে যাব। কীর্তনের দ্বার তাতে উন্মুক্ত হবে। কীর্তনে সকলের অধিকার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা তার আদর্শ নজির তৈরী করতে পারিনি। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের দোর গোড়ায় পেঁছে দেয়ার জন্যে একে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। অকৃপণ হস্তে সকলকে বিলিয়ে দিতে হবে তার বীজ মন্ত্র হরিনামের কেবলম্। সংকীর্ণতা এবং গোষ্ঠীবদ্ধতার গণ্ডী থেকে কীর্তনকে নিয়ে যেতে হবে বিশাল প্রাঙ্গনে। আরো অধিক সংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করা দরকার। সংকীর্তনের ব্যাপ্তি ও বিশালতাই এনে দিতে পারে ধর্মান্ধতার মুক্তি। আপনার অনুমতি পেলে এই দায়িত্ব অগ্রজ প্রতিম নিত্যানন্দ এবং যবন হরিদাসের উপর দিতে পারি। এরা দুজনেই পারে কুল ভাসানো প্রেমের বন্যায় নদীয়া ভাসিয়ে দিতে। হরিদাস কীর্তনের পুরোভাগে থাকলে অন্ত্যজেরা আস্থাবান হবে। ধর্মান্তরিত হিন্দুরাও পুনরায় স্বধর্মে ফেরার প্রেরণা পাবে। ধর্মান্ধতায় ঘৃণায় অবহেলায় একদিন যাদের হারিয়েছিলাম প্রেমে তাদের আপন করে ফিরে পাব। এতে বৈষ্ণবধর্মের যেমন গৌরব বাড়বে তেমনি হিন্দুধর্মের রক্ষা কবচ হয়ে সংকীর্তন মানুষকে প্রেমে ঐক্যবদ্ধ করবে। মুসলমান রাজশক্তিও কখনও বৈষ্ণবদের শত্রু ভাববে

না, সন্দেহের চোখে দেখবে না। বৈষ্ণব ধর্ম প্রেমের ধর্ম। প্রেমে পর আপন হয়। শত্রু মিত্র হয়। প্রেমে কোন ভেদ নেই। সূর্যের আলোর মত সর্বব্যাপী এবং অকৃপণ।

অদ্বৈতাচার্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিমাইর দিকে চেয়ে রইল। চুপ করে থাকলেই কক্ষের নিস্তব্ধতা আরো ভয়ংকর আর দুঃসহ হয়ে উঠে। মুগ্ধ বিভোর অদ্বৈতাচার্য সেই নিস্তব্ধতাকে অনুভব করল গভীরভাবে। নিমাই তার তদ্গত ভাব লক্ষ্য করে সতর্ক ভাবে চুপ করে থাকল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কয়েকটা মুহূর্ত লাগল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল: তোমার স্বপ্ন এত বিশাল যে তাকে অনুভব করার শক্তি আমার নেই। এমন করে চিন্তা করতেও অভ্যস্ত নই। তাই এর ভাল-মন্দ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু মনটা অরুণরাগে রাঙিয়ে যাচ্ছে। ভেতরটা ঢেউ দিয়ে যাচ্ছে। তাই কিছু না বুঝে তোমার কল্পনাশক্তিকে আঘাত করা কিংবা তার মন গড়া বিচার করা ঠিক হবে না। আগে মনের ভেতর ভাবরূপ জাগে তারপরে তা মূর্তি পায়। প্রতিমা গড়া পটুয়ায় কাজ, তেমনি পটুয়ার শিল্পী সত্তারই ধ্যান প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। তুমি তোমার নিজের বিশ্বাস ও পথে এগিয়ে যাও। আমি তোমার দীপবর্তিকা বহন করে নিয়ে যাব।

নিমাই একটু হাসল, বলল: আচার্য, আমি চাইলাম জল, আপনি দেখিয়ে দিলেন পুষ্করিণী।

অদ্বৈতাচার্য একটু অপ্রতিভ হাসল। তারপরেই মুখখানা গম্ভীর ও বিষণ্ণ হল। বলল: আমি দুরন্ত জগাই মাধাইর কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষদের সংগ্রামের যে নয়া ইতিহাস তুমি তৈরী করছ তার প্রথম অধ্যায়ের সুরটা যদি স্বেচ্ছাচারী ব্যাভিচারী প্রমত্ত নরাধমদের দ্বারা বিপন্ন হয় তা-হলে এত বড় একটা উদ্যোগের ব্যর্থতার কি সান্ত্বনা থাকবে, বল।

আপনার আশংকা মিথ্যা নয়। কিন্তু হতাশ হয়ে বসে থাকলেও'ত পারি না। কিছু একটা করতে হবে। কাজ শুরু করলে তার উপায় হবেই। চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা আপনা থেকে জেগে উঠবে।

তবু, আদর্শের জন্যে হাজার হাজার মানুষ খালি হাতে একদল হিংস্র পশুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়বে?

নিমাই চুপ করে ছিল। তারপর, বেশ একটু চিন্তা করে গম্ভীর গলায়

বলল ঃ তবু এই বাস্তব অবস্থা থেকে পালানোর কোন রাস্তা আমাদের নেই, দেশের বুক থেকে পাষণ্ডদের অত্যাচার নির্মূল করতে, হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে জগাই-মাধাইকে দরকার। তাদের না পেলে বৈষ্ণবদলের হৃদয় বিজয়ের অধ্যায় সমাপ্ত হবে না। নদীয়া অধিকার অসমাপ্ত থেকে যাবে। আচার্য আপনি মিছে ভাবছেন, একজন পাষণ্ডর হৃদয় পরিবর্ত্তন করতে যদি না পারি, তা-হলে কিসের বৈষ্ণব আমরা?

অদ্বৈতাচার্যের মুখে সহসা কথা যোগাল না। অপলক স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলল ঃ তোমার কথার রহস্য ভেদ করতে পারলাম না। তাদের মত পাষণ্ড তোমার কোন কাজে লাগবে?

আচার্য, জগাই-মাধাইকে বাইরে থেকে যত খারাপ বলে মনে হয়, তত খারাপ তারা নয়। তাদের ভেতর মনুষ্যত্বের মৃত্যু হয়নি এখনও। একটু কেউ চাইলে তারা আবার মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে। তাদের হৃদয় পরিবর্ত্তন করা কিছু শক্ত কাজ নয়। বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণায় সে দীক্ষিত হলে নদীয়ায় আর কোন পাষণ্ড আমাদের বিরোধিতা করবে না। এ হল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি। এর ফলে, কাজীর আস্ফালন, ও হুমকি কমবে। তার ডান হাতখানা ভেঙে দেয়া হবে। জগাই-মাধাইকে বশীভূত করতে একা নিত্যানন্দই যথেষ্ট, তবু হরিদাস থাকবে তার সাথে।

অদ্বৈতাচার্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ তোমার সাহস ও বুদ্ধির প্রশংসা করি। ইচ্ছা পূর্ণ হোক তোমার।

জগদানন্দ রাতে বাগানবাড়ীই থেকে যায়। আর গৃহে ফেরে না। সুন্দরী মদনমালতীতে নিবিড় আশ্লেষে পেয়েও তার তৃষ্ণা মেটে না। আকণ্ঠ সুরা পান করেও তৃপ্তি হয়না তার। বেহুঁশও হয় না। চোখে ঘুমও আসে না। সারারাত ধরে মদনমালতীর শয্যায় শুধু এপাশ ওপাশ করে। কাক-ভোরের দিকে একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সুরা ও ললনাপ্রিয় জগদানন্দের এ ধরণের পরিবর্তন মদনমালতীকে বিস্মিত করল। আজকাল তার প্রতি নগরপালের তেমন কৌতূহল কিংবা মনোযোগ নেই। তার এ ধরণের অদ্ভুত আচরণে মদনমালতী কৌতুক বোধ করল। নিজের মনেই হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল। বড় সুন্দর তার হাসি। যখন হাসে তখন মনে হয়, পাহাড় ভেঙে ঝর্ণা যেন ছুটছে। বুকের

ভেতর নূপুরের মত বেজে যায় ভীষণ ঝংকারে। যে কোন পুরুষের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। বুকে লাগে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। সেরকম একটা হাসিতে মদনমালতী উচ্ছল হল। নিস্তব্ধ রাতের সে হাসিতে জগদানন্দের ভেতরটা কেঁপে গেল। তার মৌনতা ভঙ্গ হল। উদাস গম্ভীর গলায় বলল: সুন্দরী মদনমালতী তোমার মত হৃদয় উজার করে হাসতে পারি না বলেই জীবনটা দুর্বিষহ বোঝার মত মনে হয়। জীবনটা বড় একঘেয়ে আর নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এর ভেতর কোন আনন্দ নেই, চমক নেই। একটা অভ্যাসে গা ভাসিয়ে চলা। খেলনা দিয়ে শিশুকে ভুলিয়ে রাখার মত আমার অবস্থা। বৈচিত্রহীন জীবনে বৈচিত্র খুঁজতে পদমর্যাদা, অর্থ, ঐশ্বর্য, নারী, সুরা কত কি চেয়েছি। সব পেয়েছিও। লোকে আমাকে ভয় করে, সমীহ করে, সম্মান দেখায়। তাদের তোষামোদ পেতেই অভ্যস্ত। আমার অনুগ্রহ কৃপায় তারা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করে। এসব পেয়ে লোভী হয়ে উঠেছি। মনেতে অন্ধকার জমেছে। কিন্তু সেই অহংকারের দুর্গে আজ কথাটা বলতে গিয়ে আটকে গেল। যন্ত্রণামথিত একটা দুরন্ত কষ্টে সে মাথা নাড়াল। চুপ করে থাকল। কিন্তু অস্বস্তিটা কাঁটার মত বিঁধে রইল।

মদনমালতী বুকের নিচ থেকে তাকিয়াটা টেনে সরাল। একটা পাক খেয়ে জগদানন্দের বুকের উপর মাথা রেখে তার দিকে মুখ করে শুল। তার দিকে মুখ করে মুখের খুব কাছে মুখ এনে বলল: নগরপাল, আজ আপনাকে বড় সুন্দর লাগছে। এমন করে কথা বলতে শুনিনি কখনও। মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটা বড় ব্যথা লেগেছে। আর সে ব্যথা বড় প্রিয়জন দিয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস চাপা দিল জগদানন্দ। ভিতরকার অপমানে বুকের ভেতরটা তার পুড়ে যাচ্ছিল। নিজেকে তার বড় অসহায়, অবসন্ন আর ক্লান্ত লাগছিল। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে টান ধরল। খুব ক্লান্ত এবং বিমর্ষ গলায় চমকানো বিস্ময়ে বলল: মদনমালতী তুমি ঠিক বলেছ। আমার এক বড় শত্রু আমাকে অপমান করেছে। আমার পরোয়ানাকে সে পরোয়াই করল না। অথচ দুর্দ্দান্ত, জগাই-মাধাইর নির্দ্দেশ অমান্য করার সাহস নবদ্বীপের কারো কোনদিন ছিল না। আমার সেই অহংকার ভেঙেছে। না, এ আমি কিছুতে সহ্য করব না, কিছুতেই না।

মদনমালতী ভুরু টানটান করে অবাক হওয়ার ভান করল। বলল:

এতবড় স্পর্ধা কার? এই স্পর্ধা দেখানোর সাহস তাকে কে দিল?

জগন্নাথের ভেতরটা কেঁপে গেল ভীষণ। চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল: সত্যিই'ত স্পর্ধা দেখানোর সাহস তাকে কে দিল? ভূরু কুঁচকে গেল জগদানন্দের। বুকটা কেমন করছিল। বারংবার মনে হতে লাগল, এই স্পর্ধাটা দেখানোর সুযোগ নিমাইকে কে দিয়েছে? একদিন তাদের শৈথিল্য এবং দুর্বলতা নিমাইর এই সাহস বাগ্দীপাড়ার সুন্দর শ্রীময় হরিমতীর মুখখানা মনে পড়ল। হরিমতীকে নিমাই তার লোকজনের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। মান সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয়ে নিমাইর সঙ্গে কোন বিরোধে যায়নি। মুখ বুজে সয়ে গিয়েছিল। এটাই হয়েছিল তাদের সবচেয়ে ভুল। নিমাই তাদের এই নীরবতাকে দুর্বলতা মনে করছে। তাদের কঠোরতার সামান্য শৈথিল্যের রন্ধ্রপথ দিয়ে নিমাই তার স্পর্ধা নিয়ে মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। আচমকাই কথাটা মনে হল তার। কথাটা ভেবে চিন্তান্বিত হল জগদানন্দ। বুকটা কেমন দুর, দুর করে উঠল। অস্বস্তিকর উত্তেজনায় বিছানার জাজিমে হাতটা ঘষতে ঘষতে বলল: অনেকদিন আগে একটা ভুল করে একজনকে শাস্তি দেয়া হয়নি। মাধাই চেয়েছিল। আমি চাইনি! আমার সেই মস্ত ভুলটার আজ প্রায়শ্চিত্য করার দিন।

মধুমালতী জগদানন্দর বুকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তার মুখের উপর মুখ রাখল। গণ্ডে, খালি বুকের উপর মুখ ঘষল, ঘ্রাণ নিল। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিল। তার সমস্ত দেহ দিয়ে জগদানন্দের বিরাট বপু সাপ্টে ধরে বলল: নগরপাল আপনার কাছে আমি কি ফুরিয়ে গেছি, আমাতে কি আপনার রুচি নেই, মন নেই। আমার বেপরোয়া, দুরন্ত, দুর্দ্দান্ত ভয়ংকর নগরপালকে এরকম বিমর্ষ দেখলে ভাল লাগে না। মদনমালতীর গলার স্বর ভিজে গেল। চোখের কোণে জল টল টল করে উঠল। বলল: নগরপাল আপনার কি হয়েছে? এমন উতলা কেন? আপনাকে কখনও উদাসীন হতে দেখিনি। আপনার কষ্ট দেখলে আমার বুকটা কেমন কেমন করে, সেকি আপনি বোঝেন না?

জগদানন্দর মুখে কষ্টের হাসি। বলল: জানি সুন্দরী।

সব জেনেও আপনার কষ্টের কথা বলতে কষ্ট হয় কেন?

লজ্জায়, দুঃখে, রাগে আমার কণ্ঠ থেকে স্বর বেরোয় না! আমার অহংকার নিমাই চূর্ণ করে দিয়েছে। আমার নিষেধ সত্ত্বেও তার দলবল

আমারই বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে নেচেছে গেয়েছে। সে সময় আমরা দু'ভাই কেউ বাড়ী ছিলাম না। তার এই অপমানটা কিছুতে ভুলতে পারছি না। নিয়ম ভাঙার এত বড় সাহসটা সে কোথা থেকে পেল? এ তার অঘোষিত বিদ্রোহ। নিয়ম কানুন ভেঙে গোটা হিন্দু সমাজটাকে সে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। এ তার সহ্য হচ্ছে না। তার ঐ শিকল ভাঙার গান হরিনামেব কেবলম্ আমি বন্ধ করব। দরকার হলে নবদ্বীপের মাটি রক্তে রাঙা করে দেব।

বাইরে ভোর ভোর ভাব।

আচমকা জগদানন্দ শুনতে পেল বহুদূর থেকে অনেকগুলো মানুষ যেন গলা মিলিয়ে হরিনাম করতে করতে আসছে। জগদানন্দ উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা বোবা বিস্ময় নিয়ে শুনতে লাগল অনুচ্চারিত অস্পষ্ট সেই কোলাহল। ভয়ে ভাবনায় তার মুখখানা ছাইর মত সাদা হয়ে গেছে। ভয়ার্ত গলায় আস্তে আস্তে বলল: রাত্রির আর কত বাকি আছে মদনমালতী।

মদনমালতী একটু অবাক হয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল: অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। এক রহস্যময় আলোর দ্যুতিতে আকাশ ছেয়ে গেছে। ভোর হতে আর দেরি নেই।

জগদানন্দ আর বসল না। কথাও বলল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মদনমালতী জানতেও পারল না।

এক প্রহর বেলা।

বড় রাস্তার উপর জগাই মাধাইর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। মুখে হরিনাম করতে করতে সেই পথেই এগিয়ে চলল নিত্যানন্দ এবং হরিদাস। জগাই মাধাইর গৃহের সম্মুখেই তারা বিপুল উদ্দামে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করল। তীব্র হয়ে উঠল করতালের ঝংকার, আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে জাগল উদ্দামতা। নিত্যানন্দ হরিদাসের বুকের রক্তের কলধ্বনিতে বাজতে লাগল বিচিত্র সেই ঐক্যতানের সুমধুর মূর্ছনা। তীব্র একটা আবেগের ঢেউ লাগল তাদের শরীরে। প্রাণের আবেগে দু বাহু উর্দ্ধে তুলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সর্বস্ব নিবেদন করে তারা দু'জন ঘুরে ঘুরে উদ্দাম গতিতে নাচতে লাগল আর সুমধুর স্বরে গাইতে লাগল: ভজ শ্রীকৃষ্ণ, কহ শ্রীকৃষ্ণ, লহ শ্রীকৃষ্ণের নামরে। দর্শকদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে উত্তেজনার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। কারো পা আর বশে রইল

না। নদীর মত তরঙ্গায়িত হয়ে সকলে নাচতে লাগল পাগলের মত। উঠল বিপুল জনতার শরীর। উতরোল হয়ে উঠল মৃদঙ্গ করতালের ঝংকার।

কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর তলিয়ে গিয়েছিল জগাই-মাধাইর চেতনা। কিছুক্ষণ বোধ হয় তারা মানুষ ছিল না। বিস্মৃতি ঘটেছিল। তাদের সত্তার ভেতর চেতনার ভেতর জ্বল জ্বল করেছিল শুভ্র মনুষ্যত্ব আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

থামল সংকীর্তন। নিশি পাওয়া মানুষের মত কেমন একটা আচ্ছন্নতা নিয়ে জগাই-মাধাইর দিকে চেয়ে রইল নিত্যানন্দ।

জগদানন্দ মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্লান্ত। সে আর পারছিল না। ঝড়ো একটা বাতাসের মত তীব্র বেগে সে নিত্যানন্দের দিকে ছুটে গেল। মাধবানন্দ ক্রোধে দিশেহারা হয়ে কক্ষের দিকে ছুটে গেল। হাতের কাছে কিছুই না পেয়ে একটি সুদৃশ্য নক্সা কাটা সুবর্ণ ভৃঙ্গার পাত্র ছুঁড়ল নিত্যানন্দকে তাক করে।

আ-আ-হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় মর্মান্তিক আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কপাল কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়াল। টকটকে তাজা রক্তে গৌরবর্ণ মুখ বুক ভেসে গেল।

ঘটনাটা এতই আকস্মিক এবং দ্রুত ঘটে গেল যে মাধবও পর্যন্ত ভাবনার অবসর পায়নি। চতুর্দিক থেকে একটা মার মার শব্দ উঠল। মাধব খুব ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু বিপদে সাহস হারাল না। অবিচলিত ধৈর্য, সংযমই তখন তার একমাত্র ভরসা। যদিও ভেতরটা তার ভয়ে ভীষণ কাঁপছিল।. পা পর্যন্ত বশে থাকছিল না। দিশেহারা ভয়ে তার মুখ ছাইর মত সাদা হয়ে গেল।

খবরটা বাতাসে রটে গেল। মত্ত মাতঙ্গের মত নিমাই ছুটে এল। ভিড় ঠেলে নিত্যানন্দর সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই বুকের ভেতর থেকে একটা কান্নার ঢেউ পাক দিয়ে উঠল। তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদল। প্রাথমিক আবেগটা কেটে যাওয়ার পর একটু শান্ত হল নিমাই। কিন্তু ভেতরটা তার দুরন্ত রাগে তেতে উঠল। মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। জনতার দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে জগদানন্দ মাধবানন্দকে খুঁজল। নিত্যানন্দের শিয়রের ধারে তার ম্লান মুখে নত মস্তকে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দেখে নিমাইর শান্ত স্নিগ্ধ চোখের কৃষ্ণতারা দুটি

যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল নিমাই। আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে বলল: তবে রে পাষণ্ড—বলে, তাদের দিকে ধেয়ে যেতে নিত্যানন্দ তার হাত চেপে ধরল। ব্যাকুল কণ্ঠে মিনতি করে বলল: না, না কিছুতে না। তুমি ক্ষেপে গেলে প্রলয় ঘটবে। ধৈর্য ধর। সহিষ্ণুতা বৈষ্ণবের ধর্ম। বৈষ্ণবের প্রেমে বিদ্বেষ, রোষ থাকতে নেই। তুমিই আমাকে শিখিয়েছ প্রেম গভীর হলে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলে দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা, আঘাত, এমন কি মৃত্যুকেও কত সহজে হাসিমুখে তুচ্ছ করা যায়।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল নিমাই। আর যাওয়া হল না। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। মুখের ভাব বদলে গেল। চোখের চাহনি স্নিগ্ধ ও সুন্দর হল। জগদানন্দর দিকে চেয়ে শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় দৃঢ় স্বরে বলল: বৈষ্ণবের ক্ষমা কত সুন্দর দেখেছ! অথচ তোমরা এত নিষ্ঠুর যে, এই নিরপরাধ প্রেমের কাঙালকেও তোমরা আঘাত করতে ছাড়নি অথচ দ্যাখ, সেজন্যে তোমাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ কিংবা রোষ নেই। হৃদয়ভরা কত করুণা থাকলে মানুষ প্রতিহিংসা ভুলে এমন ক্ষমা করতে পারে।

নিমাইর কথাগুলো জগদানন্দের বুকের ভেতর ঢেউ দিয়ে গেল। শীতল হাওয়ার মত শির শির করল। মনে হল, একটা বড় কিছু ঘটবে তার অন্তঃ-রাজ্যে। নিত্যানন্দের রক্তমাখা মুখখানা তার সব গণ্ডগোল করে দিল। একটা দুরন্ত অপরাধবোধে, অনুশোচনায় তার বুক টাটাচ্ছিল। আর্ত স্বরে বলল: ভুল হয়ে গেছে। অপরাধ করেছি।

মাধবানন্দ একটু বিব্রত হল। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। গলাটা সামান্য নামিয়ে বলল: ও কেন নিয়ম ভাঙল?

নিমাইর ভুরু কুঁচকে গেল। অবাক বিস্ময়ে উচ্চারণ করল: নিয়ম ভাঙল? কে? তুমি, না-ও। তোমরা ঘরের ভেতর কীর্তন করতে নিষেধ করেছ। তাই, ওরা পথে কীর্তন করছে। পথে কীর্তনত নিষিদ্ধ নয়। তোমরা ভেবেছ কি?

মাধবানন্দ একটু ফাঁপরে পড়ল। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল। বলল: তুমি আমাদের ভাবিয়ে তুলেছ। হিন্দুধর্ম রসাতলে যেতে বসেছে।

নিমাই বিকৃত মুখ করে বলল: রসাতলে যাচ্ছে এর জন্যে দায়ী তোমরা। জাতিভেদ-বর্ণভেদ, জাত-পাত, ছোট-বড়র বিরোধ সৃষ্টি করে হিন্দু সমাজটাকে

ভেঙে টুকরো টুকরো করে রেখেছ। এক ধর্মের, এক ভাষার, এক জায়গার মানুষ হয়েও আমরা কেউ কারো নই। আমাদের মধ্যে মিল নেই, ঐক্য নেই। থাকবে কোথা থেকে? তোমরা যে ঐক্য চাওনি। কেউ চাইলে কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে সহ্য করতে পার না। সব হারানোর আতংকে গেল গেল করে উঠ। অথচ আমরা সবাই মিলে যদি একটু ঐক্য সংহতি, চাইতাম, যদি একটু উদাব, সহানুভূতিশীল হতে পারতাম তা-হলে মুসলমানরা এমন করে হিন্দুদেব ধর্মচ্যুত কবতে পারত না। আমাদের জাত্যাভিমান, বর্ণাভিমানের দুর্বলতার রন্ধ্র পথ দিয়ে শনির মত তারা আমাদের সব কেড়ে নিচ্ছে। আর আমরা তাব নীরব দর্শক হয়ে আছি। চমৎকার!

মাধবানন্দ মুগ্ধ চোখে নিমাইকে দেখছিল। কথাগুলো তার গায়ে কাঁটা দিল। জগদানন্দ মাধবানন্দ পরস্পরের দিকে তাকাল। দু'জনে চুপচাপ সম্মোহিতের মত নিমাইর চোখের উপর চোখ পেতে রাখল। বুকের ভেতর দামামাব মত বাজছিল প্রতিহিংসাপরায়ণ এক অভিযোগকারী ব্রাহ্মণের উক্তি "নগরপাল, কাজীকে দিয়ে অপকর্মেব গুরু নিমাইকে ধর্মচ্যুত করলে সনাতন হিন্দুধর্ম-রক্ষা পায়।" জগদানন্দের ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মত অবস্থা। দু'চোখে তার সুদূর স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। প্রতিশোধে, বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে মানুষ কত নিচে নেমে যায়, কত নির্লজ্জ আর হীন হয়ে যায় তার চেয়ে বেশি একথা কে জানে? নিমাইর কথার ভেতর যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবু চোখ থাকতেও তারা অন্ধ। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু এরাই। এদের পায়ের তলায় মাটি নেই বলে, বিরাট করে কিছু ভাবতে পারে না। জগদানন্দের মনে হল সে যেন এদের সঙ্গে একটু একটু করে অতল একটা খাদের গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। আর পাপ মিথ্যে, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ নীচতা, শত্রুতা সব যেন এক একটা অতিকায় দৈত্যের মত সেই খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর, নিষ্ঠুর অট্টহাসি হাসছে। সে যেন শুনতে পাচ্ছে দিগন্ত জুড়ে সেই ভয়ংকর হাসি। মস্তিষ্কের মধ্যে সেই শব্দ তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁদ্ধ হতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে মাথাটা চেপে ধরল। তীব্র একটা আবেগে বুকের ভেতরটা পাক খেয়ে কণ্ঠে উঠে এল। নিদারুণ ব্যাথায় বুকের ভেতর টন টন করতে লাগল। তবু মুখ ফুটে কথা বেরোল না। এক অবোধ রহস্যময় অনুভূতিতে তার চিত্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল।

জনতা নীরব।

নিমাই গভীর দৃষ্টিতে জগদানন্দ মাধবানন্দর দিকে চেয়ে রইল। ব্যথিত হয়ে বলল: মাধবানন্দ, আমাদের মধ্যে বিরোধ থাকার কথা নয়। কিন্তু বিরোধটা কেউ কেউ রাখছে তাদের স্বার্থে। সমাজের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা এই বিভেদকামী শক্তিগুলো সম্পর্কে আমাদের সতর্ক ও সজাগ হওয়ার সময় হয়েছে। চোখ খুলে দেখ আর মন দিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ কর, তা-হলে সব রহস্য পরিষ্কার হবে ভাই। মনে প্রাণে যারা হিন্দু, তারা একবার মুসলমান হয়ে গেল বলে, আর নিজের ধর্মে ফিরতে পারবে না এ কেমন কথা? এই সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি থাকবে কেন? আমরা সবাই একটু উদার হলে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের নিজের ধর্মে ফেরার কোন বাধা হত না। মনটাই সব। নিত্যানন্দ, হরিদাস'ত মানুষকে সে কথা বোঝাতে চাইছে। তা-হলে তাদের অপরাধ কোথায়? মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, তাকে আকর্ষণ করা, তার শুভবুদ্ধির উদয় ঘটানোর কর্মসূচী কি ভাবে হিন্দু ধর্মকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে, বল। হরিনাম'ত হিন্দু ধর্মে ফেরার বাণী।

নিত্যানন্দ বলল: তুমি একবার আমাদের সঙ্গে বল; ভজ শ্রীকৃষ্ণ, কহ শ্রীকৃষ্ণ, লহ শ্রীকৃষ্ণ নাম'রে।

নিত্যানন্দের মুখখানা তাদের সম্মোহিত করল। অহংকার ভেসে গেল। রাগ, ঘৃণা অনুশোচনায় হৃদয় জল হয়ে গেল। জগদানন্দ নিত্যানন্দের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলল: কহ শ্রীকৃষ্ণ, লহ শ্রীকৃষ্ণ নাম রে। নিত্যানন্দ গভীর প্রেমে জগদানন্দের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। আকুল কণ্ঠে কেঁদে বলল: ঠাকুর অপরাধ হয়েছে। ভীষণ অপরাধ করেছি। আমাদের ক্ষমা কর।

নিত্যানন্দ বলল: আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একবার হরিবল, একবার কৃষ্ণ বল—সব পাপ, দুঃখ, অনুশোচনা দূর হয়ে যাবে। অপরাধ বলে মনে আর কিছু থাকবে না।

মাধবানন্দর নিজেকে বড় একা লাগল। মনে হল, নিমাই তার এক বিরাট সাম্রাজ্য জয় করে তাকে ভিখারী করেছে। জগদানন্দ যে তার বুকের আধখানা। তাকে ছেড়ে থাকবে কেমন করে? মনে হতে লাগল, নিমাই তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। সে আর স্থির থাকতে পারল না। শূন্যতায় পাগল হয়ে গিয়ে নিমাইর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। বলল: আমাকেও করুণা কর।

আশ্চর্য! নিমাইর কোন ভাবান্তর হল না। মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে বলল: তুমি'ত আমার কাছে কোন অপরাধ করনি। তোমাকে মার্জনা করার আমি কে? নিত্যানন্দ তোমাকে করুণা করলে তুমি করুণার যোগ্য হবে সকলের।

নিত্যানন্দর মুখখানা কেমন করুণ হয়ে উঠল। মাধবানন্দর যে দুটো চোখে একটু আগে 'আগুন জ্বলছিল সেই দুই চোখ এখন অনুশোচনায় আর্ত্ত। মাধবের সেই দানব মূর্তি কোথায় হারিয়ে গেছে! তাকে কেমন রিক্ত অবসন্ন মনে হল। জল ভরা দুটো চোখে তার করুণ মিনতি। আর সেই দুই চোখে দৃষ্টিতে, মুখাবয়বে গ্লানির অপচ্ছায়া আর কৃতকর্মের অনুশোচনা। তাকে দেখে নিত্যানন্দর বুকটা কেমন করে উঠল।

মাধবানন্দ জগদানন্দর দিকে তাকাল। দু চোখে তার বিহ্বলতা। যেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের সিংহদ্বার অতিক্রম করে এক অমরাবতীতে পেঁছে গেছে। স্নিগ্ধ প্রশান্তি মাখানো তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

মাধবানন্দ। পরিতৃপ্তির হাসি ফুটল তার অধরে। মৃদু ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে জগদানন্দ তাকে ডাকল! আয় ভাই। বড় শান্তি পাবি।

অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে মাধবানন্দ নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করল। আর অদ্ভুত আশ্চর্য একটা অনুভূতিতে তার শরীর মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিগলিত কান্নার স্বরে বলল: অজ্ঞ আমি। না জেনে অপরাধ করেছি। আমাকে তুমি কৃপা কর। তোমার চরণে ঠাঁই দাও। তুমি আমাদের দু'জনের গুরু হও। তোমার মন্ত্র আমাদের জপমন্ত্র হল।

জনতার সব গরীব দুঃখী মানুষ চারদিক থেকে ভীড় করে মন্ত্র মুগ্ধের মত সেই মিলন দৃশ্য দেখল।

খুশির রঙ লাগল নিত্যানন্দের মুখে। নিমাইর গোল মুখখানা প্রাপ্তির পর্যাপ্ত সুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাপ্ত করতে পারার আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল তার মন।

তারপর জগদানন্দ এবং মাধবানন্দকে পুরোভাগে রেখে বিরাট জনতা সহ নিত্যানন্দ, হরিদাস নিমাই মিলে গোটা নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করল। নবদ্বীপের মানুষ অবাক হয়ে দেখল মাধবানন্দ জগদানন্দর সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে হরি নাম সংকীর্তন করছে নিমাই, নিত্যানন্দ হরিদাস। সমস্ত জনতা একই সুরে গাইল: ভজ শ্রীকৃষ্ণ, কহ শ্রীকৃষ্ণ, লহ শ্রীকৃষ্ণ নামরে। সেই অমৃতময় প্রেমের

গানের আকর্ষণে অচল জন সমুদ্র যেন সহসা সচল হয়ে উঠল।

নিমাইর এত বড় একটা জয়কে বিরোধীরা ভাল মনে নিল না। কিন্তু কি করবে ভেবেও পেল না। নিমাই যে ভাবে জাত-পাতের বেড়া ভেঙে মানুষের যুগযুগান্তর ধরে গড়ে উঠা বিশ্বাস ও সংস্কারের দুর্গে হানা দিয়েছে তাতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। শুধু অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক নয়, যারা এক কালে ধর্মান্তরিত হয়েছিল তাদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফেরার পথ উন্মুক্ত করে দিল। যবন হরিদাসকে সামনে রেখে তাদের আকর্ষণ করতে লাগল। হিন্দুর হিন্দুয়ানির গর্বের কিছু রাখল না নিমাই। এইভাবে আর কিছুদিন চললে ব্রাহ্মণদের কেউ শ্রদ্ধা ভক্তি করবে না। তাদের মান্য করবে না। ব্রাহ্মণেরা বড় বিপন্ন ব্যেধ করল। বর্ণভেদ, জাতিভেদ এর প্রয়োজন ও প্রয়োজনীয়তার এমন গভীর করে আগে কখনও অনুভব করেনি। নিমাই, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণ সমাজের এত বড় একটা ক্ষতি করবে কেউ ভেবে পেল না। যাই ঘটে থাকুক, এখন তার একটা বিহিত করা দরকার। যে করে হোক, সনাতন হিন্দুধর্মের রীতি, নীতি, আচার প্রথাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই ব্যাপারে নবদ্বীপে প্রশাসক চাঁদ কাজীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করতে দল বেঁধে তারা সিমুলিয়ায় কাজীর প্রাসাদে গেল নিমাইর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে।

সুসজ্জিত সভাগৃহে কাজী ব্রাহ্মণদের মুখোমুখি বসে তাদের অভিযোগ শুনতে লাগল। জনৈক ব্রাহ্মণ বলল: নবদ্বীপের প্রতিরক্ষক আপনি। আমাদের শেষ ভরসা। আপনার অনুগ্রহ না পেলে সনাতন হিন্দুধর্মকে নিমাইর হাত থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। নবদ্বীপের মানুষকে সে জাদু করেছে।

কাজী কুটিল হেসে বলল: কিন্তু এ হল হিন্দুদের ঘরোয়া বিবাদ! আমি বিধর্মী, মুসলমান। আপনাদের ঘরোয়া ঝগড়ায় মাথা গলানো আমার উচিত কাজ হবে না।

একজন ব্রাহ্মণ মাথা নাড়ার সঙ্গে টিকিটা জোরে জোরে আন্দোলিত করে বলল: না, না। আমরা আপনার কোন ওজর আপত্তিই শুনব না। বেটা নিমাইকে যে করে হোক একটা শিক্ষা দিতেই হবে। ও হল নাটের গুরু। আপনি শুধু ওকে একটু জব্দ করুন।

অন্য এক ব্রাহ্মণ বলল ঃ আপনি এদেশের শাসক। আপনার কাছে' ছাড়া কার কাছে অভিযোগ জানাব। নগরপাল'ত আর মানুষ নেই। সে এখন উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ। তার কাছে অরণ্যেরোদন করে কিছু লাভ হবে না। আপনিই বিহিত করুন।

প্রথম ব্রাহ্মণ বলল ঃ অষ্টপ্রহর ঢোল করতাল বাজিয়ে আখড়াতে গৃহেতে, পথে যদি কীর্তন হয়, আমরা কোথায় যাব? নিমাইর দলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। রাতে একটু ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না।

সকলে একসঙ্গে বলল ঃ হ্যাঁ, কতরাত ঘুমোই না!

প্রথম ব্রাহ্মণ পুনরায় বলল ঃ নিমাইর দলে নিত্যানন্দ হরিদাস যোগ দেয়ার পর থেকে কীর্তনের চেহারা বদলে গেছে। নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ হলেও অবধূত। সে "কোন জাতি কোন কুল, কিছুই না জানি।" নিমাই হিন্দু-সমাজকে ভাঙার জন্যে এমন ব্রাহ্মণকে প্রচারে পাঠাল যার জাত পাত নেই। হরিদাস সে হিন্দু নয়, মুসলমান। তাকে দিয়ে হিন্দুধর্ম অপবিত্র করছে, আর মুসলমান ধর্মকে করছে অপমান। আপনি এর বিহিত করুন।

কাজী খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের অভিযোগ শুনতে শুনতে আশ্চর্য হল ভীষণ। ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতার বাস্তব কুৎসিত চেহারা দেখে তার নিজেরই ঘৃণা হল। অবাক লাগল, হিন্দুরাই হিন্দুধর্মের শত্রু। কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা দল পাকাবে। দল পাকাবার জন্যে জাতিভেদ, বর্ণভেদ সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার সব কিছুর ব্যবহার করবে। হিন্দুধর্মের অবক্ষয় ঢাকতে তারা হিন্দুয়ানি জাহির করবে। স্বার্থের জন্যে নিজের ধর্মের সঙ্গে শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতেও তারা কুণ্ঠিত নয়। সে যাই হোক, নিমাইব কার্য কলাপের উপর হস্তক্ষেপ করার এই ধরণের অধিকার পেয়ে কাজী পুলকিত হল। নিমাই তারও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। যেভাবে সে সমাজে সমতা সৃষ্টি করছে, সাম্যবাদী মনোভাবের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করছে তাতে হিন্দুদের ধর্মান্তরের প্রয়োজনীয়তা যেমন থাকবে না, ধর্মান্তরিত হিন্দুদের তেমনি হিন্দুধর্মে ফেরার পথ খুলে যাবে! তাতে মুসলমান সমাজ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুসলমান সমাজের উপর নিমাইর সুচতুর আঘাত হানার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়া কাজীর কাছে এই মুহূর্তে জরুরী মনে হল। ভাবতে গিয়ে আরো মনে হল তাকে একটা দুর্বল করার উদ্দেশ্যেই নিমাই জগদানন্দ ও মাধবানন্দকে বৈষ্ণব করেছে।

আচমকা কথাটা তাকে ছুঁয়ে গেল। ভিতরে ভিতরে একটু অস্থির হল। কয়েক মুহূর্ত ভাবল। উত্তপ্ত মাথাটি ঠাণ্ডা রেখে বলল : হাঁ। আপনাদের ধর্মের উপর নিমাইর দৌরাত্ম বন্ধ করতে সবরকম সাহায্য করব আমি। জনস্বার্থের সঙ্গে, দেশের স্বার্থের সঙ্গে রাজার স্বার্থ মিলিয়ে চলার নীতি সে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের। আপনাবা নিশ্চিন্তমনে যে যার ঘরে ফিরে যান, আমি ব্যবস্থা করছি।

প্রতিহারীর দল কাজীর আদেশ নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায়। ভেরী বাজিয়ে সকলকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করল এখন থেকে নবদ্বীপে কীর্তন করা নিষিদ্ধ। কেউ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে পারবে না। কাজীর আদেশ অমান্য করলে ছত্রিশ বাজারে তাকে ছত্রিশ ঘা বেত প্রহার করা হবে। নবদ্বীপ ঘুরে ঘুরে কাজীর অনুচরেরা এই কথা ঘোষণা করল। স্তব্ধ বিস্ময়ে নগরবাসী সেই কথা শুনে আঁৎকে উঠল। ভয়ে তাদের মুখখানা মলিন হল।

তারপরেই পথের বাঁকে বাঁকে এবং সংযোগস্থলে লাঠি হাতে কাজীর রক্ষীরা সামরিক কায়দায় টহল দিতে লাগল। আভ্যন্তরীন শান্তি শৃংখলা বিপন্ন হলে, কিংবা গণ অসন্তোষ, উত্তেজনা দেখা দিলে যে ধরণের সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা নেয়া হত সেরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করে কাজী তার আদেশের কঠোরতা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করল। প্রসন্নভাবে তাদের সতর্ক ও সাবধান থাকতে বলা হল।

নবদ্বীপের মানুষ পথে এধরণেব রক্ষী সমাবেশ হতে আগে দেখেনি কখনও। এই রহস্য বুঝতে না পারার কৌতুক ক্রমেই প্রবল হল তাদের মনে। তাই রাস্তায় রাস্তায় কোতূহলী মানুষ জড় হয়ে নিজেদের মধ্যে জটলা করছিল। রক্ষীরা এসে তাদের তফাৎ করে দিচ্ছিল। কোথাও কোন ভীড় জমতে দিচ্ছিল না।

এদিকে শ্রীবাস অঙ্গনে সকল বৈষ্ণব মিলিত হল গোপনে। তারা অধীর উৎকণ্ঠায় নিমাইর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু নিমাইর আসার কোন লক্ষণ নেই। অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস কক্ষের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে উত্তেজিতভাবে পদচারণা করছিল। সকলের চোখে মুখেই শঙ্কা, এবং দুর্ভাবনার ছাপ প্রকট। কি করলে কাজীর নিষেধাজ্ঞা থেকে সংকীর্তনকে মুক্ত করা যায় তার চিন্তায় সকলে মগ্ন ছিল সর্বক্ষণ। তবু কেউ পথের বাধা

দুর করার মত কোন উপায় বার করতে পারল না। একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে তারা ঘন ঘন দ্বারের দিকে তাকাতে লাগল।

শ্রীবাস অস্থিরভাবে পদচারণায় ক্ষান্তি দিয়ে সহসা অদ্বৈতাচার্যের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল : আচার্য, আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং প্রাজ্ঞ। কিছু বলুন। এই নীরবতা আর সহ্য হচ্ছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিমাই যে কেন এসে পৌঁছল না—

অদ্বৈতাচার্য বিমর্ষ চিত্তে শ্রীবাসের দিকে চেয়ে রইল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : প্রতিকারের কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। বিশ্বম্ভর আমাদের আলোর দেবতা। অন্ধকার থেকে সে-ই একমাত্র আমাদের আলোয় নিয়ে যেতে পারে।

শ্রীবাস একটু অস্থির বিচলিত ভাব প্রকাশ করে বলল : প্রভুর এই বিলম্বের হেতু কি ?

নিত্যানন্দ হাসি হাসি মুখ করে মধুর স্বরে বলল : এত তাঁরই মায়া তাঁকে ছাড়া আমরা যে অসহায় এই কথাটা সংকটে না পড়লে'ত আর অনুভব করা যায় না। সবাই মিলে আমরা পথ খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না। এক অসহায় অবস্থার মধ্যে বন্দী হয়ে আমরা কাল কাটাচ্ছি। প্রভুর প্রতীক্ষা করছি, কিন্তু আকুল হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি কি ?

নিত্যানন্দর কথাটা সবার মনে ধরল। সকলে উৎফুল্ল হল। নিত্যানন্দ একটু পরেই দু'চোখ বন্ধ করে গাইতে লাগল : ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

নিত্যানন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অন্যান্যরাও গাইল, যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।

অদ্বৈতাচার্য ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হচ্ছিল। সারা অঙ্গে তার শিহরণ বয়ে গেল ! গানের কথাগুলো অদ্বৈতাচার্যের কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করল। বুকে দাগ কেটে বসল। বুকের ভেতরটা তার কেমন করতে লাগল। তারপরেই আবেগ মুগ্ধ গলায় বলল : নিত্যানন্দ ! পথ পেয়েছি। মহাশক্তি উদ্বোধনের মন্ত্র পেয়েছি তোমার গানে। হরিনাম কীর্তন বন্ধ হয়েছে। কিন্তু গৌরাঙ্গের নাম কীর্তন করতে'ত নিষেধ 'নই।

সকলে উৎফুল্ল হয়ে মধুর মৃদু কণ্ঠে কীর্তনের সুরে গাইতে লাগল : ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

রুদ্ধ দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত হতে লাগল। বাইরে থেকে নিমাইর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: শ্রীবাস, দ্বার খোল। আমি এসেছি।

সকলের মুখ চোখে উৎফুল্ল ভাব ফুটে উঠল। বুকে আনন্দের সাগর উথলে উঠল। মাথা থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল।

শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশ করে নিমাই নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করল। মুখ-খানা তার গম্ভীর। চোখের চাহনিতে নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগ। তবু তার চিন্তা চিন্তা মুখখানিতে এক ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্বের আভাস ফুটে উঠেছিল। অপলক চোখে কয়েকমুহূর্ত সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল। কিন্তু তারপরেই মুখখানা রহস্যময় হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মধুর হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল: আপনারা খুব ভেঙে পড়েছেন. দেখছি।

শ্রীবাস বলল: এখনই আমরা হতাশ ভাবটা কাটিয়ে উঠলাম। আর আমাদের কোন ভয় নেই।

নিমাইর মুখে অনির্বচনীয় হাসির মাধুর্য। বলল: কি করবে স্থির করেছ?

তুমি যা বলবে, তাই করব?

তা-হলে কীর্তন চলছে চলবে।

কিন্তু, বিশাল জনতাকে'ত পাব না। তারা প্রাণ হারানোর ভয়ে কেউ আসবে না। অদ্বৈতাচার্য খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল।

নিমাই একটু হেসে বলল: আচার্য, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। দেশের প্রশাসক হয়েছে বলে, কাজী যা খুশি তাই করতে পারে না। আমরা কেউ বলির পাঁঠা নই। কীর্তন করলে প্রাণে মারার ভয় যারা দেখাচ্ছে, তাদের ভয়কে তুচ্ছ করার মহান সাহসে আমরা ঐ ভয় উত্তীর্ণ হব। কাজী সাধারণ মানুষকে মানুষ মনে করে না। তাই তাদের প্রতি এত অবহেলা আর অবজ্ঞা। সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে, তারা কাজীর কৃপা বা করুণার পাত্র নয়। তারাই দেশের গণশক্তি। তাদের স্বার্থ ও সুবিধে দেখাই হল কাজীর কর্তব্য। কাজী যদি সেই কর্তব্যের কথা ভুলে স্বেচ্ছাচারী হয় তা-হলে জনগণ তাকে উচ্ছেদ করতে পারে এই সত্যটা জানিয়ে দেয়ার সময় হয়েছে।

শ্রীবাস বলল: সাধারণ মানুষ বড় দুর্বল আর ভীরু। তাদের কেউ নেই, কিছু নেই।

না। সাধারণ মানুষ ভীরু নয়। সে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। তাকে শুধু জাগাতে হয়। তার ভেতর চির বিদ্রোহী সত্তাটা শুধু একজন নেতাকে খোঁজে।

নিমাইর কথা অদ্বৈতাচার্যের ভেতরটা কেঁপে গেল। মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হল তার মুখমণ্ডল। অস্ফুট স্বরে বলল: আমরা আমাদের নেতাকে অনুসরণ করব। আমরা অগণিত মানুষ। কাজী একা। কাজীকে আমাদের ভয় কিসের?

নিমাই বলল: জনতা দুর্বল নয়। সে শক্তির উৎস। সে যে বিরাট শক্তিমান এই প্রত্যয়টা এই পরিবেশেই লোকের মনে গেঁথে দেয়া সহজ।

কথাটা সকলকে গভীর ভাবে স্পর্শ করল। বুকের ভিতরে খুব গভীরে শরীরে এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনে থর থর করে কাঁপল অনেকক্ষণ। উচ্চকিত রক্তের ছোঁয়ায় মুখখানা তাদের রাঙা দেখাল। নিমাই তাদের অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলল: আমরা যারা এখানে আছি, তারা সকলে এক একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি। অগণিত বৈষ্ণব আমাদের সৈনিক। আমাদের সংগ্রাম অহিংস। খালি হাতে কাজীর সাথে লড়ব। আমাদের সংগ্রাম স্বাধিকারের সংগ্রাম। পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা হবে, জনতাই শক্তি। নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস তোমরা নাম কীর্তনের আন্দোলন কর। আমি কীর্তনের দল নিয়ে কাজীর প্রাসাদে যাব। গণশক্তি এবং রাজশক্তির মধ্যে কে বড় আর শ্রেষ্ঠ তার নির্ভুল বিচার হয়ে যাবে। তাহলে—

সপ্তাহ খানেক পরের ঘটনা।

নিমাইর আহ্বানে লোক সারা দিল কাতারে কাতারে। প্রত্যেকে একহাতে নিভন্ত মশাল এবং অন্যহাতে লাঠি নিয়ে সন্ধ্যার পরেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে জমা হল। সেখান থেকে চারটি দলে বিভক্ত হয়ে তারা নবদ্বীপের প্রধান রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করল খোল করতাল বাজিয়ে। কীর্তন করতে করতে এক এক দল এক এক দিকে অগ্রসর হল এবং উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের চারটি ঘাট পার হয়ে বারকোণা ঘাটে মিলিত হল। তারপর শুক্লাম্বর আশ্রম থেকে একটি বিরাট মিছিল হয়ে সিমুলিয়ার কাজীর গৃহের দিকে যাত্রা করল।

নিমাইর নির্দেশ মত গদাধর, শ্রীবাস মিছিল সাজাল। মিছিলের নেতৃত্ব দিতে পুরোভাগে রইলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নেতা অদ্বৈতাচার্য এবং

তাকে সাহায্য করার জন্যে একদল কীর্তনীয়া। মধ্যভাগ রক্ষার ভার পড়ল যবন হরিদাসের উপর। তৃতীয় ভাগ রক্ষার দায়িত্ব পেল শ্রীবাস এবং মিছিলের সবশেষে ছিল নিমাই ও নিত্যানন্দ। মিছিলে সকলের শেষে নিমাই ও নিত্যানন্দ থাকা নিয়ে কারো মনে যাতে কোন সংশয় এবং বিভ্রান্তি না হয় সেজন্যে মুরারী গোটা ব্যাপারটা জনতার কাছে পরিষ্কার করে বলল: মিছিলের সম্মুখভাগ যদি কোন কারণে আক্রমণ হয়, পিছনের লোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে ভয়ে চতুর্দ্দিক ছড়িয়ে পড়তে পারে। মিছিল যাতে ভেঙে না যায়, শৃংখলাবদ্ধ থাকে তাই প্রতিটি ভাগের সম্মুখে রাখা হল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবদের এবং গোটা মিছিলের লাগাম ধরে সংযত রাখার জন্যে মহানায়ক নিমাই স্বয়ং রইলেন সকলের পশ্চাতে। এই জনরথের সারথি হল নিমাই ও নিত্যানন্দ।

গদাধর তাদের আরো জানাল মশাল নিবিয়ে তারা নিঃশব্দে নদীতীর ধরে এগিয়ে যাবে কাজীর প্রাসাদের দিকে। মহাপ্রভুর হুংকার শোনামাত্র প্রত্যেকে নিজ নিজ মশাল জ্বালবে এবং উচ্চ হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখর করে তুলবে।

এমন অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ মিছিলে বহু মানুষের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দুঃসাহসিক একটা কিছু করতে পারার যুগপৎ আনন্দ ও শিহরণে তাদের প্রত্যেকের বুকের ভেতর মুহূর্মুহু কেঁপে গেল। তীক্ষ্ণ ও তীব্র উত্তেজনা ধীরে ধীরে তাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আগুনের স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল। সাঁড়াশির মত দু'হাতের মুঠোতে চেপে ধরল মশাল আর লাঠি। তাতেই একটা বলের মত শক্ত হয়ে উঠল তাদের পেশীগুলো।

গভীর রাত। গোটা পল্লী নিস্তব্ধ।

মোল্লাপাড়ার বনানী ঘেরা নিস্তব্ধ আরণ্যক পরিবেশ কাঁপিয়ে হঠাৎ নিমাই হুংকার দিল। দপ করে মশালেব আলো জ্বলে উঠল। অন্ধকার কোথায় যেন ছিটকে গেল। হাজার হাজার মশালের আলো যেন অন্ধকারের বুকে খল খল করে হেসে উঠল। সেই সংগে প্রচণ্ড ঝংকারে খোল করতাল বেজে উঠল। উন্মাদনায় উচ্চ হরিধ্বনিতে পল্লীর স্তব্ধতা ভেঙে খানখান হল। চোখের পলকে হুংকারের ভেতর থেকে যেন জেগে উঠল দৈবশক্তির মতএক বিরাট শক্তি।

সঙ্গে সঙ্গে কাজীর প্রাসাদের রক্ষীরা সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে এল। তাদের চোখে বিধর্মীয় হিংসা জ্বল জ্বল করতে লাগল। কারো হাতে টাঙ্গি, কারো হাতে বর্শা, কারো হাতে রাম-দা কারো হাতে সড়কি। বাইরে বেরিয়ে যা

দেখল তাতে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। শত শত মশাল জ্বলছে হাজার হাজার মানুষের হাতে। আগুনের মত গায়ের রঙ। বাতাসে উড়ছে তাদের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কেশর ফোলা সিংহের মত। উন্মাদনায় নৃত্য এবং হরিধ্বনি যেন ক্ষিপ্ত সিংহের গর্জনের মত রাত্রির অন্ধকারকে চিড়ে চিড়ে ফেলল। মত্ত মাতঙ্গের মত তারা প্রাসাদের দিকে ছুটে আসছিল। পথের ধারে যেসব কুঁড়ে ছিল সেগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, আর সমস্ত পল্লী কাঁপিয়ে কীর্তনের হরিধ্বনি হতে লাগল।

প্রহরীরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। চোখে মুখে তাদের আতঙ্কের ছায়া। এত বড় বিশাল জনতার সামনে তারা কয়জন কি করবে, ভেবে স্থির করতে পারল না।

অবশেষে বয়স্ক প্রহরীর পরামর্শে মিছিলকারীদের প্রাণে ভয় ধরিয়ে দেবার জন্যে তারা একসঙ্গে প্রচণ্ড জোরে হো-হো করে হেসে উঠল। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের অট্টহাসির শব্দ চারদিকের কীর্তনের কোলাহলও প্রচণ্ড মৃদঙ্গ করতালির ঝংকারের মধ্যে চাপা পড়ে গেল। জনতার গতিস্তব্ধ হল না। তারা তখন দিশেহারা হয়ে পড়ল।

মিছিল সিংহদ্বারে পৌঁছল।

আতঙ্কে তারা কাঁপতে লাগল। মরিয়া হয়ে একসঙ্গে হুঙ্কার ছাড়ল: খবরদার। এক পা এগোবে না। যদি বাঁচতে চাও এগোবে না। খবরদার।

তারপর যা হয়। বাধা পেয়ে জনতা আরো ক্ষিপ্ত ও অশান্ত হয়ে উঠল। প্রমত্ত ঝড়ের মত বন্ধ সিংহদুয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দ্বারের কপাট ভীষণভাবে নড়ে উঠল। ওদিকে নিমাই ঘন ঘন হুঙ্কার দিতে লাগল। "কোথা গেল কাজী বেটা। লাগি পাঙ এখনে ছিঁড়িয়া ফেলো মাথা"! জনতার বুক উদ্বেল হয়ে উঠল। উন্মাদনায় উচ্চ হরিধ্বনিতে উল্লাসের কলধ্বনি বাজতে লাগল তাদের বুকে। উত্তেজিত চেতনার ভেতরের এক ইন্দ্রজালের মত খেলা করছে শালপ্রাংশু মহাভুজ একটি অসাধারণ শক্তিমান পুরুষের উৎসাহ। জনতা ভয়শূন্য। উদ্দীপিত। একটা বিরাট প্রতিবন্ধক জয় করার উল্লাসে বেশ কিছুসংখ্যক লোক বেরিয়ে এসে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতর ঢুকল। ফটক খুলে দিল। বাঁধভাঙা বন্যার মত বিপুল বেগে ঢুকে পড়ল জনতা। মুহূর্তে প্রাসাদের চত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ক্ষিপ্ত জনতা পুঞ্জীভূত আক্রোশ নিয়ে প্রহরীদের প্রহার করল। জিনিসপত্তর ভাঙচুর করল। প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল পলাতক

কাজীকে। কোথাও যখন তাকে পাওয়া গেল না। তখন ক্রুদ্ধ নিমাই আদেশ করল। অগ্নিদেহ বাড়ীর ভিতর॥

পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সহিতে।
সর্ববাড়ি বেরি অগ্নিদেহ চারিভিতে॥
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যহতি॥

জনতা দারুণ উৎসাহে প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করতে লাগল। কাজী প্রাণভয়ে গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল। কিন্তু গা ঢাকা দিতে পারল না। জনতা তাকে পাকড়ে নিয়ে এল নিমাইর কাছে।

নিমাইর উজ্জ্বল চোখের কৃষ্ণ তারা দুটি ঝিক্ করে হেসে উঠল। বলল: কাজী, জনতার কিছু নেই, কেউ নেই, তাকে অবহেলা করা সহজ এ সব জেনেও তাদের ভয়ে লুকোলে কেন? তোমার রাজশক্তির দম্ভ কোথায় গেল? এখন বুঝতে পারলে'ত জনতা দুর্বল নয়, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। তাকে ভয় করতে, শ্রদ্ধা করতে শেখ।

নিমাইর সামনে ভীরু হরিণীর মত থর থর করে কাঁপতে লাগল কাজী। দু'হাত জোর করে বলল: প্রভু আমার ভ্রান্তি দূর হয়েছে। আমাকে ক্ষমা কর। এই ভুল আমি আর করব না। নবদ্বীপে আর কখনও কীর্তন বন্ধ হবে না। তুমি প্রসন্ন হও।

নিমাইর মুখে হাসি চোখে কৌতুক। বলল: তোমার সব দোষ ঐ সব নিরীহ মানুষদের কাছে। তাদের কাছে তুমি ক্ষমা চাও।

প্রাণভয়ে কাজী তখন ঠক ঠক করে কাঁপছিল। কাঁপা গলায় বলল: এত লোক, আমাকে হত্যা করবে না'ত।

সহস্র কণ্ঠে মানুষ সমবেত কণ্ঠে গাইছিল: লহ শ্রীকৃষ্ণ নাম রে—

কাজী নিমাইর কোল ঘেঁষে আরো ঘন হয়ে দাঁড়াল। এই লোকটাই তার এখন নিরাপদ এবং নির্ভয় আশ্রয়। ভাষাহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জনতার দিকে। তারপর মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কথা বলার সময় বুকটা একটু থর থর করে কেঁপে উঠল। অপমানে মুখখানা তার আগুনের মত গণ গণ করছিল। জনগণের দিকে তাকিয়ে বলল: ভাইসব, আমাকে এবারের মত ক্ষমা কর। এখন থেকে প্রত্যেকের নাম গান করার অধিকার থাকবে।

। এগার ।

চাঁদ কাজীর মুখে সব কথা শুনে বঙ্গাধিপতি সুলতান হোসেন শাহ ক্রোধে অপমানে জ্বলে উঠল। কিন্তু মনে একটা অদম্য কৌতূহলও জাগল। নিমাইর মত সামান্য একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিয়ে কথা বলতে তার রুচি হচ্ছিল না। তবু তার প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে দু'চার কথা জানার আগ্রহ কিছুতে চাপতে পারল না। আসলে, হোসেন শাহ জনগণমন বন্দিত অধিনায়ক নিমাইর বিরাট সাফল্য এবং গৌরব সম্পর্কে অতি মাত্রায় বিচলিত বোধ করল। মনের সেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনায় ক্লিষ্ট হয়ে সে প্রধান উজীর দবীব খাস এর দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল ঃ খবরটা, মোটেই শুভ নয়। তোমার কি ধারণা দবীর।

যথার্থই বড় উদ্বেগের সুলতান ?

হোসেন শাহ চমকে উঠল। মনের অন্ধকারে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল অন্য এক ভাবনা। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে প্রশ্ন করল ঃ উদ্বেগ ! উদ্বেগ কেন বলছ ?

জানি না, কোন জীয়ন কাঠির যাদু স্পর্শে বিচিত্র নেশায় হাজার হাজার মানুষের স্তিমিত প্রাণে যে হঠাৎ এমন আলোর বন্যা বইয়ে দিতে পারে তাকে সামান্য মনে করে উপেক্ষা করা যায় কি ? রাজশক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর সাহস যার ভেতর আছে, তাকে নিয়ে রাজার উদ্বেগ থাকা'ত স্বাভাবিক।

হুঁ। তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে উজীর।

সুলতান হিন্দু সমাজের হাজার হাজার বছরের কুসংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধকে রাতারাতি ভেঙে ফেলে যে মানুষের অন্তরে শুভ্র মনুষ্যত্বকে জাগাতে পারে, তার সত্তাকে পরম গৌরবে উদ্ভাসিত করতে পারে, তাকে ছোট করে দেখা যায় ? লঙ্কারাজ রাবণ রামচন্দ্রকে একজন সামান্য বনবাসী ভেবে তাকে উপেক্ষা করে ভুল করেছিল। অনুরূপ ভুল আপনি করলে আপনাকেও ভুলের মাশুল দিতে হবে।

সুলতানের হাসি পেল খুব। কিন্তু হাসল না। কেবল স্নিগ্ধ কৌতুকে তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল : কার সঙ্গে কার তুলনা করলে উজীর? তোমার রসবোধের প্রশংসা করতে পারলাম না।

কেন সুলতান?

দু'জন দুই মেরুর লোক। রামচন্দ্র রাজপুত্র, রাজনীতি তার রক্তের জিনিস। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত রাজনীতির কি বোঝে? তাকে এত গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। তার সম্পর্কে অধিক কৌতূহল দেখানোর অর্থ হল তাকে ভয় করা।

চাঁদ কাজী বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল : কিন্তু আমার লাঞ্ছনা, অপমানের সঙ্গে আপনার নিজের মান মর্যাদা জড়িয়ে আছে। লাঞ্ছনাটা আমাকে করলেও অপমানের আঁচটা কিন্তু আপনার গায়ে লেগেছে। রাজ্যের বাইরে আপনার মর্যাদাটা তাতে নাড়া খেয়েছে। রাজশক্তির ইজ্জত হানি হয়েছে। শত্রুর কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তারা কিন্তু অন্যভাবে বিচার করছে। অন্য কাজীরাও বলছে, হুসেন শাহের রাজকীয় গৌরব মর্যাদা হেয় করাই নিমাইর মিছিলের উদ্দেশ্য। রাজশক্তির সঙ্গে জন শক্তির সংঘর্ষ সৃষ্টি করে নিমাই তার জয় এবং প্রতিষ্ঠা আদায় করে নিয়েছে।

দবীর খাস কথা বলতে পারল না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তার ভেতর ঘুমিয়ে পড়া হিন্দুটাকে কে যেন ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। নিদ্রার জড়তা এবং আচ্ছন্নতার ভেতর সে নিমাই পণ্ডিতের শান্ত সৌম্য, গম্ভীর মুখ-খানাকে দেখতে লাগল। তার ব্যক্তিত্বের চুম্বক যেন তাকে প্রবলবেগে তার দিকে টানতে লাগল। সহসা কেমন একটা দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। সে যে কুমার দেবের মধ্যম পুত্র এ কথাটা ভুলতে পারছিল না। দবীর খাস তার ছদ্মবেশ। অথচ এই মিথ্যে পরিচয়টা নিয়েই সে সুলতানের বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং বিগ্রহ ভাঙ্গার অভিযানের সঙ্গী হয়েছে। আত্ম-গ্লানিতে তার অন্তরটা ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল।

হুসেন শাহ দবীর খাসকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল : দবীর খাস তুমিও চুপ করে আছ কেন?

দবীর খাস গভীর সম্মোহন অবস্থার ভেতর একটু কেঁপে উঠল। খুব দ্রুত নিজের অবস্থাকে সামাল দিয়ে বলল : কাজী যা বললেন সত্য। কিন্তু আমি ভাবছি, নিমাইর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের এই স্মৃতি যত

দিন জনসাধারণের মনে থাকবে ততদিন তার উপর গোটা বাংলাদেশের মানুষের বিপুল আস্থা এবং পূর্ণ সমর্থন থাকবে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে হোসেন শাহ দবীর খাস-এর দিকে চেয়ে রইল। চোখের পলক পড়ে না মোটে। চিন্তায় ভাবনায় তার ললাটের বলি রেখাগুলো গভীর হল। ভেতরটা ভীষণ ঘেমে উঠল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে তার কাটল। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার উদ্বেগটা বেরিয়ে এল। বলল : উজীর, তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে। এত গভীর করে আমি বিচার করিনি। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত কি চায়? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া কি তার ইচ্ছে? আমার মসনদের উপর কি তার দৃষ্টি পড়েছে?

সুলতান সন্ধানী চোখ মেলে গোটা কার্যকলাপকে বিচার করে দেখা দরকার। নিমাই পণ্ডিত এক অসাধারণ মানুষ। তার কার্যকলাপকে বুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করতে যাওয়া সাগরে জল মাপার মতই হাস্যকর।

হুসেন শাহ একটু দিশেহারা বোধ করল। হতাশভাবে মাথা নাড়ল। বুকটা একটু ভার বোধ হল। বেশ কয়েকবার ঢোক গিলে বলল : তুমি ঠিক বলেছ। এখন বুঝতে পারছি ধর্মান্তরিত মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ফেরার পথ খুলে দেবার জন্যেই সবার উপর মানুষ সত্যের বাণী প্রচার করছে। বৈষ্ণবের উদার প্রেম ধর্মের প্রভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা যেভাবে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে সুরু করেছে তাতে মুসলমানের সংখ্যা শীঘ্রই হ্রাস পাবে। এ হল নিমাই পণ্ডিতের মুসলমানদের দুর্বল করে দেয়ার চক্রান্ত। আমি মতলব বুঝেই তার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য গুপ্তচর লাগিয়েছি। এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যাতায়াতের পথেও এবার নজরদার বসাব।

দবীর খাস একটু হাসল।

হোসেন শাহ নীরব। মাথা নিচু করে দবীর খাস এর হাসির তাৎপর্য গভীর করে ভাবল অনেকক্ষণ। তারপর বলল : বুঝেছি। কাতারে কাতারে যে অগণিত মানুষ এবং তরুণ নিমাই পণ্ডিতের কাছে ছুটে গেল, তাদের রাজাদেশ অমান্য করা এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করার ভয়ংকর শাস্তি দিতে মন্দির ভাঙব, জনে জনে মুসলমান করব, অবাধ্যদের হত্যা করব। শত্রু মিত্র সাধারণ লোক জানবে, হোসেন শাহ দুর্বল নয়, ভীরু নয়। সে দুষ্টের শাসন, ধর্মের রক্ষক।

কাজীর দুই চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল : তোবা। তোবা

দবীর খাস একটু চমকাল। তার শরীরের ভেতর যন্ত্রণার মত একটা কি যেন ছড়িয়ে পড়ল। বেশ বুঝতে পারছিল তার ধমনীতে যে হিন্দু ব্রাহ্মণের রক্ত স্রোত বইছে তা যেন এই মুহূর্তে চন চন করে উঠল। সে যে একদিন হিন্দু ছিল এই বোধটা এমন করে আগে কখনও মনে হয়নি। ধর্ম ত্যাগের এক নিদারুণ মর্ম জ্বালায় তার বুকের ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। তার মানসিক শক্তিতেও টান ধরল। দাঁতে দাঁত দিয়ে ভেতরের সেই অসহ্য প্রতিক্রিয়াকে চেপে ধরল। বাইরের আচরণে হৃদয় মথিত যন্ত্রণার কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল না। খুব অনুগত এবং বিশ্বস্ত কর্মীর মত শান্ত সংযত চিত্তে মৃদু স্বরে বলল: সুলতান আপনি উত্তেজিত। অত নির্দ্দয় কিংবা নিষ্ঠুর হওয়ার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষ দুর্বল ভীরু, একটু করুণা পেলেই ধন্য হয়ে যায়। ওদের ওপর অকারণ নিষ্ঠুর হলে আপনার কোন গৌরব বাড়বে না। বিরোধে বিরোধ বাড়ে। অকারণ সংকট সৃষ্টি হয়। সুনাম যায়। স্বার্থ নিরাপদ করার মত করে কিছু চিন্তা করতে হবে। যদিও মুখ্য লড়াইটা নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে আপনার। আপনিও তার সঙ্গে বিরোধ পরিহার করে চলতে চাইছেন। কেন? নিশ্চয়ই তার ভেতর এমন কিছু আছে যাকে আপনিও শ্রদ্ধা করেন।

চমকানো বিস্ময়ে হোসেন শাহ ডাকল: দবীর খাস।

সুলতানের দৃষ্টি সাধারণ মানুষের দিক থেকে নিমাইর দিকে ফেরাতে পারার সাফল্যে খুশি হল দবীর খাস। অধরে তার বিজয়ের হাসি। কণ্ঠে মুগ্ধতা। বলল: সুলতান, গলাটা তার ভয়ানক কেঁপে গেল। কথাটা বলার পরেই দবীর খাসের বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। অন্তরাজ্যে হঠাৎ একটা কিছু ঘটে গেল যেন। কিন্তু ঠিক যে কি হচ্ছিল, অনুমান করতে পারল না। তবে, এমন কিছু হল, যা আগে কখনও মনের কোণে আসিনি। দবীর খাস কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নিমাইর অমঙ্গল আশংকায় সহসা তার অন্তর কাতর হল। তার জন্যে কিছু ভয়ও হল। নিজেই প্রশ্ন করল: কেন? এ কি তার নিমাই পণ্ডিতের প্রতি প্রেম, অনুরাগ, শ্রদ্ধা? ক্ষণিক দ্বিধা, জড়তা কাটিয়ে থমথমে গম্ভীর গলায় বলল: নিমাই বলে মানুষ শক্তির উৎস, আমি বলি নিমাই শক্তির আধার। সে সূর্য। রাহুও পারে না তাকে গ্রাস করতে। সুলতান, হিন্দু মুসলমানের মন থেকে নিমাই পণ্ডিতের স্নিগ্ধ অস্তিত্বকে প্রবল ধাক্কায় বহু দূরে সরিয়ে দেয়া বোধহয়

সহজ হবে না। একে মানুষের মন থেকে সরাতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতাও নেই। আর কেউ না জানলেও আমি'ত জানি, মানসিক সংকট থেকে মুক্ত থাকতে রাজ্যের অভ্যন্তরে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি আপনি চিরদিনই চেয়েছেন, সে জন্য এক নিরপেক্ষ আদর্শ, পরিচ্ছন্ন প্রশাসন করতে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুদেরও রাজ কর্মচারী রূপে নিযুক্ত করেছেন। হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে রামায়ণ, মহাভারতও অনুবাদ করছেন। আপনার সেই বদান্যতা উদারতাকে কালিমালিপ্ত করে কিছু করতে আপনাকে অনুরোধ করব না। আপনি বিবেচনা করে দেখুন নিমাই পণ্ডিত আপনার সেই মহান আদর্শ ও সংকল্পর একজন রূপকার ও আপনার সঙ্গে তার আদর্শের কোন বিরোধ নেই। বঙ্গভূমি যে হিন্দু মুসলমানের জন্মভূমি নিমাই পণ্ডিত তার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পতিত হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানকেও কোল দিয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মে সে তার মেলামেশার দরজা খুলে দিয়েছে। আপনি শুধু তাকে উন্মুক্ত করে দিন। বাংলার ইতিহাস নতুন করে লেখা হোক।

চাঁদ কাজী চমকে উঠল দবীর খাসের কথায়। আত্মগ্লানিতে তার বুকের ভেতর জ্বালা করছিল। বজ্রাহতের মত অবাক চোখে সুলতানের দিকে অপলক তাকিয়ে বলল, সুলতান! আমার লাঞ্ছনা, আপনার অপমানের বিনিময়ে এই ক্ষমা করলে আমি ছোট হয়ে যাব। আপনার মর্যাদা থাকবে না। রাজা জনগণের অনুগ্রহের পাত্র হবে। রাজনীতিতে দুর্বলতা, আদর্শ ক্ষমার কোন স্থান নেই। এসব দেখিয়ে যদি রাজত্ব করতে হয় তাহলে রাজাকে রাজত্ব করার জন্যে দাম দিতে হয়।

হুসেন শাহের সমস্ত সত্তা ভীষণ ভাবে নাড়া খেল। কিন্তু দবীর খাসের কথাগুলো এমন এক মহৎ অনুভূতিতে তাকে আবিষ্ট করে ফেলেছিল যে, তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। মাথার ভেতরটা তার ভার ভার বোধ হল। আর কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে থম হয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: সম্মান রক্ষার জন্যে যা করলে ভাল হয় তোমার অঞ্চলে তাই কর। কিন্তু তার ঝাপ্টা গোটা রাজ্যের গায়ে লাগে না যেন।

শ্রীবাসের অঙ্গন থেকে সেদিন এক অন্য মানুষ হয়ে ফিরল নিমাই। তার দু চোখে কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব, চাউনিটাও লক্ষ্যহীন। অকস্মাৎ

কোথাও কিছু ঘটলে মানুষ এমন বদলে যায়। নিমাইর রূপান্তরটা ভীষণভাবে বিঁধল শচীকে। বুকের ভেতরটা তার ব্যথিয়ে উঠল। ব্যাকুল হয়ে জিগ্যেস করল: নিমাই, তোর কি হল বাবা? এমন করে মুখ বুজে থাকলে কথা বলতে বড় ভয় করে। বেচারা বৌটা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।

নিমাই শচীর মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার অন্তরের, তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে, তার নাভি মূল থেকে উৎসারিত হল তার অজানিতে। সত্য যা তা এমনি অমোঘভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালো নিমাই। বলল: মা, তুমি বলতে মানুষ দুঃখ পায় নিজের মিথ্যে প্রত্যাশারই কারণে। কারো যদি কখনও উপকার করো, ভালবাসো কাউকে বুক উজার করে তবু সে তোমার অপকার করার জন্যে সুযোগ খুঁজবেই; এইটে মনে মনে জেনেই তৈরি হয়ে থেক সব সময়। এই কথাটা আজ বড় গভীর করে অনুভব করছি। লোকে যে যা বলুক, আমি'ত এই পৃথিবীর অসংখ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন। আমার প্রত্যাশা আর প্রত্যাশাজনিত অবধারিত দুঃখ পাওয়া ঠেকাবেটা কে?

শচী কিছুতেই বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কি? সন্তানের কষ্টে মায়ের মনটা ব্যথিত হয়ে উঠল। বুকটা কেমন করছিল। নিমাইকে কখনও হতাশ হতে দেখেনি। সম্ভবতঃ দায়িত্ব, কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বার্থপর কুচক্রী কিছু মানুষের কাছ থেকে ধাক্কা খেয়েই তার মনে এ রকম হতাশা, নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। নিমাইকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্য মলিন হেসে বলল: পৃথিবীর কিছু লোকের জন্য মানুষের সদগুণগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ও সব ভেবে মন খারাপ করতে নেই।

নিমাই একটু ম্লান হাসল। বলল: মন খারাপ কাদের জন্যে করব? যাদের আদর্শ, লক্ষ্য নেই, ভাল-মন্দ বোধ নেই তারা করুণারও অযোগ্য.

শচী উদ্বিগ্ন হয়ে বলল: কি হয়েছে, আমাকে খুলে বল বাবা। আমি মা। মার কাছে সন্তানের কিছু গোপন থাকতে নেই। তোর মলিন মুখ দেখলে আমার কান্না পায়। কষ্টে বুকের ভেতরটা কেমন করে। শচীর মুখে থমথমিয়ে উঠল কান্না। একখানা হাত এসে স্পর্শ করল নিমাইর মাথা। ভারী কোমল আর স্নেহের সে স্পর্শ।

নিমাই হাঁ করে শচীকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর থমথমে গম্ভীর গলায় বলল। মা, আমার সব ভাবনা তোমাকে ঘিরে। তুমি আমার বড় বন্ধন।

তোমার মায়া কাটাতে পারি না বলেই'ত এত কষ্ট পাই। কথাটা বলব মনে করেও পারি না বলতে। কে যেন গলাটাকে চেপে ধরে।

নিমাইর কথায় শচীও কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। দু চোখ ছলছলিয়ে উঠল। বেশ করুণ চোখে ছেলেকে দেখল। দুঃখে মাথা নাড়ল। বুকে অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল। ধরা গলায় বলল, আমি তোর জীবনের বড় ভার তাই না? এমনি করে পথের কাঁটা হয়ে বেঁচে থাকার মত অপমান কিছু নেই।

নিমাই স্তম্ভিত হয়ে গেল কয়েকমুহূর্তের জন্যে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: মা, এ সব তুমি কি বলছ। আমাকে ভুল বুঝ না। আমার কথাটা বুঝবার চেষ্টা কর। নবদ্বীপে আমার আর থাকা হবে না। থাকতে পারছি না।

শচী ভ্যাবাচাকা খেয়ে চেয়ে থাকে নিমাইর দিকে। আলোড়িত হয় তার বুকের ভেতরটা। অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে বলল: চলে যাবি? কেন? কি হল এমন? বল, নিমাই, মায়ের কাছে সন্তানের কোন লজ্জা নেই।

নিমাই মুগ্ধ চোখ দুটি শচীর চোখের উপর পেতে রাখল। নিজের অভ্যন্তরের ক্ষতগুলোর কথা বলতে তার ইচ্ছে হল। বলল: মা অজাতশত্রু হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হননি। অথচ, তিনি মানুষের ভাল করার জন্যে নিজের সুখ, আনন্দকে উৎসর্গ করলেন। নিজের জন্যে কিছু চাইলেন না। কোন কিছুতেই তার আকাংখ্যা নেই। তবু তার মাঝে আত্ম-ত্যাগের প্রতি মানুষের সন্দেহ, অবিশ্বাস, শত্রুতা, মানুষের মঙ্গলের জন্যে কল্যাণের জন্যে কত কথা বললেন, তবু মানুষ কিংবা জগৎ শুনল কি তার কথা? মানুষের ভালর জন্যেই কত অবতার অবতীর্ণ হল পৃথিবীতে, তবু এই অবক্ষয় কেন? পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য হল না কেন? মানুষ ধর্মে সুন্দর হল কৈ?

নিমাইর কথায় শচীর বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় দেখা দিল। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর থমথমে গলায় বলল: নিমাই তোর মন আজ ভাল নেই। অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠেছে বুকে। তাই, তোর কোন কথা বুঝতে পারছি না। সহজ করে বল, কার উপরে অভিমান করে তুই নবদ্বীপ ছেড়ে যাচ্ছিস? আমাদের জন্যে কষ্ট হবে না? বৌ-মা, বৌমার জন্যে একটুও মন কেমন করবে না?

নিমাই মাথা নেড়ে বলল: কাজী চুপ করে বসে নেই। অবৈষ্ণবরাও

থেমে নেই। ভেদ, বৈষম্য, বিদ্বেষের ছুরিতে তারা গোপনে শান দিচ্ছে। তাদের লক্ষ্য আমি। লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্যে তারা উন্মাদ হয়ে গেছে। আত্মঘাতী মহা সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে। এতে ধ্বংস হয়ে যাবে আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা। মানুষ'ত তার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে। স্বপ্ন গেলে, সাধনা গেলে আর কি রইল? এই দুটো হারানোর মত বড় মৃত্যু আর নেই। তাই বৈষ্ণবকুলের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার এবং মানবিক কল্যাণে আমাকে নবদ্বীপ ছাড়তে হবে। ভেদাভেদকে জীইয়ে রেখে যারা টিঁকে থাকে, আমি চলে গেলে আর তারা কোন উত্তেজনা খুঁজে পাবে না। নিজেদের কৌশলের কাছে নিজেরাই পরাজিত হয়ে থেমে যাবে। পরিস্থিতি চিন্তা করেই আমাকে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হল*।

শচী একটু শিউরে উঠল। নিমাই চলে যাওয়ার কথায় তার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। জল ভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টিতে নিমাইর দিকে তাকিয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে বলল: বিশ্বরূপ গেছে। এবার তোর পালা। হায়রে অদৃষ্ট আমি কি করব, কি নিয়ে থাকব? বৌমা'র আস্ত বয়স পড়ে আছে। সে কি পেল? তাকে কি দিলি?

শচী দু'হাত মুখ ঢেকে নিজের কান্নায় এতই ভেঙে পড়ল যে বাদবাকী কথাগুলো বলতে পারল না।

নিমাইর মনটা কিছু সিক্ত হল। কিছু বিষণ্ণও। সে চোখে কিছু দেখছিল না, কেবল অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক মহান ঝড়কে তার নিজের অভ্যন্তরে অনুভব করছিল। বলল: আমি এখন দ্বিখণ্ডিত। একদিকে তুমি আর এক দিকে আমার বিশ্ব। আমার মনের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় জীবনের সূচনা সুরু হয়েছে। মা আজ সত্য গোপন করব না। মহাত্মা কেশবপুরীকে দেখার পর থেকেই আমার ভেতরটা কেমন যেন ওলোট পালোট হয়ে গেছে। আমার সত্তার ভেতর এক বৃহত্তর জীবন যাপনের আহ্বান। তাঁর কথা শুনে মনে হল আমি নিজেকে যা ভাবি আমি বুঝি সেটুকু মাত্র নই। তারও বেশি। আমার অস্তিত্ব যেন বিশ্বব্যাপী, আকাশ পাতাল জুড়ে মুখব্যাদান করে আছে। মনে হল এক অদ্ভুত স্বর্গীয় আলো এসে পড়ল আমার উপর। ক্ষণিকের জন্যে এক বৃহৎ জগতের ছবি মেলে ধরল আমার সম্মুখে। মহা পৃথিবীর দিকে

---

* যদ্যপি সহসা মুঞি করিয়াছি সন্ন্যাস। চৈ. চ.

যে অবারিত পথ সেই পথের আহ্বান নিয়ে এল আমার চিত্তে। মহাত্মা কেশব ভারতী, আমার মনের কথা বললেন। ঈশ্বরই যদি সংসার সৃষ্টি করে থাকেন, তবে সন্ন্যাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই সংসারকে ভাঙার চেষ্টা তো ঈশ্বর বিরোধিতার নামান্তর। যে সন্ন্যাসী শুধু আত্মমুক্তি সাধনে ব্যস্ত থাকে তাঁকে শুধু একজন ধার্মিক মহৎ মানব বলা যেতে পারে মাত্র। আর যে সন্ন্যাসী সৃষ্টিকে সুন্দর করতে চান, মানব মনে চৈতন্যোদয় ঘটিয়ে চিত্তের প্রসার ঘটাতে চান তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, মহান ভক্ত। প্রতিটি মানব মনের বিকাশ ঘটবে, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, সেই তো হবে সুন্দর সমাজ। পদ্মের প্রতিটি পাঁপড়ি যেমন পরস্পরের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা যেমন একটা বিরাট পুষ্পের আকৃতি পায়, শ্রেষ্ঠ সমাদর লাভ করে তেমনি প্রীতি, মৈত্রী, শান্তি সহযোগিতার এক সুস্থ সংস্কৃতি সম্পন্ন সামাজিক অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যিনি বিশ্বস্রষ্টার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। তাঁর কথা শুনে আমি সম্মোহিত, স্তব্ধ, বাক্যহারা। আমার ভেতরটা এক উপচানো আনন্দে আর অসহনীয় সুখবোধে একটু একটু করে টৈটুম্বুর হয়ে গেল। আমি কেমন হয়ে গেলাম।

শচীর কেমন বিবশ অবশ লাগছিল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। দম নিতে পারলেও ছাড়তে পারছিল না। এক অসহায় কষ্টকর অবস্থার ভেতর সে বাকশক্তিহীন। শচীর ভাল লাগছিল না। স্পর্শকাতর মনটা তাকে শুধু কষ্ট দিচ্ছিল। পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গণনা যে শেষ পর্যন্ত সত্য হবে নিমাইকে দেখে কোনদিন মনে হয় নি। তবু, একটা আশংকা, উৎকণ্ঠা সব সময় থেকে গিয়েছিল। নিমাইরও সে কথা অজানা ছিল না। তাই তার কাছে শপথ করেছিল, তার অনুমতি ছাড়া সে কোনদিন সন্ন্যাস নেবে না। অথচ এক বুক পিপাসা নিয়ে সে চাতকের মত বসে আছে সন্ন্যাস হবে বলেই।

শচী অন্যমনস্ক। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে নিমাই হাসি হাসি মুখ করে বলল : মা, তোমার কষ্ট হলে আমার যেমন কষ্ট হয়, আমার যন্ত্রণা হলে তোমার তেমনি কষ্ট হয় না?

একথা মুখে বলে বোঝাতে হয় বাবা? আমাকে দেখে তুই টের পাস না?

আমি যে তোমার মধ্যে আমার দুঃখিনী স্বদেশকে টের পাই। জননী জন্মভূমির দুঃখ দুর্দ্দশার কোন প্রতিকার করতে পারছি না বলেই মনের মধ্যে অহরহ যন্ত্রণা আর কষ্ট। জীব জগতের মহা দুরবস্থা। নৈতিক পতনে

গোটা ভারতবর্ষ আজ ভেঙে পড়েছে। পাপে পৃথিবী আর্ত। ধর্মাশ্রয়ীরা উদ্বিগ্ন। সে দুঃখের অনুভূতি যাদের নেই তাদের কোন কষ্ট নেই। তবু মনের গভীরে কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার জন্যে মানুষ ব্যাকুল। এই মহা সংকট থেকে অধঃপতিত মানুষকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। আজ তাঁকে পৃথিবীর বড় প্রয়োজন। আমি তাঁকেই খুঁজছি। আমার পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে আমি সেই মহান কৃষ্ণকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে খুঁজছি। কৃষ্ণের পথেই ভারতবর্ষের মুক্তি। বিশাল পৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ চলে গেছে সেই পথে পথে আমি কৃষ্ণকে খুঁজব। বল মা, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাই।

তুই তো সমস্ত নবদ্বীপধামকে কৃষ্ণ নামে অভিভূত করে ফেলেছিস। তবু তোর কৃষ্ণ খোঁজা হল না। তোর কৃষ্ণ'ত মন্দিরে নেই, সে'ত বিগ্রহ নয়। অসংখ্য মানুষের ভেতর তুই তাকে দেখতে পাস। মানুষই তার গণদেবতা কৃষ্ণ।

নবদ্বীপে আমার সে কৃষ্ণকে পেলাম কৈ? তাই নবদ্বীপ ধাম ত্যাগ করে আমি যাব দেশ দেশান্তরে। সন্ন্যাসী হয়ে পথে পথে তাকে খুঁজব। সব ত্যাগ না করলে সেই গণ দেবতা জগন্নাথকে পাওয়া যায় না।

নিমাই! চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল শচী।

মা। তুমি'ত আমার ভাল চাও। আমি যদি সংসার সুখে মগ্ন থাকি তা-হলে লোকে আমার কথা শুনবে কেন? একজন গৃহীর চেয়ে সন্ন্যাসীকেই মানুষ বেশি বিশ্বাস করে! তার কথা বেশি করে শোনে। সন্ন্যাসীর উপর সর্ব সাধারণের অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস। সন্ন্যাসী পারে মিষ্টি কথায়, মিষ্টি ব্যবহারে সকলের হৃদয় জয় করতে। মানুষকে আকর্ষণ করতে, তাকে উদ্দীপিত করতে আমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে।

নিমাই! তুই'ত কোনদিন সন্ন্যাসে বিশ্বাসী ছিলি না বাবা। এ মতি হল কেন আবার? শচীর দুই চোখের চাহনি সজল হয়ে উঠল।

মা, নেতাকে সবত্যাগী হতে হয়। মানুষের সমাজ সংস্কারের বাইরে এসে তাকে দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করতে হয়। নইলে সন্দেহ ঘোচে না। অবিশ্বাস যায় না। আমাকে ঘিরে একজন লোভী, স্বার্থান্বেষী মানুষের মনে সন্দেহ জেগেছে। দেশের রাজা পর্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে। তিনিও বিশ্বাস করেন আমি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। সন্ন্যাসী হলে এ সন্দেহ আর থাকবে না।

সকল সন্দেহের বাইরে থেকে আমি আরো বেশি করে মানুষকে আহ্বান করতে পারব। তাদের বিশ্বাসভাজন হব। যারা আমাকে ভয় পাচ্ছে, সন্দেহ করছে তারাও নির্ভয়ে সাড়া দেবে।

নিমাই সত্যিই কি চাস ?

মা! ভেদাভেদ সৃষ্টি করে সমাজ বেশিদিন টেঁকে না। তাকে প্রেমে বাঁধতে হবে। সন্ন্যাসীর প্রেমেই ছোট বড় থাকে না। আমাকে তুমি সন্ন্যাসের অনুমতি দাও।

আমি জানতাম। তোকে আমি ধরে রাখতে পারব না। সবই নিয়তি। ঈশ্বরের যখন ইচ্ছে তখন আমি কেন নিমিত্ত হয়ে থাকব। বুক ফেটে যাচ্ছে বাবা। তবু অনুমতি দিলাম। আমি যে নিমাইর মা।

গদাধরকে দেখে পাগলের মত ছুটে এল শচী। কিন্তু কথা বলতে পারল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল। বিষ্ণুপ্রিয়া শচীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। মাথায় তার ঘোমটা ছিল না। টেনে দিতে ভুলে গেল।

গদাধরের প্রস্তরীভূত অবস্থা।

কয়েকটা মুহূর্ত দিশেহারা অবস্থার মধ্যে কাটল। অর্ধ চেতনার গভীর থেকে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে বলল : গদাধর আমার নিমাই কোথায় ? তার কথা বল।

গদাধরের বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে উঠল। জলভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টি তুলে ধরে বলল : কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে সে এসেছে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে। তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।

একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল শচীকে। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শে তার দুই চোখ বুজে এল। সমস্ত সত্তার ভেতর একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে নিমাইর দিকে। তার ভেতরটা ভেসে যাচ্ছে। গৈরিক বসন পরিহিত নিমাইর কেশহীন মুখখানা, তার স্নিগ্ধ শান্ত সৌম্য সাধক মূর্তি, তার চোখের উপর ভেসে উঠল। আর তীব্র এক যন্ত্রণাময় অনুভূতিতে বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। বলল : বৌমা যাবে না ?

গদাধরের বুকের ভেতর ধকধকানিটা শুরু হল এ সময়। সে বুঝতে

পারছিল না বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে কি বললে সব দিক রক্ষা পায়। বেশ একটু বিব্রত এবং অসহায় বোধ করল। তারপর মিন মিন করে বলল: নবদ্বীপ থেকে বিদায় নেয়ার আগে একবার জননী আর জন্মভূমিকে প্রণাম করে যাওয়ার সাধ হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের।*

বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। বুকের ভেতরটা তীব্র একটা যন্ত্রণায় টনটন করতে লাগল। অপমান এত গভীর ভাবে তার মনে বেজেছিল যে ডুকরে কেঁদে উঠল। সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে স্ফুরিত ঝংকারে বাজতে লাগল কেন, কেন এত অপমান, কেন এই নিষ্ঠুর উপেক্ষা আর অবহেলা? কেন? আর সেই বারংবার প্রশ্ন যেন তার বুকের ভেতরে আঘাত করছিল নিষ্ঠুর ভাবে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই অভিভূত আচ্ছন্নতা শচীকে ত্রস্ত করে তুলল। চকিত বিদ্ধ একটা কষ্ট শচীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। বাড়ীর মধ্যে একটা আতঙ্কিত অসম্মানের ছায়া সহসা নেমে এল। সমস্ত আবহাওয়াটা ভারী হয়ে উঠল।

গদাধর অন্যদিকে মুখ ফিরে তাকিয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার কিশোরী প্রাণের মধ্যে তখন যে যন্ত্রণা ক্রিয়াশীল, নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল। গদাধর তার অনুভূতির ভেতর প্রত্যাশায় ব্যথালাগা বিষ্ণুপ্রিয়ার মানসিক অবস্থাটাকে টের পেল। কথা বলতে গিয়ে তার নিজের গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল। নীরবতাতাকে পীড়া দিতে লাগল। মুখে এক অসহায় উদ্বেগ ফুটল। আচ্ছন্নের মত মাথা নাড়ল,, যার অর্থ নানাবিধ এবং অপরিচ্ছন্ন। আচ্ছন্নতার মধ্যেও আশ্চর্য রকম ভাবে একটা ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল: সে সন্ন্যাসীর সহচর। মায়া, মোহ'র দুর্বলতা তাকে মানায় না। অমনি সমস্ত শরীরটা তার টান টান হয়ে উঠল। নিচু স্বরে বলল: মা, সময় বয়ে যাচ্ছে। তৈরী হয়ে নাও।

শচীর এক অসহায় অবস্থা। নিজের শ্বাসে তার অস্থিরতা টের পেল। কিন্তু তার সমস্ত সত্তা এখন দুরন্ত খরস্রোতের মত সব কিছু ভাসিয়ে প্রবল গতিতে নিমাইর দিকে নিয়ে চলেছে। উজান বাইবার শক্তি তার নেই। আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তার স্নেহ-মমতা পিছু টানছে। কিন্তু প্রবল স্রোতের

---

* সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাইর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

মুখে খরকুটোর মত তা ভেসে গেল। ভেঙে গেল তার সব প্রতিরোধ। অসহায়ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ কী করব বৌমা ?

দুরন্ত একটা আবেগে বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকের ভেতরটা থর থর করে উঠল। নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন। তবু কষ্টে নিজেকে সংযত করল। কিন্তু অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল বুকের ভেতব। অবরুদ্ধ কান্নার আবেগকে গিলে গিলে বলল ঃ মা, আমি তার নিষিদ্ধ ফল। সন্ন্যাসী মানুষ ভুল করে কখনও নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়াবে না। তুমি যাও। ভুলেও আমার প্রসঙ্গ তুমি জিগ্যেস করবে না তাকে। তবে একটা প্রশ্ন কর তাকে ; কোন মানুষ তার কাছে অস্পৃশ্য নয়, কিন্তু আমি অস্পৃশ্য হলাম কেন ? একটু চোখের দেখা দেখতে কি নেই ? আমাকে দেখে যদি চিত্ত চঞ্চল হয়, তা-হলে সন্ন্যাস নিল কেন ? মনে মনে সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছে যখন ছিল তখন জননীর নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গদানের জন্যে আমাকে কেন বিয়ে করল ? আমার জীবনটা কি জীবন নয় ? আমার কি সুখ আহ্লাদ, ভালবাসা থাকতে নেই ? মানুষের দুঃখ কষ্ট বেদনা দূর করা যার ব্রত সে কেন ঘরের মানুষের মর্মব্যথা বুঝল না ?

প্রভুর সমালোচনায় গদাধর আর স্থির থাকতে পারল না। তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। সজল চোখে করুণ গলায় বলল, ঃ দেবী অপরাধ নিও না। আমার প্রভু নিজেও কম দুঃখ ভোগ করে না। নিজে বেদনা না পেলে বৃহত্তর মানব সমাজের বেদনা দূর করার কল্পনা করা যে সম্ভব নয়। বৃহৎ প্রজাপুঞ্জের জন্যে রামচন্দ্র কত দুঃখ দিয়েছিল মা জানকীকে। সন্তান জন্ম দেবার জন্যে মাকেও কত যন্ত্রণা সইতে হয়। পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে তেমনি প্রভুও বেশি আঘাত করছেন, দুঃখ দিচ্ছেন জননী ও জায়াকে, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আর আপন মানুষকে।

আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে বিষ্ণুপ্রিয়া কেমন হয়ে গেল। নিমাইর প্রতি একটা উথলে উঠার ভাব জাগল হৃদয়ের অভ্যন্তরে। নাভিমূল থেকে উঠে আসা একটা গভীর কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিল। ভার ভার গলায় বলল ঃ মা আপনি দেখে আসুন। বড় অভাগিনী আমি। বিশ্বজয়ী সেই মানুষ বোধ হয় আমার স্বপ্নে আর কল্পনায় বাস করবে। তবু, তার জন্যে আমার আকুল প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় কি ?

শচী চঞ্চল হয়ে উঠল। মুখে থমথমিয়ে উঠল কান্না। বলল ঃ এসব

করে বল না বৌমা!

বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে জল। ফোঁপানিতে কেঁদে কেঁদে উঠল বুক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: তিনি সন্ন্যাসী। তাঁর উপর রাগ করব কেন? দুঃখটা আমার কপালের লেখা। বেশ'ত সংসারী ছিল। আমি এলাম আর সংসারে তার মন রইল না। আমি তার সংসার ত্যাগের কারণ, এই দুঃখটা, অপমানটা কিছুতে ভুলতে পারছি না। আমার মন্দ অদৃষ্টের জন্যে এমনটা হল। সে আমাকে ভুলে থাকলেও আমি তাকে ভুলে থাকব না। আমার সমস্ত সত্তায় তার নাম লেখা হয়ে গেছে। আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসের মধ্যে সে আছে। আমি সেই নামেই তাকে অহরহ ডাকব। সে করছে কৃষ্ণের অন্বেষণ, আমি করব তাকে আহ্বান। ভক্তের ডাকে যদি ভগবান আসেন, তবে আমার আরাধনায় তাকে আসতেই হবে। মা-গো যাত্রার আগে আপনিও আমার সঙ্গে একবার বলুন: ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে, যে জন ভজে শ্রী গৌরাঙ্গে, সে হয় আমার প্রাণ রে।

শচীর বুক কেঁপে উঠল। তার একবার ইচ্ছে করল, বিষ্ণুপ্রিয়াকে থামিয়ে দেয়। কিন্তু পারল না। ভিতরে ভিতরে তারও জমি ক্ষয় হচ্ছিল। বোবা বিস্ময়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে রইল। প্রায় রুদ্ধ স্বরে তার সঙ্গে উচ্চারণ করল: ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে।

শচী চলে যাওয়ার পর অস্থির বিষ্ণুপ্রিয়া কতবার যে ঘরবার করল তার ইয়ত্তা নেই। পুকুর থেকে স্নান করে এল। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘরময় পায়চারি করল। কখনো চোখে জল এল, কখনো জানলার ধারে দাঁড়িয়ে স্তিমিত চোখে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। সময় বয়ে যায়। সময়ের স্রোত জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত। এ যেন সময় আর মন একসঙ্গে মিশে চলেছে সমাধানের দিকে।

দূর থেকে মন্ত্র ধ্বনির মত পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল শচী। ক্রমশই সে কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হল। অদ্বৈতের অঙ্গনে পাগলিনীর মত প্রবেশ করে শুনতে পেল মধুর স্বরে তার প্রাণের নিমাই গাইছে:

রাম রাঘব ত্রাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।

গলা মিলিয়ে তার সঙ্গে গাইছে অদ্বৈত শ্রীবাস প্রমুখ বৈষ্ণবেরা।

কয়েকমুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শচী। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে বুকের ভেতর হু হু করে উঠল। চোখের জলে অন্ধ হয়ে এল দৃষ্টি। তারপর শরাহত বিহঙ্গীর মত মর্মান্তিক যন্ত্রণায়, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে ছুটে গেল নিমাইর দিকে। ডাকল: নিমাই! হাহাকারের মত শোনাল তার গলার স্বর।

মুণ্ডিত মস্তক, স্বর্ণকান্তি ঋজুদেহ, কৌপীন ধারী নিমাইর অপরূপ শান্ত, সৌম্য সন্ন্যাস রূপ দেখেই মূর্ছা গেল শচী। মূর্ছা ভাঙল শ্রীচৈতন্যের পরিচর্যায়। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলল। ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন ভাবের ভিতর থেকে ডাকল: নিমাই।

শ্রীচৈতন্য হাসল না বটে, কিন্তু তার মুখে কিছু কোমলতা ফুটল। মধুর কণ্ঠে বলল: আমি আব নিমাই নই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নিমাইর নবজন্ম হয়েছে।

শচী মায়াবী চোখ দিয়ে তার প্রাণের নিমাইকে দেখল। একটু হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল: এ বেশে তোকে দেখব ভাবিনি। সন্ন্যাসী না হলে কী দেশসেবা হয় না?

নিমাইর অধরে হাসির ঝরণা। বলল:

সন্ন্যাসীরে সর্বলোক করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার।
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে।

শচী মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছিল নিমাইকে। চোখের দৃষ্টি কি গভীর। তার স্নিগ্ধ মধুর হাসির ছটায় দীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। পুণ্যের আলোর মত একটা জ্যোতি নিমাইর মাথার চারদিকে যেন ফুটে রয়েছে। উদগত নিঃশ্বাস যেন আটকে গেল শচীর বুকের কাছে, আস্তে আস্তে বলল: আর বাধা দেব না। কিন্তু আমার ক'টা কথা আছে।

বল মা।

সঙ্গী ছাড়া কোথাও একলা যাবে না। তোমার খবরাখবর দিতে আমাকে ভুলবে না। আর তোমার বাবার কথাটা মনে রেখ "তুমা সমর্পিলুঁ আমি জগন্নাথে।" আমারও একান্ত ইচ্ছে তুমি নীলাচলে বাস কর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিস্ময় ও পরম আবেগে চোখ বুজল। মনে মনে বলল:

ঈশ্বর করুণাময়। তার মনের একান্ত ইচ্ছেটাই যেন জননীর মুখ দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যেই সন্ন্যাস গ্রহণ নিয়েছে। সন্ন্যাস হল তার "মহাজাল"। 'রঙ্গই' নয়, 'চাতুরী অপার'ও বটে। রাজানুকূল্য এবং নৃপতির পৃষ্ঠপোষকতা লাভের উদ্দেশ্যে উড়িষ্যার স্বাধীন বৈষ্ণব নৃপতি গজপতি রাজার রাজত্বে নীলাচলে বসবাসের সিদ্ধান্ত করেছে। ঈশ্বর তার অভিপ্রেত কর্মের এক অনুকূল অবস্থা তৈরী করে দিল। ঈশ্বরের আশ্চর্য কৃপার কথা স্মরণ করে শ্রীচৈতন্য কয়েক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। অভিভূত আচ্ছন্ন গলায় ধীরে ধীরে বলল ঃ তাই হবে।

॥ বারো ॥

শেষবারের মত জননী এবং জন্মভূমিকে প্রণাম করে শ্রীচৈতন্য ভাগীরথীর তীর ধরে নীলাচলের পথে যাত্রা করল। এক হাতে পরিব্রাজকের দণ্ড, অন্য হাতে কমণ্ডুল। মুখে কাঁহা গেলে কানু পাই-র আর্তি। সঙ্গে আছে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।

গৌড়াধিপতি নবাব হুসেন শাহের সঙ্গে উৎকল রাজা প্রতাপ রুদ্রের যুদ্ধ চলছিল। তাই, উৎকল ও বঙ্গদেশের সীমানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। গঙ্গা সাগরের সন্নিকটস্থ গ্রাম ছত্রভোগের পাশ দিয়ে পূণ্য তোয়া ভাগীরথী বয়ে গেছে। ঐ নদীই ছিল উভয় দেশের সীমানা নির্দেশক নদী। উভয় তীরে কড়া পাহারা। রাতের অন্ধকারেও ফাঁকি দিয়ে পার হওয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। তাই সীমানা পার হওয়ার কোন ঝুঁকি নিল না শ্রীচৈতন্য।

অপরাহ্ণ। সূর্যের তেজ কমে গেছে। একটা নেভা নেভা ভাব গড়িয়ে আসছে চারদিক থেকে। কেমন একটা রহস্যময় অলৌকিকতায় নদীতীর স্তব্ধ। ভাগীরথীর জলে নেমে স্নান করল চৈতন্য এবং তার সঙ্গীরা। তারপর একটি শাখাবহুল গাছের নিচে বসে তারা সকলে মিলে কৃষ্ণ ভজনা করতে লাগল।

আচমকা নদীতীরে কীর্তনের গান শুনে প্রহরীরা দৌড়ে এল। চৈতন্য

এবং তার সঙ্গীদের ধরে নিয়ে গেল সেনাপতি রামচন্দ্রখানের কাছে। সন্ন্যাসীর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে তার বিস্ময়ের সীমা নেই। অপরাহ্ণের সূর্যের লাল আলোর গোলকটা যেন সন্ন্যাসীর মাথার চারদিকে জ্যোতিশিখার মত ফুটে রয়েছে। তার এক হাতে দণ্ড আর এক হাতে কমণ্ডুল। রামচন্দ্রখানের মনে হল, স্বর্গ থেকে যেন কোন তাপস নেমে এসেছে। তার ভেতর নিদ্রিত হিন্দু-সত্তাটা ভীষণ ভাবে আলোড়িত হল। চমকে উঠল তার ভেতরটা। শিহরিত হল সর্বাঙ্গ। ঈশ্বরের দান সন্ন্যাসীর এই রূপ। যৌবন, নিষ্পাপ, সৌম্য মূর্তি। একটা আরাত্রিক পবিত্রতায় বড় সুন্দর লাগছিল তাকে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। সন্ন্যাসীর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। তার দুই চক্ষু বোজা। নাম গানে বিভোর হয়ে সে গাইছে—

রাম রাঘব ত্রাহি মাম্
কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।

চারদিক অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। কুয়াশা মাখা অন্ধকার গাছপালা ভুতুরে চেহারা নিচ্ছে। উত্তরে হাওয়া এল অদ্ভুত হাহাকারের শব্দ নিয়ে। শেয়াল ডেকে উঠল।

নাম গান থামল। মুগ্ধ চোখ দুটি সন্ন্যাসীর চোখের উপর পেতে রেখে রামচন্দ্র খান বলল: আপনি সন্ন্যাসী। এখানে কেন এলেন?

কথা বলতে গিয়ে সন্ন্যাসীর অধরে স্নিগ্ধ হাসির লাবণ্য ঝরে পড়ল। বলল: নীলাচলে শ্রী জগন্নাথ দর্শনে বড় সাধ হয়েছে।

সেনাপতি রামচন্দ্র খান গম্ভীর গলায় বলল: অসম্ভব গৌড় উৎকলের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। এ অবস্থার গৌড় থেকে উৎকলে যেতে দেয়া যায় না। সুলতানের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা কঠিন ব্যাপার।

নিত্যানন্দ বলল: কিন্তু সেনাপতি মশাই যুদ্ধের জরুরী অবস্থার সঙ্গে প্রভুর জগন্নাথ দর্শনের কোন সম্বন্ধ নেই। ভববন্ধন মুক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজার কোন বিরোধ নেই।

রামচন্দ্র খান দৃঢ়তার সঙ্গে বলল: তবু রাজাদেশ অমান্য করতে পারি না। আপনারা ফিরে যান।

চৈতন্যের অধরে হাসি কিন্তু মুখে কাঠিন্যের দীপ্তি। শান্ত অথচ দৃঢ় মধুর স্বরে বলল: ফিরে যাব বলে'ত আসিনি। সন্ন্যাসীর কোন পিছু টান নেই। তাই তার কোন বাধাও নেই। সত্য সন্ধানী সন্ন্যাসীকেও সব বাধা জয় করে

এগোতে হয়। তোমরা বাধা দিলে আমরা এখানে বসেই নামগান করব। ভক্তের ভগবানকে একদিন সাড়া দিতেই হবে। সেদিন আর কোন নিষেধ থাকবে না।

রামচন্দ্র খানের হিন্দু মনটা ভীষণ নাড়া খেল। একদিন সে হিন্দু ছিল, অনেক কাল পর রক্তের কলধ্বনিতে তার স্পন্দন বাজল। রামচন্দ্র খানের মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেল। তার ভেতর এক অজানা প্রতিক্রিয়া সুরু হল। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে মিলিয়ে গেল।

চৈতন্য আপন সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে মধুর সুরে আবার নাম গান আরম্ভ করল। সঙ্গীরাও তার সঙ্গে গান করে চলেছে তন্ময় হয়ে।

রামচন্দ্র খান আর কথা বলল না। নিঃশব্দে সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিজের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করল। কিন্তু সেখানেও সে স্থির থাকতে পারল না। কতবার ঘর বার করল। চেতনার ভেতরে সমস্ত সত্তার ভেতরে নাম গানের সুর ঝংকারে বাজতে লাগল। ফুরফুরে বাতাস পাক দিয়ে দিয়ে যেন কানের কাছে মিনতি করতে লাগল। বিচিত্র একটা আবেগে রামচন্দ্র খানের বুকের ভেতর লুকনো হিন্দু মনটা টনটন করে উঠল। আগুনে পোড়া সাপের মত ছটফট করতে করতে বাইরে ঘন অন্ধকারে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চুপি চুপি দীন একটা প্রার্থীর মত সে সন্ন্যাসীর কাছে এল। ফিস ফিস করে বলল: কে তুমি?

চৈতন্যের অধরে স্মিত হাসি: আমি সন্ন্যাসী।

না, তুমি কোন দেবশিশু। আমাকে ছলনা করছ।

চৈতন্য হাসল। বলল: হঠাৎ এমন কথা মনে হল কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রামচন্দ্র খানের। বলল: ধর্মত্যাগ করার নিদারুণ অপমানের গ্লানিটা আজও গেল না। তাই'ত চিন্তা করি, ঈশ্বর আমার অপরাধ ক্ষমা করতে নিশ্চয়ই একদিন দেখা দেবেন। আমার বহুকালের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতেই কি এসেছ দেবতা?

রামচন্দ্র খানের থম থমে মুখখানা পিপাসার্তের মত মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখল চৈতন্য! বলল: তুমি কৃষ্ণ ভজ। সব তাপ দূর হয়ে যাবে। মনে শান্তি পাবে। তারপর একটু চুপ করে থেকে ক্ষীণ হেসে বলল: অন্ধকারে থাকা বড় কষ্টের। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা বড় যন্ত্রণার। পতিতের ভগবান

দীনবন্ধু তোমার সব কষ্ট লাঘব করবে।

রামচন্দ্র খান বিস্ময়ে বিমূঢ়। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক ঝলক বাতাস উন্মাদের মত ছুটে এল তার দিকে। আলোড়িত হয়ে উঠল তার বুকের ভেতর। সম্বিৎ ফিরে পেল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ঃ সন্ন্যাসী তুমি কে জানি না? কিন্তু আমার বুকের ভেতর কেমন একটা তোলপাড় করছে। বেশ বুঝতে পারছি, একটা কিছু ঘটবে। তোমার ঐ দেবদূতের মতন মূর্তি দেখলে মন ভরে যায়। তোমার জন্যে প্রাণ দেয়াও বোধ হয় কঠিন কাজ নয়। তুমি শুধু কৃপা করে বল কে তুমি?

শ্রীচৈতন্য চোখ বুজে ধীর স্বরে স্বগতোক্তির মত করে বলল ঃ পিছনের সব ইতিহাস মুছে ফেলেছি। সন্ন্যাসীর অতীত বলে কিছু নেই।

ক্লান্ত রামচন্দ্র খানের চোখ বেয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা অভিমানের কান্না। বহুদিন পর বুক ভাসানো এক অভিমান অনুভব করল আজ। আর এই কান্না শুধু নিজের জন্যে। অবরুদ্ধ গলায় অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ তবু, আমার কাছে লুকোচ্ছ তুমি। কিন্তু আমার মন বলছে তুমিই সে। আমার প্রাণের চেয়ে তোমাদের প্রাণের দাম অনেক বেশি। তোমার মত সন্ন্যাসীকে দেশ ও দশের বড় দরকার।

রামচন্দ্র খানের কান্না দেখে নিত্যানন্দর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। পরের জন্যে নিজের প্রাণটা যে তুচ্ছ করতে পারে, তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ খুঁজে পেল না নিত্যানন্দ। শ্রীচৈতন্য তাকে কিছু না বললেও চৈতন্যের আত্মপরিচয় লুকনোর কারণ সে জানে। তার উৎকল যাত্রা হুসেন শাহের কোন সন্দেহ যাতে উদ্রেক না করে সে জন্যেই চৈতন্যের পরিচয় এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু রামচন্দ্রের চোখের জল নিত্যানন্দের সব গণ্ডগোল করে দিল। রামচন্দ্র খানের মত অত প্রাণ দিয়ে ভালবাসুক তো কেউ দেশকে।

নিত্যানন্দ খুব শান্তভাবে চৈতন্যের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা তাকে চঞ্চল করে তুলল। সহসা উৎফুল্ল হয়ে বলল তুমি ঠিক বলেছ। উনি সেই মানুষের বহু প্রত্যাশার মানুষ। নবদ্বীপ সূর্য শ্রীচৈতন্যদেব।

রামচন্দ্র খান কথা খুঁজে পায় না। বুকের ভেতর তার প্রগাঢ় ভক্তি উথলে উঠল। আবেগ গাঢ় স্বরে বলল ঃ প্রভু, ধন্য করলে আমায়। তোমার

দর্শন পেয়ে চরিতার্থ হলাম আমি। আমার আর কোন ভয় নেই। আমি তোমাকে উৎকলে পেঁছে দেয়ার সব ব্যবস্থা করছি। এই রাতেই তোমরা যাত্রা কর। রাতের অন্ধকারে অমার বিশ্বস্ত মাঝিরা তোমাদের নিরাপদ জায়গায় পেঁছে দেবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃত্রিম শংকার গলায় বলল : তোমার কি হবে?

রামচন্দ্র খান বেপরোয়া ভাবে একটু হাসল। বলল : কি আর হবে? কপাল পুড়বে। যেমন একবার হয়েছে।

চৈতন্য গম্ভীর গলায় বলল : শ্রী কৃষ্ণ তোমাকে করুণা করবে।

প্রয়াগঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। নদীর ধারেই মহেশ মন্দির। সঙ্গীদের সঙ্গে স্নান করে একত্রে শিবলিঙ্গ দর্শন করল চৈতন্য। তারপর, সঙ্গীদের নাট মন্দিরে বিশ্রাম করতে বলে একাকী ভিক্ষা করতে বার হল। নিত্যানন্দ তাকে একা ছাড়তে রাজী হল না। বলল : আমি হব তোমার সঙ্গী।

চৈতন্য মাথা নাড়ল। অধরে স্নিগ্ধ হাসি! বলল, না, ভাই নিত্যানন্দ তা-হয় না। তোমরা আমার সহযাত্রী। তোমাদের সুখ-সুবিধা দেখা আমার কর্তব্য।

তোমাকে দেখা আমাদের কর্ত্তব্য।

কত ক্লেশ করলে তোমরা। এখন তোমাদের একটু সেবা করতে দাও ভাই। আমার পথে নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী আমি। তুমি বাধা দিও না ভাই। আমাকে যেতে দাও।

নিত্যানন্দর কোন কথা শুনল না চৈতন্য। একাকী ভিক্ষায় বেরিয়ে গেল। উদ্দেশ্য, ঘুরে ঘুরে নতুন স্থানটি সম্বন্ধে খোঁজখবর সংগ্রহ করা। সঙ্গীরা থাকলে এই কাজটা গোপনে সম্পন্ন করতে বাধা হতে পারে বিবেচনা করেই তাদের এড়িয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত নিজের মত ঘুরল এবং প্রচুর ভিক্ষা নিয়ে মহেশ মন্দিরে ফিরল। তারপর আহারাদি করে যাত্রা করল।

বিরাট বড় আকারে যুদ্ধ বাধবে হুসেন শাহের সঙ্গে উৎকল সম্রাট প্রতাপরুদ্রের। সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব নীলাচলে পৌঁছনো জরুরী।

শুরু হল অবিশ্রান্ত পদযাত্রা।

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। কত গ্রাম, নগর, জনপদ অতিক্রম করে নীলাচলে পদার্পণ করল। কণ্ঠে তার সুমধুর সঙ্গীতের মূর্ছনা : জগন্নাথ

স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে।

বহুদূর থেকে জগন্নাথ মন্দিরের চূড়ার চক্র এবং তার পতাকা দেখা যাচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে কেমন উন্মাদ হয়ে গেল। জগন্নাথের মূর্তি দর্শনের জন্যে তার অন্তরটা ব্যাকুল ও অস্থির হল। পথের ক্লান্তি ঘুচে গেল। চলার বেগ লাগল পায়ের ছন্দে। আলোর জ্যোতির মত এগিয়ে চলল। সামনের দিকে প্রসারিত দুটি হাতের মুদ্রায় ফুটে উঠল অদৃশ্য দেবতার কাছে আত্ম-নিবেদনের বিনম্র আকৃতি। ঝর্ণার মত উদ্দাম বেগে সে পুরীর মন্দিরের দিকে ধেয়ে চলল। তার দুর্বার গতির সঙ্গে সঙ্গীরা ছুটে পারল না। বহু পশ্চাতে পড়ে রইল তারা।

মন্দিরের সিংহ দরজার প্রহরীদের কিছু বুঝে উঠার আগেই শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেবের মন্দিরের সোপানশ্রেণী পার হয়ে একেবারে মন্দিরে প্রবেশ করল। জগন্নাথদেবের বেদীর উপর লুটিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ একটা দারুণ উত্তেজনা নিয়ে দৌড়ে আসার শ্রান্তি জনিত অবসাদেই সে মূর্ছা গেল।

মূর্ছা ভাঙলে দেখল সে একটি কক্ষে শুয়ে আছে। আর তার মুখের খুব কাছে এক বৃদ্ধের মুখ দেখল। চোখ মেলতেই নিত্যানন্দ উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল: এখন কেমন বোধ করছ?

শ্রীচৈতন্য বিভ্রান্ত বিস্ময়ে প্রশ্ন করল: আমি কোথায়? আমার কি হয়েছিল?

নিত্যানন্দ বলল: তুমি মূর্ছা গিয়েছিলে। রাজপুরোহিত জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ বাসুদেব সার্বভৌম তোমাকে তাঁর গৃহে এনে পরিচর্যা করে সুস্থ করেছেন। তাঁর কৃপায় তোমাকে এ যাত্রায় ফিরে পাওয়া সম্ভব হল।

শ্রীচৈতন্য একটু হেসেই বলল: এসেই রাজদর্শনের পুণ্য করেছি। তা কোথায় তোমাদের বাসুদেব সার্বভৌম?

নিত্যানন্দ বলল: তোমার সামনেই বসে আছেন তিনি।

সর্বেভৌমের দিকে চেয়ে অদ্ভুত হাসল শ্রীচৈতন্য। বলল: জগন্নাথের কৃপায় আমার এক পরমাত্মীয় লাভ হল।

সে কথা শুনে বাসুদেব সার্বভৌমের রক্তস্রোত কিছু উদ্দাম হল। বুকের ভেতর সহসা কেমন করে উঠল। বিস্ময়ে উচ্চারণ করল: আত্মীয়!

পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্রর মুখে শুনেছি আপনি তাঁর সহপাঠী।

বাসুদেব সার্বভৌমের মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বলল : আশ্চর্য! তুমি জগন্নাথের পুত্র! দ্যাখত, ঈশ্বরের কি অদ্ভুত যোগাযোগ। বড় দুঃসময়ে তুমি শ্রীক্ষেত্রে এসেছ। তাই অকারণ কতকগুলো দুর্ভোগ তোমাকে ভোগ করতে হল। এখন চতুর্দিকে যুদ্ধের কড়াকড়ি।

সরল চোখ তুলে প্রশ্ন করল চৈতন্য : আমার কি হয়েছিল?

সার্বভৌম বলল : তুমি জগন্নাথের বেদী স্পর্শ করে মূর্ছা গিয়েছিলে। প্রহরীরা, পাণ্ডারা বিচার না করে অচৈতন্য অবস্থাতেই তোমাকে তারা নির্দয় ভাবে প্রহার করছিল। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম, নইলে একটা অঘটন কিছু হত। হয়ত তোমাকে মেরেই ফেলত।

শ্রীচৈতন্যের মুখে নিষ্পাপ হাসি। বলল : সবই জগন্নাথের ইচ্ছে। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া তাতে সহজ হল। যোগাযোগের একটা সেতু তৈরী হল। আমি একটা আশ্রয় পেলাম। রাজপুরোহিতের স্নেহধন্য হওয়া কি কম কথা!

উৎকলে পা দিয়েই মনে হল, নবদ্বীপের সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থার সঙ্গে উৎকলের তফাৎ কিছু নেই। নবদ্বীপে যে রকম চারিত্রিক অবনতি এবং মানুষের অধঃপতন ঘটেছিল, তারই প্রতিচ্ছবি উৎকলে, কলিঙ্গে।

কলিঙ্গ বিজয়ের পর সম্রাট অশোক যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিল কলিঙ্গ ভূখণ্ডে সেই জন সমাদৃত ধর্ম নিঃশেষিত। বৌদ্ধধর্মের সৌম্য অহিংস মূর্তি অপসৃত। সেখানে আধিপত্য বিস্তার করছে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম। যে ধর্মে ধর্মানুষ্ঠানের থেকে অনেক বেশি ব্যাভিচারিতা। ধর্মের নামে নির্লজ্জ যৌনতার কদাচার চলছে অবাধে। নারী শুধু বিলাস আর ব্যাভিচারের যন্ত্র। রাজা প্রতাপ রুদ্র ধর্মপ্রাণ। কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্য এবং গৌড়ের আক্রমণে বিব্রত এবং দিশাহারা। রাজকার্য দেখাশোনার চেয়ে যুদ্ধ পরিচালনার কাজে বেশি ব্যস্ত। রাজকার্য দেখাশোনা করছে কার্যত মন্ত্রীবর গোবিন্দ বিদ্যাধর। গোবিন্দ বিদ্যাধর ক্ষমতালোভী এবং কুট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ফলে, দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে এবং মানুষের চারিত্রিক উন্নতির প্রতি কারো কোন দৃষ্টি নেই।

বাসুদেব সার্বভৌম রাজপুরোহিত। রাজগুরু। বিরাট পণ্ডিত। জ্ঞানের

সাগর কিন্তু পাণ্ডিত্যে তাঁর অহংকার। মানুষের আধ্যাত্মিক চিত্ত বিকাশের কোন চিন্তাই তার নেই। নিজের বিদ্যার অহংকার ও দম্ভ নিয়ে রাজগুরুর আভিজাত্য ও গৌরব নিয়ে সার্বভৌম সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরেতে বাস করে। শ্রীচৈতন্যের মনে হল এই মানুষটির জ্ঞানের অহংকার, পাণ্ডিত্যের গর্ব এবং আভিজাত্যের গৌরববোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভক্তিমার্গের উদার প্রাঙ্গনে যদি টেনে আনা যায় তা-হলে উৎকলের ধর্মক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর আনা সম্ভব হবে। কলিঙ্গ ও উৎকলের মানুষের মনে রাজগুরুর প্রভাব ও সম্ভ্রমবোধকে কাজে লাগাতে পারলে রাজশক্তির আনুকূল্য লাভও হবে সহজ। কলিঙ্গের বৈষ্ণব সংস্কৃতির নেতারূপে বাসুদেব সার্বভৌম চিহ্নিত হলে এই রাজ্যের ধর্মীয় জীবনে এবং সামাজিক জীবনে এক নব বিপ্লব সৃষ্টি হবে।

খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে অল্পদিনের ভেতর তার এক আশ্চর্য সুযোগ এল শ্রীচৈতন্য কেমন আছে জানতে বাসুদেব সার্বভৌম স্বয়ং উপস্থিত হল কাশীনাথ মিশ্রের গৃহে। তার নিজ গৃহে অসুস্থ শ্রীচৈতন্যকে রাখা নানাদিক দিয়ে অসুবিধা ছিল। তাই, কাশীনাথ মিশ্রর নিরিবিলি গৃহে তার বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। হঠাৎ সেখানে বাসুদেব সার্বভৌমের অপ্রত্যাশিত আগমন শ্রীচৈতন্যকে অবাক করল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলল: আপনি!

মাথা নেড়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল: কেমন আছ দেখতে এলাম। চৈতন্যের বুক কেঁপে উঠল। এক অজানা স্পন্দনে তার হৃৎপিণ্ড আন্দোলিত হল। এক সুধা মাখা হাসিতে তার মুখখানা অনির্বচনীয় হয়ে উঠল। বলল: বড় ভাল লাগছে।

সার্বভৌন চৈতন্যের মুখের উপর চোখ পেতে রেখে বলল: কৌতূহল এক অদ্ভুত জিনিস। এত অল্প বয়সে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করায় আমি খুব আশ্চর্য বোধ করছি। শুনেছি তোমার মেধা ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ। তবু, পাণ্ডিত্যে তুমি উদাসীন কেন? জানতে পারলাম কাটোয়ার কেশব ভারতীয় কাছে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছ। তোমার গুরু নির্বাচন প্রশংসা করতে পারলাম না। যাই হোক তুমি যখন আমার খুব কাছেই এসে পড়েছ, তখন তোমাকে নব্য-ন্যায়শাস্ত্রের এবং বেদান্তের কিছু পাঠ দিতে চাই। আমার প্রস্তাব যদি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তা-হলে একদিন আমার চতুষ্পাঠীতে এস। বেদান্ত শ্রবণ করা সন্ন্যাসীর বিধেয়।

চৈতন্য স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। একটা অদ্ভুত শিহরণ স্পর্শ করে গেল

তাকে। বিস্ময় লাগল, স্বয়ং জগন্নাথ যেন আগে থাকতে সব কিছু স্থির করে রেখেছে তার জন্যে। পলকের জন্যে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দেখিয়ে দিয়ে গেল তার মুখ। তবু রহস্যময় রয়ে গেল কিছু। এখন শুধু অপেক্ষা আর পরীক্ষা। চৈতন্য পিপাসিতের মত মুগ্ধ চোখে সার্বভৌমের দিকে চেয়ে রইল। উদ্দীপ্ত এক আনন্দ আর সুখানুভূতি নিয়ে সে মাথা নাড়ল। ক্ষীণ হেসে বলল: আমার পরম সৌভাগ্য আপনার কাছে পাঠ নেয়া।

সপ্তাহকাল ধরে সার্বভৌম তাকে শিক্ষাদান করল। কিন্তু চৈতন্য এক দিনের জন্যে কোন কৌতূহল, কিংবা ঔৎসুক্য দেখাল না। কোন প্রশ্ন পর্যন্ত করল না। সার্বভৌম পাঠ দিতে দিতে বিস্ময়ে থমকে গেল বহুবার! কিন্তু চৈতন্যের স্তব্ধ গাম্ভীর্য, নীরবতা দেখে প্রশ্ন করতে কোন সাহস হল না। অবশেষে ধৈর্য হারাল। তাকে নিরুত্তর দেখে বিরক্তও হল। কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করল: বৎস, আমার পরিশ্রম বোধ হয় বৃথা গেল। তুমি বোধ হয় কিছু অনুধাবন করতে পারছ না।

চৈতন্যর ঠোঁটের পাতা সামান্য নড়ে উঠল। কিন্তু কথা বেরোল না। সার্বভৌম একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করল: তুমি কি আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়াও সমীচিন মনে কর না?

আচার্য আমার প্রত্যুত্তরে আপনি শুধু দুঃখ পাবেন। আপনার অভিমান আঘাত পাবে। তাই জবাব এড়িয়ে যেতে চাই।

তোমার প্রগলভতা আমাকে বিস্মিত করছে। তোমার স্পর্ধা আমার কৌতূহল উদ্রেক করছে। পাণ্ডিত্যে আমার অহংকার আছে। কিন্তু যুক্তিকে শ্রদ্ধা করি। তুমি কি বলতে চাও বল।

আচার্য, আপনি যে পাঠ দিয়েছেন আমি তা পুনরাবৃত্তি করছি। শুনুন! সার্বভৌম তার উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর, অবিকল পুনরাবৃত্তিতে বিস্মিত, অভিভূত। চৈতন্য আবৃত্তি সমাপ্ত করে বলল: আচার্য, আপনার ব্যাখ্যা ভুল। স্থূল। গতানুগতিক। আপনি শ্লোকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। চিরাচরিত, সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথার বাইরেও যে একটা বিশাল জগৎ আছে, আপনার বিচার বিশ্লেষণে পর্যবেক্ষণে তা ধরা পড়েনি। হৃদয়চর্চা ছেড়ে শুষ্ক শাস্ত্রচর্চা করলে ভালবাসার পুকুর শুকিয়ে যায়, আবেগ ফুরিয়ে যায়। আন্তরিকতার স্পর্শ পর্যন্ত থাকে না।

সার্বভৌম বেশ একটু ক্ষুব্ধ এবং বিচলিত হল। কুপিত স্বরে বলল:

তোমার বাগচাতুরী বন্ধ কর। যা বলবে সরাসরি, স্পষ্ট বল। তোমার সাহস, প্রত্যয় আমাকে মুগ্ধ এবং কৌতূহলিত করছে। আমার ব্যাখ্যা যে ভ্রান্ত প্রমাণ কর।

আপনি বলছেন ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের কোন ভেদ না থাকলেও স্বগত ভেদ আছে। যেমন গাছ এক, কিন্তু তার ডাল পাতা ফুল পৃথক পৃথক। সব মিলিয়ে কিন্তু গাছ। তেমনই ব্রহ্ম এক, জগতের অন্যান্য সব স্বগত ভেদ। একথা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে এই ভেদ প্রতিভাস মাত্র অর্থাৎ, আত্মভ্রান্তি। আপনি বিভেদের কথা বোঝাতে জীবের অস্থি ও বিষ্ঠার দৃষ্টান্ত টেনেছেন। এই দুই বস্তু অপবিত্র তাই সর্বত্র পরিত্যাজ্য এবং অস্পৃশ্য। এই বিশ্লেষণও অত্যন্ত স্থূল। পৃথিবীর কোন কিছুই পরিত্যাজ্য নয়, অস্পৃশ্য নয় যদি তার ভেতর পবিত্রতা থাকে। শঙ্খ জীবের অস্থি মাত্র, কিন্তু পবিত্র। শঙ্খধ্বনি না করলে কোন পূজোই হয় না। বিষ্ঠা হয়েও গোময় শুচিতার অঙ্গ। তা-হলে অস্থি ও বিষ্ঠাকে অস্পৃশ্য বলে মাঙ্গলিক কর্ম থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয় নি।

বাসুদেব সার্বভৌম স্তম্ভিত। তবু অহংকার যায় না। দর্পের সঙ্গে প্রশ্ন করল: তাহলে বেদ কি?

বেদ আত্মার সত্তা ও স্বরূপ। স্বপ্রকাশই বেদ।

বাসুদেব সার্বভৌম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বলল: এ রকম অদ্ভুত কথার মানে কি?

চৈতন্য তীক্ষ্ণ চোখে সার্বভৌমের দিকে চেয়ে বলল: বিষ্ঠা ও অস্থির মধ্যে যদি পবিত্রতা থাকে তা-হলে তা স্পর্শ করতে গ্রহণ করতে বাধা নেই। তা-হলে মানুষ কেন অস্পৃশ্য হবে! দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক এবং আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক। সব মানুষই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ যদি হয় তা-হলে চণ্ডাল, মুচি, মেথর কেন অস্পৃশ্য কেন অপাংক্তেয়? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে জনরথের রশি ধরাধরি করে এই সমাজের বুকের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে। সকলের শ্রমের, কর্মের, সেবার, ত্যাগের মূল্য যখন সমান, তখন সমান গৌরব থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে কেন? আচার্য, আপনি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আপনাকে বোঝানোর বিদ্যা আমার নেই। মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড় সংকটই আজ ভারতবর্ষের সব সমস্যার মূল কথা। এই সংকট দূর না হলে, কোন সামাজিক উন্নতি হবে না। একটা

শূন্য বলয় গড়ে উঠছে প্রতিবেশীর সঙ্গে নিজের, জাতির সঙ্গে ধর্মের, এমন কি একই ধর্মের এবং ভাষার লোকের সঙ্গে নিজের। এসব'ত আপনার বেশি করে টের পাওয়ার কথা। পুঁথির বাইরেও যে একটা পৃথিবী আছে তার দিকে চোখ পড়ে না পণ্ডিতদের। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের তৈরী কারাগারে বাস করছে।

বাসুদেব সার্বভৌম নিজের ছোট চৌকির উপর পা মুড়ে বসে একটু থমকে চৈতন্যের দিকে চেয়ে আছে। তাঁকে খুব বিমর্ষ এবং চিন্তিত মনে হল। চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা শূন্যতা। মুখের এক পাশে কিছুটা আলো পড়েছে, আর একটা পাশ বেশ কিছুটা অন্ধকার জমে আছে। দেখার মত দৃশ্য। আসলে, সার্বভৌমের ভেতরটা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল। শরীরের ভেতর যন্ত্রণার মত কিছু টের পাচ্ছিল। মাথাটা ঘোলাটে। প্রতিবাদ করতে পারল না।

চৈতন্য একটু অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। মৃদু স্বরে বলল: আচার্য, আপনাকে আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আপনার অগাধ পাণ্ডিত্যের বেড়া ভেঙে, নিজের চারপাশের তৈরী কারাগারকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে একেবারে নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে সকলকে আলিঙ্গন করে বলুন, আমরা সবাই সমান। আমরা কেউ ছোট নই। আমরা মানুষ। একই বিশ্বস্রষ্টার সন্তান। আমরা অমৃতের পুত্র। আমাদের কেউ অস্পৃশ্য নয়।

চৈতন্যের প্রতিটি কথা সার্বভৌমের বুকের ভেতর আলোড়িত হল। নির্জন প্রকোষ্ঠে একা নিঃসঙ্গ হয়ে চিন্তা করতে করতে বারংবার মনে হল, চৈতন্য স্বধর্মাচরণে যে ঈশ্বর লাভের কথা বলেছে তা বিষ্ণুপুরাণেও আছে।

বর্ণাশ্রমা চারবতা পুরুষেণঃ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুবারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষ কারণম্॥

চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমে সকলের জন্যেই নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য কর্ম আছে। বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদনে নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে কর্মাচরণই বিধেয়। স্বধর্মাচরণেই ভগবদ্ভক্তি হয়। স্বধর্ম বলতে বা যে বর্ণ বা আশ্রমে অবস্থিত সেই বর্ণ বা আশ্রমের নিমিত্ত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্তব্য কর্মকে বুঝায়। এই স্বধর্ম যথাযথ আচরণ করলে বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ভক্তি হয়। বিষ্ণু এখানে সাধ্য এবং মুখ্য সাধ্য, ভক্তি এখানে সাধনাঙ্গরূপে সাধ্য অর্থাৎ গৌণ সাধ্য।

শ্রীচৈতন্য তার ব্যাখ্যাকে আরো প্রাঞ্জল করার জন্যে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে যে কথাগুলো বলেছিল, সার্বভৌমের কানের ভেতর তা তীব্র ঝংকারে

বাজতে লাগল। "মানুষ যেমন আত্ম ও পরিবার রক্ষার্থে অর্থোপার্জনের জন্যে নানারকম কর্ম করে, তেমনি আত্মশান্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষার্থে পরিজন ও পরিবেশের শান্তি বিধানের জন্য নানারকম কাজের মধ্য দিয়ে পরোপকার, দান ধর্মাদি করে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা, পূজার্চনা ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করে এক জাতীয় মনোবৃত্তি চরিতার্থ করে ধর্মাচরণের চেষ্টা করে-এটাও তার স্বধর্ম। তবে এই ধর্মাচরণ ফলাকাঙ্খাযুক্ত। আপনার প্রতি বা দশের প্রতি যে কর্ম আসক্তি দ্বারা সাধিত সেই কর্মই আবার ভগবৎ সাধ্য লক্ষ্যে নিজের ও সকলের সুখকরী ও শান্তিকরী বাসনা পোষণ করে যখন নানাবিধ উপায় অবলম্বনে সাধিত হয় তখন তাই ভক্তি আখ্যাত হয়ে থাকে।"

জ্ঞানী বাসুদেব সার্বভৌমের সব যুক্তি তর্ক যেন এই বক্তব্যের কাছে হার মেনে যাচ্ছে। চৈতন্যের ব্যাখ্যার মধ্যে এমন কিছু অসাধারণত্ব আছে, যার অভিনবত্ব দিকটা তাকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করছে, তার ব্যক্তিত্ব, তার জ্ঞান তাকে মোহিত করে ফেলছে। একটু একটু করে তার ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ যেন বাসুদেব সার্বভৌমকে তার দিকে টানতে লাগল। নিজের অজান্তে একান্ত ভাবাবিষ্ট হয়ে তাকে আবিষ্কার করার এক নাছোড় নেশায় নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে রইল।

তবু এতবড় একটা পরাজয়কে বাসুদেব সার্বভৌম নিঃশব্দে মেনে নিতে পারল না। লোকে কি বলবে? পণ্ডিতেরা কি ভাববে? তার এতকালের সাধনা, যশ, খ্যাতি, শ্রেষ্ঠত্ব সব হারিয়ে কি নিয়ে থাকবে? এতবড় একটা শূন্যতা নিঃস্বতা তাকে কি দিতে পারে? ভিতরে তার এক তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হল। নিজের ভেতরের অস্থিরতাকে চাপা দিতে সে উঠে দাঁড়াল। এবং এক ঝলক বাতাসের মতই সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

সাতদিন সাতরাত্রি কাটল। অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্র হল। কি করা যায় কিছুই ভেবে স্থির করতে পারল না সার্বভৌম। কতবার মনে হল চৈতন্য তাকে মহৎ কিছু করার জন্যেই ডেকেছে। বহুকালের বিশ্বাস সংস্কারকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। তবু, অভিমান ত্যাগ করতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। নিজের দ্বন্দ্বে নিজেকে শুধু ক্ষতবিক্ষত করছিল। একজন তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে যেচে গিয়ে পরাজয় স্বীকার করা ভারী অপমানের।

কথাটা ভাবতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ল। বাস্তবিক চৈতন্য শুধু বুদ্ধিমান নয়, প্রবল তেজস্বী এবং সুতার্কিক। প্রথাবিরোধী কথা বলার দুঃসাহসও তার

আছে। চৈতন্য তার বন্ধুপুত্র। তারও পুত্রতুল্য। বয়সে প্রচুর ব্যবধান। তবু সে তার সমস্ত মনটাকে প্রবলভাবে তার দিকে টানছে। কেমন করে যেন একটু শ্রদ্ধা করতেও আরম্ভ করেছে। এই শ্রদ্ধাবোধের পিছনে যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান। পুরুষমানুষের সর্বশ্রেষ্ঠগুণ ব্যক্তিত্ব তেজ দৃপ্ত সাহসে বলিষ্ঠতা ও প্রত্যয়। বুদ্ধি মেধা অন্যান্য সাফল্যের চেয়েও ব্যক্তিত্ব বলিষ্ঠতা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সার্বভৌমের মনে হল ব্যক্তিত্ববান তাকেই বলা যায়, যে ঘৃণাকে ভালবাসতে, সুন্দরকে আলিঙ্গন করতে, শুভকে অভিনন্দন জানাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। যে হাজার হাজার বছর ধরে মেনে চলা সত্যকে, লক্ষ লক্ষ লোকে বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সত্যকে সত্য বলতে ভীত হয় না। সৌভাগ্যক্রমে সে আজ সেই বিরল ব্যক্তিত্ববান তরুণের সান্নিধ্য পেয়ে সার্বভৌমের ভেতরটা গৌরবে আনন্দে টৈটুম্বুর হয়ে গেল। এই অল্প বয়সেই যার এই বিপুল শক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সে কিরকম হতে পারে তার একটা কাল্পনিক চিন্তা তাকে বিভোর করে রাখল। সন্ন্যাস জীবনের ঊষালগ্নে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের গঠন এবং কর্মধারা যে পরিচয় বহন করে আনল তা যেমন আশাপ্রদ তেমনি আনন্দদায়ক।

কাজেই শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে অবশ্যই ভাবনা চিন্তা করার আছে। সে বিনয়ী এবং নম্র! তার উচ্ছাস নেই গভীরতা আছে। তার ভদ্রতাবোধ, সৌজন্য উদাহরণযোগ্য। দয়া মমতার হৃদয় হওয়া সত্ত্বেও তার অভ্যন্তরে ইস্পাত কঠিন এক দৃঢ়তাও আছে। দুঃসাহস প্রকাশ পাচ্ছে তার প্রগাঢ় দায়িত্বজ্ঞানে এবং প্রখর কর্তব্যবোধে। সুতরাং চৈতন্যকে শ্রদ্ধা না করে, তাকে অনুসরণ না করে কোন রক্ত মাংসের মানুষ, সে যে বয়সের হোক, থাকতে পারে না। এখন তার নিজের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কারো প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনে বলল: আমি চৈতন্যের কাছে সব স্বীকার করব। বিশ্ব জুড়ে প্রাণের যে অবিরল প্রকাশ ঘটছে আমরা তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। জীবজগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কখনও কথাগুলো ভাবিনি। কোনদিন মনে হয়নি একটা মানুষকে অস্পৃশ্য করে দেখা একটা ঘটনা। আজ তুমিই ভাবতে শেখালে যে কেবল ব্যক্তিগত হারানোর কথা ভেবে বিষণ্ণ হয় সে জ্ঞানবান নয়। তুমিই আমার অভ্যন্তরে ঘুম ভাঙালে। নিদ্রোত্থিতের মত চারদিক চেয়ে দেখছি তুমিই সত্য। তোমার বুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে। তোমার দুটি চোখ দিয়ে

আমাকে জগৎটা দেখাও।

সার্বভৌমের খুব অবাক লাগল। দীর্ঘ একটা সময় ধরে নিজেকে আবিষ্কার করার একটা উত্তেজনায় তার ভেতরটা আলোড়িত হল অনেকক্ষণ ধরে। মাথাটা কেমন করে উঠল। সার্বভৌম সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

প্রতাপরুদ্র দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তখন যুদ্ধে লিপ্ত। মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর বিশেষ দূতের মাধ্যমে সমরক্ষেত্রেই রাজাকে সার্বভৌমর হৃদয় পরিবর্তন এবং ভাবোম্মদনার সংবাদ দিল। দূত আরো জানালো সুদূর গৌড়ের নবদ্বীপ থেকে হোসেন শাহ প্রেরিত এক ধর্ম-পাগল সন্ন্যাসী এসেছে। অষ্টপ্রহর সংকীর্তন করে সে ঈশ্বরোপসনা করে। সে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী। সাধারণ সন্ন্যাসী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার কোন জাত ধর্ম নেই। সমস্ত মানুষকে সে আলিঙ্গন করছে। মানুষের কোন বাদ বিচার করে না। তার কাছে ছোট বড় উঁচু নীচ, অস্পৃশ্য বলে কেউ নেই। তার এই অদ্ভুত আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপে বহুকালেব সামাজিক বাধা নিষেধেব, ভেদাভেদের জীর্ণ প্রাচীরটা ধসে পড়েছে। এমন কি রাজ-পুরোহিত সার্বভৌমকেও সে জাদু করেছে। তার গৃহ প্রাঙ্গণ এখন সর্বজাতির এবং সম্প্রদায়ের মানুষের সংকীর্তন সম্মেলনে পরিণত হয়েছে। রাজ পুরো-হিতের এহেন উম্মাদনায় রাজ্যব্যাপী এক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের শুচিতা রক্ষা করাই এখন সমস্যা হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ সমাজের বিধি বিধান ভাঙার উন্মাদনায় উন্মত্ত। দেশের আইন শৃঙ্খলার রাশ টেনে ধরা এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। এরকম ভাবে আরো কিছুদিন চললে প্রতিবেশী গৌড়, রাজ্যব্যাপী অরাজকতার সুযোগ নিয়ে উৎকল আক্রমণ করতে পারে। রাজপুরোহিতের কার্যকলাপ প্রশাসনের পরিপন্থী। এখনই তাকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। অরাজকতা রুখতে দেশব্যাপী নাম সংকীর্তন নিষিদ্ধ হওয়া জরুরী।

এ রকম এক আশ্চর্য সংবাদে প্রতাপরুদ্রর বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। নিজের মনেই প্রশ্ন করল, কে এই সন্ন্যাসী! খুব অল্পদিনের মধ্যে মানুষের হৃদয়ে এত বড় একটা উম্মাদনা জাগাল, কোন মন্ত্রবলে? সার্বভৌমের মত জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, সুতার্কিক পণ্ডিত, রক্ষণশীল আচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণও যার সংস্পর্শে

আমূল বদলে যায়, সে কখনও সাধারণ মানুষ নয়। এই অসাধারণ সন্ন্যাসী গোবিন্দ বিদ্যাধরের দুর্ভাবনা ও আতঙ্কের কারণ হচ্ছে কেন? সন্ন্যাসী, হোসেন শাহ প্রেরিত হবে কেন? প্রতাপরুদ্রের বিবেচক মনটি কিছুতে এই স্থূল কথাটা মেনে নিল না। বেশ বোঝা গেল, গোবিন্দ বিদ্যাধব উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে রাজাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।

প্রতাপরুদ্র নিজের মনেই হাসল। গোবিন্দ বিদ্যাধরের ভেতর খল মানুষকে দেখতে পেল। মনে মনে বলল : গোবিন্দ বিদ্যাধর তুমি খল, চতুর, কিন্তু প্রতাপরুদ্রও নির্বোধ নয়। তোমার স্বভাব, চরিত্র আমি অবহিত কিন্তু বড় একটা সংকটে আছি। দেশের দু'দিক থেকে দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রেব দ্বারা আক্রান্ত। তাই বড় নিরুপায় আর অসহায় হয়ে তোমাকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে।

গোবিন্দ বিদ্যাধরের প্রেরিত সংবাদটি ভাল কবে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে করতে প্রতাপরুদ্র সহসা তার গোপন অভিসন্ধিটি যেন টের পেল। হোসেন শাহের নামোল্লেখ তার কাছে খুবই তাৎপর্য পূর্ণ মনে হল। মানুষ নিজের অজান্তে তার অপরাধমূলক কাজকর্মর ইংগিত রেখে যায় তার কাজের ভেতর। গোবিন্দ বিদ্যাধর সন্ন্যাসীর নামের সঙ্গে হোসেন শাহের নামটিকে জড়িয়ে এক নতুন সন্দেহ সৃষ্টি করল প্রতাপরুদ্রের মনে। তবে কি হোসেন শাহের সঙ্গে কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে সে? পূর্ব সীমান্তে গড় মান্দারণ দুর্গ রক্ষার সমস্ত ভার গোবিন্দ বিদ্যাধরকে দিয়েছে। হোসেন শাহের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে কি তবে বিশ্বাসঘাতকতা করছে? গড় মান্দারণ দুর্গের পতন ঘটিয়ে, সন্ন্যাসী এবং সার্বভৌমের নামে দেশব্যাপী অরাজকতার অভিযোগ তুলে রাজ্যের লোকের কাছে রাজার অযোগ্যতা, প্রমাণ করার ফন্দী যে এ নয়, কে বলতে পারে?

দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের দেখাশোনার ভার রায় রামানন্দের উপর অর্পণ করে প্রতাপরুদ্র উৎকলে ফেরা মনস্থ করল।

রাজধানীতে পৌঁছে রাজপুরোহিত সার্বভৌমকে সর্বাগ্রে ডাকল। সার্বভৌমকে দেখে রাজার বুক কেঁপে গেল। বিস্ময়ে দুই চোখ স্থির। রাজার চোখের পলক পড়ে না মোটে। বার বার নিজেকে প্রশ্ন করল, এ কাকে দেখছে? সার্বভৌমের সেই পাণ্ডিত্যের গর্ব, অহংকার, ব্যক্তিত্বের তেজ কোথায়? এ যে নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। সমস্ত গাম্ভীর্য, প্রখরতা বিলীন হয়ে

গেছে। সৌম্য শান্ত, স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মত এক অপরূপ ক্লান্তিতে তাকে বরং ভাল লাগছে। আচার্যের এ রূপ এ দৃশ্য আগে কখনও দেখা হয় নি। দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল প্রতাপরুদ্রের।

উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ গলায় ডাকল ঃ প্রভু এ কি দেখছি। এ-ত রূপ নয়. রূপের মাধুরী। এত জ্যোতি এল কোথা থেকে ?

যখন সত্যদর্শন হয় তখন আত্মা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। তখন আর বিরোধ থাকে না। আমারও বোধ হয় আজ কোন বিরোধ নেই নিজের সঙ্গে নিজের, আত্মার সঙ্গে ধর্মের, মানুষের সঙ্গে আচার প্রথার, বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির।

প্রতাপরুদ্রের দুই চোখে অবাক বিস্ময়। কয়েকটা মুহূর্ত থমকে স্তব্ধ হয়ে রইল। তাব অবাক হওয়া এবং চমকে যাওয়ার মধ্যে একটা সমীহ এবং ভয়ের ভাব ছিল। রাজা বিনীত ভাবে একটু হাসল। খুব চিন্তিত ভাবে বলল ঃ গুরুদেব, এখন আমি দু'দিক দিয়ে আক্রান্ত। ঠিক এ রকম একটা সময়ে নবীন সন্ন্যাসী ভারতবর্ষের এত রাজ্য থাকতে আমার রাজ্যে নতুন ধর্ম বিপ্লবের সূচনা করলো কেন ? এতে আমার শুধু সংকটই সৃষ্টি হচ্ছে। গৌড়ের সঙ্গে এমনিতে একটা যুদ্ধ চলছে। এই অবস্থাতে কলিঙ্গে জনমানসের চিন্তা ধারায় আপনারা দু'জনে মিলে যদি গৌড়ীয় ধারায় রূপান্তরিত করার কোন বৃহৎ উদ্যোগ করেন তা-হলে লোকে তাকে সন্দেহের চোখেই দেখবে। শত্রুরা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা একে স্পষ্টতঃ রাজদ্রোহ বলবে।

সার্বভৌম শান্ত মুখখানা তুলে ধরে বলল ঃ মহারাজ যাদের মতের স্থির নেই, যারা মানুষ হিসাবে খুব বিশ্বাসযোগ্য কিংবা আস্থাভাজন নয়, তাদের সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। তাদের কে কি বলল, ভাবল, তাদের প্রতিক্রিয়া আমি গণ্য করি না। আজ, আপনার পরম সৌভাগ্য যে শ্রীক্ষেত্রে স্বয়ং জগন্নাথ তাঁর পুতুল বিগ্রহ ত্যাগ করে মানুষের ভেতর সচল রূপ পরিগ্রহ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেন এক জ্যোতির্ময় আলোকের দ্যুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের মধ্য দিয়ে। তিনি আলোর দূত। তিনি সচল দারু ব্রহ্ম।

এত আপনার স্তুতি। শুধু নাম সংকীর্তনে লোকের কি উন্নতি হবে ?

গণচেতনা বাড়বে। পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার পথ খুলে দেবে। বিভেদ লুপ্ত হবে। ঘৃণা, বিদ্বেষ দূর হবে, আমরা যে সকলে এক বিশ্বপিতার

সন্তান, এই বোধ ও অনুভূতিতে ঐক্য ও সংহতি দানা বাঁধবে। প্রতিবেশী-সুলভ মনোভাব পরস্পরকে নিবিড় সৌভ্রাত্র সূত্রে বাঁধবে। মানুষের আত্মিক উন্নতির এক বিরাট দিগন্ত খুলে যাবেই, এ কি কম কথা!

রাজা প্রতাপরুদ্র এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না। প্রতিক্রিয়ার বদলে শুরু হল তার ভিতরে বিচার বিশ্লেষণ এবং সমাধানের চেষ্টা। বলল: বৈষ্ণব ধর্মতো পরকীয়া প্রেমে পূর্ণ। রাধা কৃষ্ণর প্রেমের সঙ্গে বামাচারী তান্ত্রিকের পার্থক্য কোথায়? পরকীয়া প্রেম'ত চরম ব্যাভিচার। সুতরাং এই ধর্ম কিছুতে রাজ্যের নৈতিক অবনতি ঠেকাতে পারবে না। নাম সংকীর্তনের আবেগের ঘোর কেটে গেলে পরকীয়া তত্বের নামে সামাজিক ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে। সুতরাং রাজ্যের স্বার্থে জনগণের কল্যাণে সন্ন্যাসীর নাম সংকীর্তন আমি নিষিদ্ধ করব।

মহারাজ!

গুরুদেব, আপনি কেন বুঝতে চেষ্টা করছেন না, গৌড়ের সঙ্গে উৎকলের এখন যুদ্ধ চলছে। বহুলোক তাঁকে গৌড়ের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছে। নইলে যুদ্ধকালীন কঠিন নিষেধাজ্ঞাকে ফাঁকি দিয়ে দলবল নিয়ে গৌড় থেকে উৎকলে আসল কেমন করে? ধর্মপ্রাণ উৎকলবাসীকে ধর্মের নামে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য। সে ভাল করে জেনে-শুনে রাজগুরুকেই প্রথমে বশ করেছে।

মহামান্য প্রতাপরুদ্র! আমাকে তিনি বশ করেননি। আমি নিজে তাঁর অনুগত হয়েছি। তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছি। দুর্ভাগ্য, মহাপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহান কর্ম আপনি দেখেও দেখছেন না। রাজা হয়েও জানেন না, আপনার জন্যে কি অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি। আপনাকে যারা বিভ্রান্ত করছে তারা কেউ সত্যকথা বলেনি। ঘটনাকে কেবল বিকৃত করেছে।

বিকৃত!

বিকৃত ছাড়া কি? যুদ্ধে বিব্রত দেখে আপনাকে একটু স্বস্তি দিতে সকলের অলক্ষ্যে চৈতন্য একদিন গৌড়ে যাত্রা করলেন। তাঁর এই যাত্রার কথা খুব ঘনিষ্ঠ পার্শ্ব সহচরেরা পর্যন্ত জানতে পারল না। তিনি চলেছেন হোসেন শাহের দক্ষিণ হস্ত দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের কাছে। নীলাচল এবং গৌড়ের সকল লোক জানে তিনি চলেছেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের পথ পরিবর্তন

করে এক সময় গৌড়ের পথ ধরলেন। রামকেলি গ্রামে রাতের অন্ধকারে একাকী ছদ্মবেশে হোসেন শাহের দুই বিশ্বস্ত কর্মচারী দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

প্রতাপরুদ্রের মুখে স্মিত হাসিটা লেগেই ছিল। এখন তা হাসিতে উজ্জ্বল হল। এক অপরূপ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল : তা-হলে, লোকে'ত একেবারে মিথ্যে বলে নি।

সম্পূর্ণ মিথ্যে বলেছে। সত্য গোপন করেছে। মহারাজ হোসেন শাহ যদি এই সাক্ষাতের কথা জানত তা-হলে চৈতন্যের উদ্দেশ্য বাণচাল হয়ে যেত। রাজনৈতিক সন্দেহের ঊর্দ্ধে থাকার জন্যেই সব কাজ গোপনে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে হয়েছে। কেন হয়েছে শুনবেন? হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুরাজ্যকে বিধর্মীর হাত থেকে রক্ষাব জন্যে হুসেন শাহকে দুর্বল করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী। তাঁর বাহুবল, লোকবল নেই। শুধুমাত্র বুদ্ধি সম্বল করে এক বিরাট জয় আদায় করে নিলেন। দুই বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীই হোসেন শাহের সব শক্তি ও সম্পদ। এরা হল দবীর খাস আর সাকর মল্লিক। একজন বুদ্ধি ঐশ্বর্য অন্যজন শক্তি ও অহংকার। এদের দুজনকে হোসেন শাহের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে হোসেন শাহেব রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা ধূলিসাৎ হবে। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বে। হিন্দুধর্মের স্বার্থে এদের দু'জনকে সরিয়ে হোসেন শাহের শক্তিকে অকেজো করে দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাতে ধন্য হল তারা। তিনি তাদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষাগ্রহণ করে তারা হল যথাক্রমে সনাতন ও রূপ। প্রভুর ইচ্ছেয় তারা কৌশলে রাজকর্ম থেকে বিদায় নিল। হোসেন শাহ কিছু বোঝার আগেই রূপ পালিয়ে বৃন্দাবনে চলে গেল। আর সনাতন হোসেন শাহের সন্দেহভাজন হয়ে কারারুদ্ধ হল। এখন আপনিই বিচার করুন, এ কি গুপ্তচরের কাজ? রাজদ্রোহের কিছু? বলুন। মহারাজ চুপ করে থাকবেন না। পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ থেমে গেছে, কিন্তু বিদ্যাধর নিজের স্বার্থে সেখানে যুদ্ধের উত্তেজনা রেখে দিয়েছে। আমার কাছে খবর আছে, হোসেন শাহকে আপনার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে। এবং একটা অশান্তিকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্যে হোসেন শাহের সঙ্গে একটা গোপন বোঝাপড়াও হয়েছে তার। মহারাজ প্রকৃত নিঃস্বার্থ বন্ধু আর কর্তব্যপরায়ণ নীরব কর্মীকে সহজে'ত চেনা যায় না। চিনতে ভুল হয়।

প্রতাপরুদ্র স্তব্ধ। সিংহাসনের উপর চুপ করে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। শরীর যেন প্রাণহীন, স্পন্দনহীন। বিহ্বল হতভম্ব চোখে বাসুদেব সার্বভৌমের মুখের দিকে বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল। আর, ভিতরে একটি প্রার্থনা নীরবে মাথা কুটছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রতি বাঁধন ছেঁড়া আকর্ষণ তাকে আকুল করে তুলল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্খলিত কণ্ঠে বলল : গুরুদেব, সেই সন্ন্যাসীর কাছে আমার অপরাধ হয়েছে অনেক। অনুতাপ, অনুশোচনায় বুক জ্বলছে। একবারটি আমি তাঁকে দেখব। আপনি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।

সার্বভৌম একটু চিন্তা করে বলল : তীর্থ ভ্রমণ থেকে প্রভু ফিরে এলে সাক্ষাৎকারের একটা চেষ্টা করে দেখব।

সমুদ্রতীর ধরে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ পথের দিকে চলেছে। উদ্দেশ্য দুই হিন্দু রাজ্য উৎকলের প্রতাপরুদ্র এবং বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় এর মধ্যে দীর্ঘ-কালের বিরোধ মিটিয়ে তাদের একত্রিত করে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করা। উভয়েই বৈষ্ণব রাজা। নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকার জন্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিঘ্ন ঘটছিল। এই ধারা অপসারিত না হলে বৈষ্ণবধর্ম মতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তোলা যাবে না। তাই এই বিরোধ আগে মেটানোর দরকার হল। কিন্তু কাজটা খুব কঠিন ছিল।

উভয় রাজ্যের কেউ নয় শ্রীচৈতন্য। একজন ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী মাত্র। আবার বিদেশীও বটে। রাজনীতির ব্যাপারে সরাসরি কিছু বলার কোন অধিকার তার নেই। এতে রাজনৈতিক ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা খুব বেশি। কারো মর্যাদা এবং গৌরবকে ছোট না করে, বিভ্রান্তিকে এড়িয়ে গিয়ে সবরকম রাজনীতির বাইরে থেকে এই সংকটের প্রতিকারের একটা উপায় করতে চৈতন্য বিজয়নগরের রাজগুরু ব্যাসরায়ের সঙ্গে গোপনে মিলিত হওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে সে দেশে পা রাখল।

উপস্থিত হল পুণ্যময় কৃষ্ণার তীরে। কৃষ্ণার জলে স্নান করে সিক্তবসনে স্নানঘাটের একপ্রান্তে বসে দু'চোখ বুজে বিভোর হয়ে হাতে তালি দিয়ে দুলে দুলে গাইতে লাগল : কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব—পাহি মাম্।

স্নানার্থীদের ভীড় হয়ে গেল।

চৈতন্যদেবের জানা ছিল এই ঘাটেই রোজ পুণ্য স্নান করতে আসে

ব্যাস রায়। এ সংবাদ রামানন্দই দিয়েছিল তাকে। ব্যাস রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎটা যে তার পূর্বপরিকল্পিত কিংবা উদ্দেশ্যমূলক কিছু নয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক এই প্রত্যয়টা ব্যাসরায় এবং বিজয়নগরের মানুষের মনে বদ্ধমূল করে রাখতেই স্নানঘাটই সবচেয়ে নিরাপদ এবং বিশ্বাস-যোগ্য স্থান বলে মনে হল। এখানে সর্ব জনসমক্ষে তাদের পরস্পরের সাক্ষাতের প্রথম বিস্ময় কৌতূহলী জনতার অনেকদিন মনে থাকবে।

দর্শক স্নানার্থীরা বিস্ময়ে অভিভূত। নবীন সন্ন্যাসী তার গানের ভিতর নিজেকে উজার কবে দিল। তখন তার অনির্বচনীয় স্বর্গীয় কণ্ঠস্বরের মাধুর্য সকলের হৃদয়কে আপ্লুত করল। তাদের ভেতরটা প্রসারিত হয়ে গেল। সন্ন্যাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে তারাও দুলে দুলে হাতে তালি দিয়ে গাইতে লাগল কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম।

এখন একটা ভাবোন্মদনা মুহূর্তে রাজগুরু ব্যাসরায়ের দোলা এসে থামল সেখানে। ব্যাসরায় দোলা থেকে নেমেও অবাক। দর্শক স্নানার্থীদের কেউ আজ তাকে দেখে সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল না। সোপান থেকে অবতরণের জন্য কেউ দৌড়ে এল না। তার আগমনের দিকে কেউ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েও ছিল না। প্রশস্ত স্নানঘাট লোকে লোকারণ্য। সকলে নামগানে মাতোয়ারা। তার দাসেরা চেষ্টা করেও অবতরণের পথ করে দিতে পারল না। ব্যাসরায়ের ভীষণ অপমান লাগল। ঠিক বুঝতে পারছিল না, একজন সন্ন্যাসী এতগুলো মানুষের ভেতরটা এমন ওলট পালোট করে দিল কেমন করে?

কীর্তন থামল।

ব্যাসরায়কে ভীড় ঠেলে আসতে দেখে দর্শনার্থীরা সঙ্গে গিয়ে তাঁর রাস্তা করে দিল। কিন্তু কৌতূহল এক অদ্ভুত জিনিস। ব্যাসরায় চেষ্টা করে দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। সন্ন্যাসীকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল। দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

সন্ন্যাসীর অরুণালোকের মত গৌরবর্ণ দীর্ঘ তবু দেহে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক অপার্থিব সৌন্দর্য। বোজা দুই চোখে দুটি যেন অনেক অনেক দূরে এক অনন্ত আনন্দলোকের অপার মহিমায় নিমগ্ন। ব্যাসরায় সেই আশ্চর্য প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না। বিদ্যুৎ চমকানোর মত মনে হল, কোন স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু যেন করুণা করে পুণ্যার্থী মানুষদের

দর্শন দিতে এসেছে। প্রশ্ন জাগল, কোন ঈশ্বর লাভ হলে মানুষ অমন শান্ত, নিরুদ্বেগ থাকতে পারে? সে নিজেও প্রতিদিন সহস্র কমলে, সহস্র স্ফটিক-পাত্রে অপর্যাপ্ত নৈবেদ্য, গন্ধ ধূপ আর মহার্ঘ মনিমুক্তার উপাচার সাজিয়ে রুদ্ধ মন্দিরে বিরাট চিত্তে শ্রদ্ধাকারে রঙ্গনাথজীর পুজো করে ভক্তিভরে। কৈ অমন নির্ভরতা'ত অনুভব করে না। আসে না'ত এমন প্রশান্তি। তাকে দেখে'ত কারো প্রাণে এমন প্রাণের প্রদীপ জ্বলে উঠে না। কথাগুলো মনে হওয়া থেকে কেমন হয়ে গেল। দুটি চোখ পেতে রাখল সন্ন্যাসীর মুখের উপর।

ব্যসরায়ের থমথমে গম্ভীর মুখখানার দিকে চেয়ে চৈতন্য কৌতূহলী ব্যক্তিটিকে বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর শ্রীময় মুখখানা ভরে একটা ভারী সুন্দর হাসি হাসল। ব্যাসরায়ের ভিতরে মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। বিহ্বল হতভম্ব চোখে কিছুক্ষণ ব্যাসরায় চেয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারছিল সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে তার ভেতরটা আকুল হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসীর অধরে সেই অনির্বচনীয় হাসির মাধুর্য তখনও লেগে আছে। সে হাসি মানুষকে শুধু কাছে টানে, হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে। ধীর পদক্ষেপে ব্যাসরায় সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে গেল। সংস্কৃতে জিগ্যেস করল: প্রভু আপনি কে?

সন্ন্যাসীর শ্রীময় মুখখানা ভরে মায়াবী হাসি তার ব্যক্তিত্বকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। সকালের রোদ যেন পুণ্যের আলোর মত ঝড়ে পড়ছে তার মুখে। চৈতন্য তখন আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত। দুই হাত প্রসারিত করে দিয়ে আহ্বান করল সংস্কৃতে। আগে আলিঙ্গন দাও ভাই। আপনি'ত রাজগুরু ব্যাস রায়।

সম্মোহিতের মত ব্যাসরায় সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করল। বুকে বুক লাগতে কেমন শির শির করে উঠল ভেতরটা। আলোড়িত হয়ে উঠল তার সমস্ত চেতনা। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় কেমন যেন বিভোর হয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। একটা স্পর্শেই যেন তার ভেতরটা ওলোট পালোট হয়ে গেল। সম্মোহিতের মত আচ্ছন্ন গলায় বলল: আপনাকে আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু আমার নাম, পরিচয় আপনি জানলেন কেমন করে?

অঙ্গারের দাহিকা শক্তিই তার পরিচয়। নীলাচলে দাক্ষিণাত্যে বিদ্যানগরে দুই মহাপণ্ডিত এবং শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সার্বভৌম ভট্টাচার্য রামানন্দ রায়ের মুখে আপনার গুনগান অনেক শুনেছি। তীর্থ দর্শনের পথে কৃষ্ণের কৃপায় রাজগুরু দর্শন হয়ে গেল। তাঁদের বর্ণনা থেকেই আপনাকে চিনতে পেরেছি।

ভালই হল, অল্প আয়াসেই আপনার দর্শন পেলাম।

কিন্তু আপনার পরিচয় ?

সন্ন্যাসীর'ত কোন পরিচয় থাকে না ! সে শুধুই সন্ন্যাসী। একজন কৃষ্ণ ভক্ত মাত্র।

তবু, সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার নতুন নামকরণ হয়।

নিমাইর দক্ষিণ ভারত পর্যটনের অন্যতম পার্ষদ কৃষ্ণদাস প্রভুকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে বলল : উনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। গৌড়ের পণ্ডিতোত্তম বিশ্বম্ভর। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে তর্ক যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।

ব্যাসরায়ের অপলক দুই নেত্রে মুগ্ধ বিস্ময়। অভিভূত আচ্ছন্ন গলায় বলল : আপনার পাণ্ডিত্যে যশ খ্যাতি বিচক্ষণ অবগত আছি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে পর্যটনে বেরিয়েছেন এ সংবাদও আমি পেয়েছি। ভালই হল আপনার দর্শন পেয়ে। কিন্তু, আপনি আছেন কোথায় ?

আমি সন্ন্যাসী। সর্বত্রই আমার ঘর। এখন পূণ্য সলিলা কৃষ্ণার তীরেই আমার বাসস্থান।

ব্যাসরায় খুব আগ্রহ নিয়ে বলল : অনুগ্রহ করে আপনি আমার গৃহে অবস্থান করুন।

শ্রীচৈতন্য ভারী সুন্দর করে একটু হাসল। বলল : মহাত্মন, নীল আকাশের নীচে বসলে মনটা বহুদূর প্রসারিত হয়ে যায়। এখানে কোন বন্ধন নেই। সবটাই মুক্ত আর অবারিত। তাই গৃহের বন্ধনে আর মন বসে না। আপনি বরং, উন্মুক্তপ্রাঙ্গনে নেমে আসুন তা হলেই আপনার সঙ্গে সমতা বোধ করব। আমরা বন্ধু হতে পারব।

বন্ধু কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল ব্যাসরায়ের। সে স্পষ্ট টের পেল তার বুকের ভেতরটা কাঁপছে। আর কি এক আশ্চর্য আনন্দে ভেতরটা ভরে উঠেছে। বিষণ্ন গলায় বলল : আমি সামান্য রাজসেবী বিষয়াসক্ত বৈষ্ণব। আপনার মত মহান সাধু ব্যক্তির বন্ধু হতে পারা'ত ভাগ্যের কথা। কিন্তু আপনার মত অকাতরে গৃহের সুখ, আরাম প্রত্যাখ্যান করা হয়ত কঠিন। তবু গৃহী ও সন্ন্যাসীর বন্ধু হতে বাধা নেই। আপনার কথা যত শুনছি তত বিস্ময় বাড়ছে। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে হৃদয় নুয়ে পড়ছে।

শ্রীচৈতনন্য ব্যাসরায়ের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থেকে ক্লান্ত স্বরে বলল : মহাত্মন, এখনও আপনার স্নান হয়নি। আমিও ভিক্ষায় বেড়োব।

সন্ধ্যের পর আমরা পুণ্য সলিলা কৃষ্ণার তীরে বসে দুই বৈষ্ণব মিলে কৃষ্ণনাম আলোচনা করব।

ব্যাসরায় স্নানার্থে সোপান শ্রেণী অবতরণ করে জলে নামল। অনেকক্ষণ ধরে ডুব দিয়ে স্নান করল। কিন্তু প্রতিবারই এক অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। চোখ বন্ধ করে জলে ডুবলে সন্ন্যাসীর মুখখানা ভেসে উঠে। আর তার সেই মুখখানি ব্রজের কৃষ্ণের মুখ হয়ে যায়। হাতে তার বাঁশরী নেই। পার্শ্বে রাধিকাও নেই। কিন্তু অধরে আছে প্রেমময় কৃষ্ণের অনির্বচনীয় সেই মধুর হাসিটি। কখনও সেই মূর্তি বিষ্ণুর মত চতুর্ভুজ। কখনও শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী সন্ন্যাসী। ব্যাসরায়-এর বিস্ময়ের শেষ নেই। বিবশ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

রঙ্গনাথজীর পূজায় মন বসল না। সন্ন্যাসীর কথা ভাবতে লাগল। যত ভাবে তত বুকটা আনন্দে বিষাদে উথাল পাথাল করে। নিজের সঙ্গে সন্ন্যাসীকে তুলনা করতে গিয়ে মনটা আরো দীন হয়ে যায়। চোখ ভরে এল জলে। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতির কোন মানে হয় না। তবু বুকটা কেমন করছিল।

সময় কত দীর্ঘ আর মন্থরগামী—ব্যাসরায় অনুভব করছিল। দিন যেন কাটতে চায় না। চোখ বুজতেই সন্ন্যাসীর নরুণ কাটা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল সামনে।

সন্ধ্যা হলে ধীরে ধীরে উঠল ব্যাসরায়। তার ভিতরে এক অফুরন্ত কৌতূহলই তাকে শ্রীচৈতন্যের কাছে টেনে নিয়ে গেল। গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে টানা রাস্তা ধরে কৃষ্ণার স্নান ঘাটের দিকে হাঁটতে লাগল।

ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পৃথিবীময় নরম চাঁদের আলো। বন ফুলের গন্ধের সঙ্গে রাতের গন্ধ, জ্যোৎস্নার গন্ধ মিশে গেল।

ব্যাসরায় ধীর পায়ে এগিয়ে যেখানে চৈতন্যদেব ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিল সেখানে প্রণাম করে ধূলো মাথায় নিল। খুব মৃদুস্বরে বলল: সন্ন্যাসী, কৌতূহল, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভালবাসার এক জ্বালাধরা অনুভূতি ঘরে থাকতে দিল না।

শ্রীচৈতন্য হাসল। তার উদাস উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি যেন ব্যাসরায়ের পার্থিব শরীর ভেদ করে বাইরে চন্দ্রালোকিত কৃষ্ণা নদীতে প্রসারিত হয়ে গেছে।

শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল: আপনার আগমন এক নতুন মানে

নিয়ে এল। আমরা পরস্পরে বন্ধু হলাম।

ব্যাসরায় দুই চোখে আগ্রহের দীপ জ্বেলে বলল : প্রভু আমাকে ছলনা করবেন না। আমার ধ্যানের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে আপনার স্বরূপ দর্শন করেছি। আপনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীচৈতন্যের অধরে মধুর হাসি। বলল : আমি সামান্য বৈষ্ণব। একজন কৃষ্ণ সেবক। আপনিও তাই। আপনার মনের অভ্যন্তরে কৃষ্ণ দর্শনের আকুতিই ধ্যানে ও কল্পনায় প্রকাশ পেয়েছে। এ হল আপনার মনের প্রতিক্রিয়া। মনের ভেতর নির্দেশ এসেছে কৃষ্ণ ভজন। যখনি চিত্তে জেগেছে সে বাণী, তখনি দেখেছেন তাকে মনের গভীরে, ধ্যানের নেত্রে। হয়ত রঙ্গনাথজী চাইছে, আপনিও আমার সঙ্গে কৃষ্ণ ভজনা করুন।

কথাগুলো শুনতে শুনতে ব্যাসরায়ের শরীরের ভেতর শির শির করে উঠল। কি মিষ্টি কি মধুর সেই স্বর। আশ্চর্য একটা অনুভূতিতে বুকের ভেতরটা তার থরথর করে কেঁপে উঠল।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর চৈতন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : সাধারণ মানুষ কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠুক এই আমি চাই। সমাজ থেকে ব্যভিচার, বৈষম্য, ঘৃণা বিদ্বেষ দূর করতে, প্রেমে মানুষকে সুন্দর করতে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে, ঐক্যবদ্ধ করতে হরিনামের মত আর গান নেই। হরিনাম হল শপথের মন্ত্র, ঐক্যের বাণী, ভালবাসার গান, হরিনাম শুধু আকর্ষণ করে না, উদ্দীপিত করে। কিন্তু হরিনাম তার নিজের প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

ব্যাসরায় নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে শ্রীচৈতন্যের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল : পাবে কোথা থেকে ? ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর সম্মান দিয়ে'ত মানুষের সমস্ত সম্পর্কের ভিত গড়ে ওঠে এই ভিতটার গোড়া এমন আলগা হয়ে গেছে যে পুরো হিন্দু সমাজটা আজ কুসংস্কারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ভালবাসার পুকুর শুকিয়ে গেছে বলেই বর্ত্তমান পরিস্থিতি এত জটিল।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে দোষ দিলে বোধ হয় আমাদের প্রত্যেকের নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে থাকা হয়। কেননা, এ-ত আমার আপনার দ্বারাই সৃষ্ট এক অবস্থা। এ থেকে বেড়িয়ে আসার চাবি কাঠিও আমাদের হাতেই আছে। শুধু একটু প্রাণ মন দিয়ে চাইলেই বোধহয় আমরা বন্ধ তালাটা

খুলে দিতে পারি।

ব্যাসরায়ের গায়ে কাঁটা দিল। শ্রীচৈতন্যের প্রত্যয়, তেজ, বিশ্বাস কোন একটা সীমায় কখনও আঁটবে না। উপছে যাবে বিশাল পৃথিবীর দিকে। যেমন গৌড়কে পূর্ণ করে উপছে গেছে নীলাচলের দিকে। নীলাচলকে পূর্ণ বা অপূর্ণ রেখে আবার উপছে গেছে দাক্ষিণাত্যের দিকে। নিজের কূলে লাগার গভীরে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দে বলল: সন্ন্যাসী তুমি সাধারণ মানুষ কিংবা সন্ন্যাসী নও। তোমাকে জানা কারো কোনদিন ফুরোবে না, সেই জানার সঙ্গে তোমার চেনাও শেষ হবে না কোনদিন। আকাশের পূর্ণ চন্দ্রের মত শ্রীচৈতন্যর ভাস্বর মূর্তি ব্যাসরায়ের চেতনায় জ্বল জ্বল করতে লাগল। অভিভূত আচ্ছন্ন গলায় বলল: এই অবিশ্বাসের যুগেও আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন বিশ্বাসী প্রাণ আছে। যে মানুষ এখনও সততা, সত্যবাদিতা, আন্তরিক উদ্যোগ নিষ্ঠা বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে মানুষকে, ভালবাসাকে ধর্মকে। আমার স্বপ্নের ধ্যানের, সেই মানুষটি হলেন আপনি। আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

চৈতন্য চমকে তাকাল তার দিকে। অবাক লাগল ভীষণ। কৃষ্ণের কৃপায় এবং ইচ্ছেয় তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ সে পেল। জীবনের মূল প্রশ্নের সমাধান অনেক সময় এমনই অপ্রত্যাশিত এবং দ্রুত হয়ে যায়। প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানা। স্নিগ্ধ আর প্রশান্ত গলায় বলল: মহামান্য রাজগুরু আপনার মত ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৈষ্ণব ধর্ম সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু দায়িত্ব যদি নিজ নিজ অঞ্চলে গ্রহণ করে তা-হলে হিন্দুর এবং বৈষ্ণবের বড় উপকার হয়। প্রত্যেক কৃষ্ণ ভক্তকে এই কথাটা বোঝাতেই আমি পর্যটনে বেরিয়েছি। আজ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পথে একদিকে আগ্রাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্রাজ্য ও ধর্ম বিস্তারের উন্মাদ আকাংখা যেমন বাধা অন্য দিকে তেমনি দুই হিন্দু রাজার বিরোধও বৈষ্ণবধর্মের প্রসার বিস্তারের পথে অন্তরায়। হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষাও কঠিন হয়ে পড়েছে। একদিকে বিজয়ী মুসলমান সুলতান অন্যদিকে বিজয়ী হিন্দুরাজা উভয়েই জয়ের পর নিরীহ হিন্দুদের হত্যা করছে। মুসলমানরা তাদের জোর করে ধর্মান্তর করছে। হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন কমছে। হিন্দুর এত বড় সর্বনাশ নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। এই অবস্থা চলতে থাকলে কিছুকালের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সংহতি

পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। হিন্দুর এতবড় একটা সংকটের পাশে রাজা, মহারাজা, রাজগুরু, রাজপুরোহিতের দাঁড়ানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ, আমরা সবাই কর্তব্য ভুলে, নীরব দর্শক হয়ে আছি। হিন্দুর এই নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন স্বভাবের রন্ধ্র পথ ধরে তার সর্বনাশ প্রবেশ করছে।

ব্যাসরায় দিশেহারা বোধ করল। চৈতন্যের কথাগুলো তোকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। তার ইংগিতটাও বুঝতে পারল। কিন্তু কি করার আছে? কিছু করার নেই বলে শুধু ভাবাটা থাকে। ফুরফুরে একটা হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল সব সময়। সেই হাওয়াটা গভীর ভাবে তাকে ছুঁয়ে গেল। অতীতের অনেক কথাই প্রসঙ্গ'ত মনে এল। উৎকলের সঙ্গে যুদ্ধটা তিন পুরুষ ধরে চলছে। কৃষ্ণদেব রায়ের পিতামহ দেবরায়ের রাজত্বকাল থেকে চলে আসছে। মর্যাদার সে লড়াই এখনও অব্যাহত রয়েছে। একপক্ষ আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তার শেষ হবে বলে মনে হল না ব্যাসরায়ের। বুকের অভ্যন্তর থেকে একটা গভীর শ্বাস পড়ল ধীরে ধীরে। বলল : আপনার কথাগুলো ভীষণ সত্য। এখনি ভয়ংকর হিন্দু সংহার বন্ধ করার জন্যে কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না। এ হল রাজমর্যাদার লড়াই। আপনি আমার কর্তব্য নির্দ্দেশ করুন।

আমি সামান্য সন্ন্যাসী। রাজনীতির জটিলতা, মান-মর্যাদার কূট লড়াইর কিছু বুঝি না। তবে আমরা প্রত্যেকে মানুষ। মানুষের মননশীলতার কাছে তার হৃদয়ের কাছে'ত আবেদন করতে পারি। মানুষ'ত আর অবুঝ নয়, হৃদয়হীন নয়। কেবল ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটা পেঁাছে দিতে পারলেই হল।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ব্যাসরায় প্রশ্ন করল : আমাকে কি করতে হবে ?

হিন্দুকে বাঁচাতে হবে, তাদের নিরাপদ করতে হবে। বৈষ্ণব ধর্মকে দিকে দিকে প্রসারিত করে দিতে হবে। মানুষের সম্প্রীতি এবং ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হবে। বিজয়নগরের অতীত ইতিহাস'ত আপনার অজানা নয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের পিতামহ দেবরায় মুসলমান সুলতানদের ক্রমার্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করতে দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি গড়ে তোলেন। বিজয়নগর শুধু হিন্দুর নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের। মুসলমানদের মনে তার আস্থা বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে সিংহাসনের সামনে একটি কোরাণ রাখা হল। সৈন্যবাহিনীতেও মুসলমানের যোগাযোগের অধিকার থাকল। ধর্মাচরণেও পূর্ণ স্বাধীনতা পেল। এই সম্প্রীতি

সম্ভাব আর ঐক্যের সুদৃঢ় ভিতের উপর গড়ে উঠেছে আজকের বিজয়নগর। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের'ত এ তথ্য অজানা থাকার নয়। তিনিও উদার। নিজে বৈষ্ণব হলেও অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ভাব নেই। সুতরাং তাঁর মত মহান একজন মানুষকে বৈষ্ণবধর্মের প্রহরী করে তোলার দায়িত্বও রাজগুরুর। তিনিই রাজধর্মের রক্ষক পরামর্শদাতা। রাজাকে পরামর্শ'ত দিতে পারেন, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্যে, এবং ধর্মক্ষেত্রে একটা সঠিক বিপ্লব ঘটানোর জন্যে বৈষ্ণম রাজাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন, শত্রুতা ভুলে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাত্রর পরিবেশ গড়ে তোলা তাঁদের একান্তই কর্তব্য। নইলে হিন্দু বাঁচবে না, বৈষ্ণব ধর্মও থাকবে না। আসুন আমরা বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করি। কথাগুলো চৈতন্যের স্বরে শপথের বাণীর মত ঝঙ্কারে বাজল! তার উত্তোলিত মুখ ব্যসরায়ের মুখোমুখি স্থির। আর তার অধরে হাসি যেন বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে উঠল। আর কি অপরূপ দেখাল তাকে।

ব্যসরায়ের বুকের মধ্যে তরঙ্গ বয়ে গল। একটা কিছু ভিতরে স্পদন তুলল। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শে তার চোখমুখকে উজ্জ্বল করে দিল। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না।

স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে নিস্পলক চেয়ে থাকল চৈতন্যের দিকে। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে চৈতন্যের শ্রীময় মুখখানা। সম্মোহিতের মত ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ব্যসরায়। বলল: আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

ব্যাসরায় উঠতে যাচ্ছিল। একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল: তাহলে কাল প্রত্যুষে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমি সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় থাকব।

চৈতন্য একটু হাসল। বলল: প্রত্যুষে আমি স্থানান্তরে যাত্রা করব। অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস হয়ে দীর্ঘকাল গৃহছাড়া তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। একসঙ্গে ভারত দর্শন ও বিশ্বরূপ অন্বেষণ হবে।

ব্যাসরায়ের একটু অবাক লাগল। ভাবল, এ কেমন সন্ন্যাস? সন্ন্যাসীর'ত মায়া মোহ থাকে না। তবে কাকে সে অন্বেষণ করছে, ভাইকে, না দেশকে, না তার ইষ্ট কে? কাকে?

সমুদ্রতীর ধরে শ্রীচৈতন্য এগিয়ে চলল দক্ষিণাপথের দিকে। কত

দেশ, অগণিত তীর্থ, অসংখ্য মানুষ, ছায়াঘেরা কত পথ, নদী, কান্তার, প্রান্তর, পাহাড় অতিক্রম করে চলেছে। প্রকৃতির মন কেড়ে নেয়া কত দৃশ্য, শোভা চোখের উপর ছাপ রেখে নিঃশব্দে সরে গেছে, আর একটা ভরন্ত উচ্ছলতায় বুকটা ভরে গেছে। প্রকৃতি যেন স্রষ্টার অনন্ত মহিমা প্রকাশে এখানে ব্যস্ত। মনে হল এই তো তাঁর স্বরূপ। ব্রহ্ম এখানেই প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই পূর্ণতা কেমন যেন নির্লিপ্ততাও দান করেছে। জীবনের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্নতায় সে যেন আরো অন্য কিছুর খোঁজ পেতে চাইছে। সব বাঁধন আলগা করে যাযাবর পাখির মত ভেসে যাওয়ার মানে কি? এই চলার শেষ কোথায়? শ্রীচৈতন্য নিজেও জানে না বলে কেবলই এগিয়ে চলল। গোটা ভারতবর্ষ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বহুতীর্থ মন্দির ও দেবতা দর্শন করল। একে একে ভ্রমণ করল গোদাবরীতীর্থ, মল্লিকার্জুন, বেঙ্কটাচলম, ত্রিমন্দনগর, ত্রিবাঙ্কুর, তঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম, মীনাক্ষী, গুজরীনগর, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী। দেশের কোটি কোটি অগণিত মানুষের বিরাট জগৎটা তার। বিচিত্ররূপ নিয়ে স্বমহিমায় এতকাল তার জানার বাইরে ছিল। পর্যটনে তার ভারত দর্শন হল।

এই মানুষ, দেশ আর সমাজকে পাথেয় করে শুরু হয়েছিল তার যাত্রা। বঙ্গপ্রাণে বাতাস লাগল। বাতাসে ঝড়ের আবেগ। কী ব্যাকুল আর্তি তার নিজের প্রাণে। ধর্মের নামে বিকৃতি, ব্যাভিচার, অবিচার, অত্যাচার, সমানে চলেছে সবদেশে, একভাবে। এইসব দুঃখী মানুষের তাপিত হৃদয়ের দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যে আগে দরকার এদের কাছে পেঁছনো। নামগানের তৃষ্ণা মানুষের অভ্যন্তরের গরলকে মন্থন করে করে অমৃতে পরিণত করবে। নামগানেই তাদের নতুন জন্মান্তর ঘটল। দলে দলে মানুষ ছুটে এল তার কাছে। পদরেণু পাওয়ার জন্যে পথের ধূলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করল মানুষ। প্রেমভক্তি, মধুর রসের ধারা যেন প্রবাহিত হল তার দেহ থেকে। ভক্তের চোখে চৈতন্যের কাঞ্চনবর্ণ দেহ যেন অমৃত হয়ে গলে পড়ছে প্রতিনিয়ত। জনগণ সেই অমৃতের লোভে তার কাছে এসে সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। কিন্তু কাউকে দীক্ষিত করা হল না, কোন অনুষ্ঠানের মধ্যেও কাউকে টেনে আনা হল না। শুধু নাম কীর্তনের মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনা করতে শেখানো হল তাদের। গোটা দক্ষিণদেশের

মানুষকেই নামগানে মাতিয়ে তুলল।

পরিব্রাজক হয়ে দেশে দেশে ঘুরল নিজেকে জানার এক তীব্র তাগিদ নিয়ে। সে আসলে কে, এবং এত বছর ধরে কোথায় চলেছে, কিসের সন্ধানে তা কে জানতে চায়? নিজেকে আবিষ্কার করার তাগিদই তার তীব্র হয়ে উঠল।

পশ্চিমের আকাশে সূর্য ডুবছে। নরম লাল রোদ এসে পড়েছে মীনাক্ষী মন্দিরের চূড়ায়। সন্ধ্যারতি আয়োজন চলছে মন্দিরের অভ্যন্তরে। চৈতন্য উদ্বাহু নৃত্য করছে, আর যে আসছে তাকে দু'বাহু ভরে প্রেমালিঙ্গন করছে। নাটমন্দিরে মৃদঙ্গ করতাল বেজে উঠল। চৈতন্য চুপি চুপি দর্শকদের সঙ্গে এক কোণে এসে বসল।

উতরোল হয়ে উঠল বাজনা। চৈতন্যের চেতনার ভেতর তার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। নূপুরের ঝঙ্কার তুলে দেবযানী এসে দাঁড়াল বিগ্রহের সামনে। ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্যের মত নিজেকে নিবেদন করার অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল। সহসা মৃদঙ্গ কল্লোলিত হয়ে উঠল। অমনি উদ্দাম গতিতে নাচতে আরম্ভ করল। দেবযানী নাচছে পাহাড়ী ঝর্ণার মত উদ্দাম গতিতে। নৃত্যের ছন্দে ছন্দে তার পা দুটো যেন সমুদ্রের দোলায় দুলছে। সমস্ত শরীরটা তার নদী হয়ে গেছে। দীর্ঘ বেণীটি নাচের তালে তালে ছটফট করছে, কখনও ঢেউর মত পিঠে, বুকে আছড়ে পড়ছে সজোরে। আবার মিষ্টি মিষ্টি হেসে যেন ছিটকে যাচ্ছে অন্যদিকে। বিচিত্র সেই নৃত্যে তন্ময় হয়ে গেছে নর্তকী। কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার চেতনায় লুপ্ত হয়ে গেছে দর্শকের কোলাহল, উন্মাদনা, বাহবা, উচ্ছাস। মৃণালের দুই ভুজ তখন আন্দোলিত হচ্ছে। কখনো চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে সে উল্কার গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে গোটা নাটমন্দির। অবশেষে তীব্র একটা যন্ত্রণা আর আর্তি নিয়ে সে বিগ্রহের বেদীর উপর উপুড় হয়ে পড়ল। ঈশ্বরের কাছে ভক্ত যেমন আকুল হয়ে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে প্রার্থনা জানায় ঠিক তেমনি ঈশ্বরের বেদীর উপর লুটিয়ে পড়ল।

চৈতন্যর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। অভিভূত আচ্ছন্নতা দিয়ে দেবযানীর কাছে ছুটে গেল। কিন্তু তাকে ডাকল না। স্পর্শ করল না। আর্ত দুটি চোখ পেতে রাখল তার দিকে।

দেবযানী অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলল।

দীন এক অনুগ্রহ প্রার্থীর মত চৈতন্য সসঙ্কোচে এগিয়ে গেল তার দিকে। বলল: অপূর্ব তুমি নাচ। পূজারীর মত বিনম্র ভঙ্গীতে যেই নাচ শুরু করলে অমনি একটা মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আমার মনটা ছেয়ে গেল। অন্তরটা যেন বিরাট আদিত্যবর্ণ এক অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। নাচের ভেতর নিজেকে উজার করে দিয়ে তুমি কি পেয়েছ ইষ্টকে? নিরন্তর তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে বুকের মধ্যে তাঁকে পেয়েছ কখনও? তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছ? তাঁকে সেবা করতে পেরে সার্থক হয়েছ?

কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দেবযানী চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। কিছুই বুঝতে না পেরে মাথা নিচু করে চলে গেল।

মন্দিরে পুরোহিতকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল: ওগো পূজারী, নিত্য তার পূজা করে সেবা করে পেরেছ কি তাকে? অনুভব করেছ সে কেমন?

দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণ শেষ করে চৈতন্য পশ্চিম সাগর তীর ধরে এগিয়ে চলল উত্তর পথে! সোমনাথ, দ্বারকা, প্রভাসতীর্থ, মথুরা বৃন্দাবনে। নতুন নতুন জিজ্ঞাসায় আর্ত হয়ে নিজেকে শুধু অন্বেষণ করল। নির্জন গুহায়, নদীতীরে, মন্দিরের পাশে কিংবা বিজন অরণ্যে যারা ঈশ্বর সাধনা করে তাদেরও প্রশ্ন করল: প্রতিষ্ঠা প্রচারে উদাসীন হয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করে সর্বাধিক ভোগ সুখ ত্যাগ করে জগৎ বিমুখ হয়ে কি ধ্যানের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছ? জেনেছ কি তাকে দেখতে কেমন? পেয়েছ কি তাকে অন্তরে?

দু'বছর ধরে পদযাত্রা শেষ করে নীলাচলে ফিরল শ্রীচৈতন্য।

মনটা তার ভাল ছিল না। মনের এককোণে বিষাদ জমে ছিল, সঙ্গে খানিক ক্লান্তি। কিন্তু মনের বেশির ভাগ শক্তি ব্যয় হয় পর্যটনের সাফল্য এবং মানুষের হৃদয় জয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতে। কিন্তু পর্যটন কতখানি সফল হল তাই বিচার করতে গিয়ে মুখে অস্বস্তির আভা ফুটে উঠল।

ভারতবর্ষে একটা বিরাট সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর দরকার ছিল,—মানুষকে সব রকম ব্যক্তিগত হীনমন্যতা থেকে মুক্ত করার বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব এল কৈ? দেশের নব্বই ভাগ মানুষ যতদিন এই হীনমন্যতা কাটিয়ে না উঠছে ততদিন দেশে কোন বিপ্লব আসবে না। মানুষের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।

হরিনাম ধ্বনি দেশের মানুষকে মাতিয়ে তুলল, তাকে নাড়া দিল, তবু

এই জাতের হীনমন্যতা ঘুচল না। তাদের নিজের কোন আত্মপরিচয় হল না। মানুষ নিজেই তার পরিচয় এই বোধ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করতে পারল না আজ অবধি। একা একা বসে নিজেকে প্রশ্ন করে, কবে ভারতবর্ষের মানুষ সত্যিকার মুক্ত হবে, কবে সত্যিকারের বিপ্লব আসবে কে জানে? বিপ্লবের কথাটা কারো মাথায় আসে না। এ সব বড় ও মহান ভাবনা এদেশের মানুষের জন্যে নয়। তবে, বড় আদর্শের আলো এসে পড়লে মনটা যে বড় হয়ে যায়, জীবনটা উদ্ভাসিত হয়, কলঙ্ক কালিমা দুর্বলতা হঠাৎ কেটে যায়, হরিনাম তেমনি সবাকার সঙ্গে মিলনের অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছিল, মনের কালিমা ঘুচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের মানুষ ত্যাগে দুঃখে, বেদনায় বীর্যে সামাজিক আচার প্রথার জগদ্দল পাথরটাকে, প্রাণ তুচ্ছ করে ঠেলে ফেলার মহান সাহসে এগিয়ে এল না। পায়ের শিকল কাটল কিন্তু বেড়ী ভাঙল না হরিনামের মাহাত্ম্যে। মানুষ অন্তর্জগতের কারাগার ভেঙে স্বাধীন, মুক্ত হতে পারল কৈ? এই অন্তর্জগতের পরিবর্তন এবং স্বাধীনতা আনতে মুষ্টিমেয় মানুষ কেবল পেরেছে।

শ্রীচৈতন্য বারান্দায় এসে দাঁড়াল ঘরের ভেতর থেকে। এখান থেকে সমুদ্রের অনেকখানি স্পষ্ট দেখা যায়। একজন জেলে মাছ ধরার আশায় সমুদ্রের ধারে জাল ফেলছে। জালখানা শূন্য আকাশের ছুঁড়ে দিচ্ছে সেই সংগে তার মাছ পাওয়ার ছোট্ট আশাটুকুও নিক্ষেপ করছে গুরুগর্জনে অনন্তকাল ধরে বয়ে যাওয়া সমুদ্রের বুকে। নীল আদিগন্ত আকাশের কাছে যেন জেলের হয়ে ভিক্ষা চাইতে চাইতে জালটি সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ল। পরক্ষণেই সমুদ্রস্রোত তাকে গ্রাস করল।

চৈতন্য আনমনা চোখে দেখতে লাগল দৃশ্যটি। মনে হল, এটি শুধু জেলের জীবনের ছবি নয়, এ তার নিজের গভীর অভ্যন্তরের ভাবনা। জেলের শূন্যে জাল ছড়িয়ে দেয়ার মতই তার ভেতরের আর্তিটাই যেন ছড়িয়ে গেল অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

হু হু করে বাতাস কত জায়গায় কত দেশ ছুঁয়ে তার কানে কত কি কথা যেন ফিস ফিস করে বলল: একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন বাতাসের সঙ্গে মিশল।

চড়া রোদ। বাতাসও তেতে উঠেছে। তবু রোদ অগ্রাহ্য করে বকুল গাছের নিচে বসে হরিদাস ধ্যানস্থ হয়ে লক্ষবার নাম জপ করে চলেছে।

কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার দিকে তাকাতে চৈতন্যের চোখে জল এল। হরিদাস তার ব্যর্থ বিপ্লবের সাক্ষী। অন্তরের দৈন্য দূর করার জন্যে কত কি করল, নিজেকে ব্যক্তিগত হীনমন্যতা থেকে কিছুতে মুক্ত করতে পারল না সে। তার দ্বিধা দূর করতে সংশয় মুক্ত করতে চৈতন্য নিজে তার পাদোদক পান করল। অন্তরঙ্গ পার্ষদকে জগন্নাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করল কত, তবু সে যে একদিন মুসলমানের অন্নজলে জীবনধারণ করেছিল, তাদের আশ্রয়ে ছিল মনের এই গ্লানি আর সংস্কার মুক্ত হয়ে অন্তরে কিছুতে শুচি হয়ে উঠতে পারল না। জাতের সেই হীনমন্যতাবোধ আজও ঘুচল না। মনে প্রাণে সে হিন্দু এবং শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হয়েও হীনমন্যতা কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারল না। কেউ যদি নিজের অন্তর্জগতে স্বাধীনতা আনতে না পারে তা হলে কেমন করে মানুষের মনের অভ্যন্তরে বিপ্লবের বাণী পৌঁছে দেবে? হরিদাস'ত গহ্বরের ভেতর ঢুকে পড়া সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল। সংস্কার এক অদ্ভুত জিনিস। কিছুতে কাটতে চায় না। অথচ মানুষের কাছে তার অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মানুষ আজও গুহামানব-মানবী হয়ে আছে। মাঝে মাঝে, সেই রূপ বেড়িয়ে পড়ে। প্রমাণ করে দেয় যে জাগতিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যত উন্নতি আর বিস্তৃত হোক না কেন বহু সহস্র শতাব্দী পেরিয়ে এসেও তার আত্মিক উন্নতি হয়নি। এখনও সে নিজেকে গুহার ভেতর লুকিয়ে রেখেছে। জীবন যে কত বড় জিনিস, কি বিপুল ব্যাপ্তি, কি মুক্তি তার ভিতরে তা যারা জানল না তাদের জন্যে চৈতন্যের বড় দুঃখ হয়।

বাইরে ঝিম ঝিম করা ভরা দুপুর। চতুর্দিক ভারী নির্জন আর নিরিবিলি। অথচ রোদে ঝলমল। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। বিশাল বিশাল স্রোত ক্ষেপা মহিষের মত তেড়ে আসছে। বারান্দার সামনে ঝির ঝির করে অবিরল কথা বলছে বকুল গাছ। ভরন্ত দুপুরে গদগদ স্বরে সিদ্ধ বকুল বৃক্ষটি যেন বলছিল বহুদূর এসে গেছ তুমি। এতদূর পৌঁছে আর কি ফেরা যায়? ফিরে যাওয়ার দরকারই বা কি? তোমার সঙ্গে পা মিলিয়ে যারা চলতে পারল না তারা যে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানেই থাকুক। কেবল তুমিই এগিয়ে চল। বেরিয়ে পড়। মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ সেই পথেই তোমার মুক্তি। মানুষ যখন একেবারে একা হয়ে ঈশ্বরকে নির্জনে মনের অভ্যন্তরে খোঁজে তখন তার ঈশ্বরলাভ হয়।

এ রকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি ও ভাবনায় চৈতন্য হঠাৎ একটু দিশেহারা বোধ করল। সিদ্ধ বকুলের ঝির ঝির শব্দ, তার কাছে অর্থহীন করে তোলে জীবনকে, পৃথিবীর আকর্ষণকে। শব্দ সম্ভবতঃ নিরাকার কিন্তু চৈতন্যের ভেতর তার আকার পায়। নির্জন দুপুরে সিদ্ধ বকুলের ঝির ঝির শব্দ চারিদিকে হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ল। কিছুই আর ভাবতে পারছিল না চৈতন্য। মাথাটা তার অস্থির, এলোমেলো।

সম্মুখে দারুব্রহ্মের মন্দির। সেদিকে তাকাতে গিয়ে দু'চোখ জলে ভরে গেল। অনুভবের জগতে তখন নানা খেলা। মনে হল বিশাল গণ্ডীটাকে ভেঙে ফেলে তাকে যেন আরো অন্তর্মুখী করে তুলতে চাইছে। একদিন লক্ষ মানুষের মুক্তির ডাক দিয়েছিল সে, আজ নিজের মুক্তির ডাক এসেছে তার। অপরূপ এক ধ্যানের দেবতার মূর্তি তার চোখে ভেসে উঠল। সে মূর্তি জগন্নাথের। এক ব্যাকুল আর্তি জাগল প্রাণের ভেতর। সমস্ত সত্তার ভেতর সূর্যের মত জ্বল জ্বল করতে লাগল জগন্নাথের প্রদীপ্ত মূর্ত্তি। তার হৃদয়ের ভেতর আকণ্ঠ তৃষ্ণার হাহাকার। সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়াল শ্রীচৈতন্য। ধীর পায়ে এগিয়ে চলল জগন্নাথের মন্দিরের দিকে। আশ্চর্য একটা আত্ম-প্রসাদে আবিষ্ট হয়ে গেল তার মন। আর তার অন্তরের ভেতরে, সমস্ত সত্তার ভেতরে স্নিগ্ধ গম্ভীর মন্ত্র স্বরের ধ্বনিত হতে লাগল এক সুধাময় সঙ্গীতের সুর —"জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।"

রামানন্দ রায়কে নিজের কক্ষে নিয়ে সযত্নে, সমাদরে বসাল চৈতন্য। কাশীনাথ মিশ্রর ঘর থেকে একটা তাকিয়া আনিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: বস ভাই। আরাম করে বস। রাজকার্য আর রাজনীতিতে খুব বেশি জড়িয়ে পড়েছ। তাই বোধহয় দর্শন পাওয়া ভার হয়েছে। আমাদের হয়ত ভুলেই গেছ।

রামানন্দ একটু দিশেহারা হয়ে পড়ল। চৈতন্যের সামনে সে স্বাভাবিক হতে পারল না। মনে হল, এই সন্ন্যাসী তার সম্মোহন দৃষ্টি বুলিয়ে মনের সব কথা বুঝে নিচ্ছে। আদ্যোপান্ত দেখছে। আর সে কাঙাল হয়ে তার সামনে বসে আছে। হলও তাই। রামানন্দের মনের সংকোচ ও সংশয়ের যে আসল কারণ তাই বাইরে টেনে আনল চৈতন্য। বলল: তুমি অস্বস্তি বোধ করছ কেন রামানন্দ? মনে হচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে তোমার কিছু

নালিশ আছে।

রামানন্দ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অস্ফুট বিস্ময়ে বলল: নালিশ!

চৈতন্য তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল কিছুক্ষণ। শান্ত গলায় বলল: নালিশই বটে!

কথাটার রহস্য রামানন্দকে বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল। চকিতে মনটাকে ছুঁল। অনুভূতি নাড়া খেল। সবিস্ময়ে নিজের মনে নিঃশব্দে উচ্চারণ করল: সত্যিই তুমি প্রেমের ঠাকুর। মানুষের বাইরেটা দেখেই ভেতরটা টের পাও। বিস্ময়টাকে নিজের ভেতর চেপে রেখে রামানন্দ বলল: খবর রাখেন তাহলে।

চৈতন্যে ফাঁপরে পড়ল। বলল: খবর রাখি না। তবে, অনুমান করতে পারি। সার্বভৌমকে'ত বলেছি, আমি সন্ন্যাসী, রাজদর্শন করতে আমার নেই।

বাধা কোথায়?

রাজার সঙ্গে রাজনীতি ও রাজকার্যের সম্পর্ক। সেখানে সবই রাজকীয় ব্যাপার। সাধারণ মানুষের জায়গা কোথায়? সামান্য সাধুদর্শনও রাজনীতির ব্যাপার হয়ে উঠে। অকারণে, শত্রুদের নানা কথা রটনার সুযোগ দেয়া। তাতে রাজারই অসুবিধে বেশি।

রামানন্দর চিন্তিতভাবে বলল: রাজা'ত সব জেনেশুনেই আপনার দর্শন প্রার্থী। আপনার একটু করুণা ও কৃপায় যার জীবন ধন্য হয়ে উঠে তাকে প্রত্যাখ্যান করে হৃদয়টাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছেন কেন? কত পাপী তাপী আপনার করুণা পেল, কিন্তু উৎকলাধিপতি কৃপার অযোগ্য হল কেন?

উৎকলাধিপতি নিজের বশে নেই রামানন্দ। এটাই হল ভাবনার কথা। সত্যি বলতে কি উৎকলাধিপতি আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। তার জন্যে আমারও প্রাণ আকুল হয়। কিন্তু এখনও তার মোহ কাটেনি! হৃদয়ে প্রেম জাগেনি।

রামানন্দ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল: মোহ কেন বলছেন, প্রভু?

মোহ, আগুনের মত জ্বলে উঠে। সে আগুনে নিজেও যেমন দগ্ধ হয়, তেমনি অন্যকেও দগ্ধ করে। মহারাজের নিভৃত মনের সেই আগুনে নগর জ্বলছে প্রাসাদ পুড়ছে।

এ কথার অর্থ—

মোহে মানুষ ইচ্ছায় বস্তু পাওয়ার জন্যে পাগল হয়। বিচার বিবেচনা

তার লোপ পায়। যতক্ষণ তার আকাংখা না মেটে ততক্ষণ উন্মাদনা কাটে না। মোহের মন্ত্রা হল ; আকাংখা মিটে গেলে নেশা ছুটে যায়। কিন্তু প্রেম মানুষকে আর্ত্ত করে, উন্মাদ করে না। প্রেমে ত্যাগে স্নিগ্ধ, নিবেদনে সুন্দর।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র সম্পর্কে এ কথা বোধ হয় খাটে না। বৃহৎ ত্যাগে তার অনুরাগ সুন্দর। আপনার করুণার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করতে, হিন্দুর বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংকটের সমাধান করতে বিজয়নগরের সঙ্গে তিন পুরুষের মর্যাদার লড়াই মিটিয়ে ফেলেছেন। শান্তিচুক্তিকে চিরস্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ করতে প্রিয়তম কন্যাকে হাসতে হাসতে অসম বয়সী কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। এ কি কম কথা ?

শ্রীচৈতন্যের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চোখে হঠাৎ একটা তীব্র রাগের দীপ্তি দেখা দিল। কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধতায় কাটল। নিঃশব্দে পুনর্বার দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে রাগটা বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন গলায় বলল : আমার মোহে পড়ে বেচারা রাজার দামটা বড় বেশি দিতে হল। চুক্তির সময় প্রিয় সন্ন্যাসীর মুখ খুঁজছিল। দেশের স্বার্থ, কন্যার সুখ কিছুই দেখল না। শুধু নিজের স্বার্থ ও সিদ্ধির কথাই ভেবেছে। কিন্তু আমি'ত একজন সামান্য সন্ন্যাসী বৈ'ত কিছু না। তাঁর এ ধরণের উন্মাদনার রন্ধ্রপথ ধরেই সর্বনাশ আসছে। তবু রাজা কিছুতে সাবধান হচ্ছে না। আমার প্রতি তাঁর দুর্বলতা আছে জেনে একজন সুযোগ সন্ধানী মানুষ তাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করছে। তোমার ভাই গোপীনাথ রাজকোষের অর্থ তছরূপের অপরাধে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। তুমি আমার অনুরাগী ও অনুগত বলে গোপীনাথের অন্য ভাইরা তার প্রাণদণ্ডাদেশ মুকুব করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছে। রাজার উপর প্রভাব বিস্তার করতে বলেছে। আমি প্রশাসনের কেউ নই। তবু এই অনুরোধ করল। মহারাজ অপরাধী সম্পর্কে আমার মনোভাব না জেনেই তার অপরাধ মার্জনা করলেন, আমাকে খুশী করার জন্যে তাকে কার্যে পুণর্বহাল পর্যন্ত করল। এ ধরণের কাজ করে তিনি শুধু রাজকর্তব্য অবহেলা করেননি, দোষী বিশ্বাসভঙ্গকারী, অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে তিনি আমাকেও অপমান করেছেন। আমার গৌরব, সততা তাতে কলঙ্কিত হল। আমার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমে গেল। একে ভক্তি, শ্রদ্ধা বলে না। এ হচ্ছে রাজার উন্মাদনা। রাজাকে তাই আমার বড় ভয়। প্রভাবশালী রাজার বন্ধু

হওয়া বড় দুর্ভাগ্যের।

রামানন্দ নীরব। একটু গম্ভীর হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: আমি পদত্যাগ করে এসেছি আপনার সেবা করতে। মহারাজ আপনার নাম শ্রবণ করে হৃষ্ট মনে সম্মতি দিলেন। "নাম শ্রবণেই রাজার হৈল মহাপ্রেমাবেশ।" দবীর খাস মল্লিকের দৈনীপত্রর থেকে এটা কম কিসে প্রভু? আপনার কৃপা লাভের জন্যে অনন্তকাল অপেক্ষা করার সহিষ্ণুতা তাঁর এসেছে।

চৈতন্যের অধরে স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি। বলল: রাজাকে বল আমার প্রতি তার যেন কোন দুর্বলতা না থাকে। তাঁর ভালবাসাকে ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ না রেখে সকলের প্রতি সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে।

। তেরো ।।

ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের ছয় বৎসর পরের ঘটনা।

চৈতন্য বেশ বুঝতে পারছিল নিত্যানন্দ এবং কিছু পার্ষদের সঙ্গে তার একটা আদর্শগত বিরোধ শুরু হয়ে গেছে। খুব গভীরে এবং নিঃশব্দে তাদের সংঘর্ষের জমি তৈরী হচ্ছে। নিত্যানন্দই সে জমি প্রস্তুত করছে।

লোকের চোখে চৈতন্য পুরীর সচল জগন্নাথ, জীবন্ত দারু বিগ্রহ। এরকম একটা ধারণা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হওয়া থেকে নিত্যানন্দ কেমন যেন হয়ে গেল। তার দেবত্ব প্রাপ্তিকে নিত্যানন্দ সহ আরো কিছু পার্ষদ ভাল চোখে দেখল না। নিত্যানন্দের বুকের ভেতরটা ঈর্ষায় চিন চিন করতে লাগল। চৈতন্যের চেয়ে সর্ববিষয়ে সে শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যের স্থপতি সে। কিন্তু সৃষ্টি স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে গেল। চৈতন্যের চেয়ে সর্ব বিষয়ে সে শ্রেষ্ঠ হয়েও ঈশ্বরত্বের গৌরব পেল না। এই দুঃখটাকে সে কিছুতে ভুলতে পারছিল না।

নিত্যানন্দের মনোভাব চৈতন্যের অজানা ছিল না।

নিত্যানন্দের মনের গর্ভদেশে অনুক্ষণ যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে তা সমমতাবলম্বী দুই সহকর্মীর মন কষাকষি। দুই আপাত সমভাবীর মধ্যে ভাবনা ও উচ্চাশার গোপন সংঘর্ষ। নীতিতে নীতিতে ঠাণ্ডা লড়াই।

লড়াইটা খোলা রাজপথে সবাকার দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ার আগেই একটা ফয়সালা করার জন্যেই নিত্যানন্দকে গম্ভীর গলায় চৈতন্য বলল: নিত্যানন্দ তুমি অবধূত। নীলাচলে অনেকদিন আছ। আর বোধহয় তোমার থাকা উচিত নয়।

নিত্যানন্দ এ কথায় একটু অবাক হয়ে গেল। বলল: একথা বলছ কেন? কোন অপরাধে আমাকে নীলাচল ছাড়তে বলছ?

চৈতন্য হঠাৎ একটু অদ্ভুত হাসি হাসল! সে হাসিতে তার মুখের ভাব বদলে গেল। সন্ন্যাসীর ভেতর উঁকি দিল এক দৃঢ়চেতা সাংগঠনিক নেতা শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল: নীলাচলে সব মানুষ হরিনামে মেতে আছে। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্যে নতুন নতুন অঞ্চল'ত গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করেছি। যে যার যোগ্যতা এবং সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্ব দিয়ে নিজের নিজের অঞ্চল গড়ে তুলুক এটাই আমার ইচ্ছা। সকলের'ত নীলাচলে থাকার দরকার নেই।

চৈতন্য গভীর দৃষ্টিতে নিত্যানন্দের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু সে নীরব। মাথা গুঁজে চৌকির উপর বসে কিছু যেন চিন্তা করছিল। তাকে নিবিষ্ট দেখে ডাকল: নিত্যানন্দ, যাদের সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আছে কেবল তাদের উপর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের দায়িত্ব দিচ্ছি। (মথুরা বৃন্দাবনের ভার যথাক্রমে রূপ সনাতনকে দিয়েছি। নবদ্বীপে প্রচার অব্যাহত রাখার দায়িত্ব অদ্বৈতাচার্যের, শৈবভূমি কাশীতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার সুবুদ্ধি রায় এবং তপন মিশ্রর উপর। আর তোমার কর্মক্ষেত্র হল গৌড়।)

ভিতরকার চাপা উত্তেজনায় নিত্যানন্দ ছটফট করতে লাগল। বিস্ময়ে তার চোখ কপালে উঠল। বলল: সে কি? নীলাচল ছেড়ে চলে যেতে যে আমার পা উঠছে না।

চৈতন্যর ভুরু কুঁচকে গেল। একটু অস্বস্তিবোধ করল। প্রসঙ্গটা খুবই লজ্জাজনক। চুপ করে কয়েকটা মুহূর্ত অপলক তার দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বলল: ভিতরে ভিতরে তুমি ভীষণ বদলে গেছ। তোমার স্বভাব, চরিত্রও বেশ একটু পরিবর্তন হয়েছে। তোমার পান দোষ, সঙ্গ দোষ এবং ইদানীং নারী সংসর্গ দোষ ঘটেছে। তুমি থাকলে এ রোগ প্রত্যেকের ভেতর সংক্রামিত হবে। তুমি বরং গৌড়ে গিয়ে বিয়ে থা করে সংসারী হও। গৌড়ে তোমার যোগ্যতা দেখানোর প্রচুর সুযোগ পাবে। গৌড়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব

তোমাকে দিলাম। এ কাজ তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুচারু রূপে পারবে না। মানুষকে মাতিয়ে তোলার এক আশ্চর্য ক্ষমতা তোমার আছে।

নিত্যানন্দ স্তব্ধ। মাথা নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন মুখে ভাবল। একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ব্যথিত হয়ে বলল: আমি জানি নে, কে বা কারা আমার সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়ে তোমার কান ভারী করেছে।

চৈতন্য তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল: একথা কেন বলছো?

যা সত্যি বলে মনে হয়েছে তাই বলেছি।

চৈতন্যও হেঁয়ালী করে বলল: মানুষকে যতই আপন করতে চাওনা কেন মানুষ সুযোগ পেলেই তোমাকে ফাঁকি দেবে। আত্মীয় বল, সব বন্ধনই বড় পঙ্কা।

নিত্যানন্দ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল চৈতন্যের দিকে। কথা বেশী না বাড়িয়ে মৃদু স্বরে বলল: মানুষের নিজের মধ্যে কত অন্তহীন রহস্য লুকিযে আছে, সে নিজেও সব জানে না। সে যাই হোক তুমি আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে আমার উপর যে কাজের ভার দিলে আমি সাধ্যমতই তা পালন করব।

প্রতাপ রুদ্র শ্রীচৈতন্যের প্রেমে উন্মাদ। রাজকার্যে তার মন নেই। স্বার্থ বিরোধে, ও ক্ষমতালোভের চক্রান্তে প্রশাসনের স্বাস্থ্য অনেক দিন থেকে ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে তা বুঝবার কোন উপায় ছিল না। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকেই দেশব্যাপী বিবিধ সংকট বিশৃংখলা প্রকট হল। চক্রান্তকারীরা এই অবস্থার সুযোগ নিল।

সেনাধ্যক্ষ গোবিন্দ বিদ্যাধর সুচতুর, বুদ্ধিমান, কুট কৌশলী ব্যক্তি। ষড়যন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে সময়ের এবং যোগ্য ব্যক্তির সুনিপুণ নির্বাচনের উপর। গোবিন্দ বিদ্যাধরের এ দুটি জ্ঞানই ছিল প্রখর। খুব ধীরে ধীরে এবং সংগোপনে প্রতাপরুদ্রকে সিংহাসনের অধিকার থেকে, রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সরানোর এক সুচতুর পরিকল্পনা করল। তাব অভিসন্ধি ঘুণাক্ষরে কেউ জানতে পারল না। জানবে কোথা থেকে? তার খেলা চলল সতর্ক এবং মন্থর চক্রান্তে।

বিদ্যাধরের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল ধর্মবিপ্লবী শ্রীচৈতন্য। যার ব্যক্তিত্বের

যাদুস্পর্শে লক্ষ লক্ষ লোকের স্তিমিত প্রাণে হঠাৎ আলোর জ্যোতি এসে পড়ল। বহু শত বৎসরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করে মানুষের প্রাণকে পরম গৌরবে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারল। সে আলোর বন্যায় প্রবাহিত ধারায় বহু বিবেকবান, জ্ঞানী, ধার্মিক মানুষের অন্তরে কালিমা, ক্লেদ, গ্লানি, দ্বিধা, ধর্মভীরুতার ভয় ঘুচে সাফ হয়ে গেল। জেগে উঠল তাদের অন্তরে শুভ্র মনুষ্যত্বের ঝিলিক। সাধারণ মানুষের জীবনে এইসব মহৎ, উদার নামী দামী শ্রেষ্ঠ মানুষের প্রভাব খুবই গভীর। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম বিপ্লবের এতবড় একটা সাফল্য বিদ্যাধরকে ভাবিয়ে তুলল। কিন্তু সে হতাশ হল না। কিংবা হাল ছেড়ে দিল না। মাটির গভীরে গাছ যেমন নিঃশব্দে দৃষ্টির অগোচরে শিকড় ছাড়ে তেমনি এক গভীর ষড়যন্ত্রের জাল প্রশাসনের গভীরে, দেশের মানুষের মনে অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দেবার কাজে দিনের অধিকাংশ সময় তার কাটতে লাগল।

ষড়যন্ত্রের ভিত পাকা এবং মজবুত করতে তার সর্ব প্রথম দরকার হল একটি রাজনৈতিক আশ্রয়। ষড়যন্ত্রের বীজ অংকুরিত হওয়ার মাটি দরকার। দাঁড়ানোর একখণ্ড জমির প্রয়োজন। এই জমি তাকে রস জোগাবে এবং আশ্রয় দেবে। অনেক ভেবেচিন্তে স্থির কবল গৌড়াধিপতি হুসেন শাহই তার নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সে দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের শত্রু। রাজনীতিতে চিরন্তন শত্রু বা মিত্র বলে কেউ নেই। শত্রু যদি স্বার্থসম্পন্ন সহায়ক হয় তা-হলে তার সঙ্গে আঁতাত করতে রাজনীতিতে কোন বাধা নেই। তাতে, সন্দেহের বাইরে থেকেই নিঃশব্দে এবং নিরাপদে কাজ করা সহজ হয়। গড়-মান্দারণ দুর্গ অবরোধ কালে বিদ্যাধরের সঙ্গে হুসেন শাহের সাক্ষাত হল।

এরকম একটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপের ব্যাপারে গোবিন্দ বিদ্যাধরের সম্বল অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, অসামান্য ধূর্ততা, সিদ্ধান্ত ও কার্যে ক্ষিপ্রতা। রাজনৈতিক চালে হুসেন শাহকে একটু বেকায়দায় ফেলার মতলব নিয়েই বলল: সুলতান, আমি শত্রুপক্ষের লোক। আমার প্রতি আপনার কোন বিশ্বাস কিংবা দয়া-দাক্ষিণ্য থাকার কথা নয়। তবু একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। এও জানি, আপনাকে প্রত্যয়বান করার চেয়ে আপনাকে ঠকানো অনেক কঠিন। তাই, স্তুতি করে মন ভেজানোর কোন চেষ্টাও করব না। তবে যা সত্য তা'ত বলতে হবে। গৌড়ের যতটুকু সম্মান

ও গৌরব সে'ত আপনার জন্যে। আপনার সবচেয়ে বড়গুণ আপনি নির্লোভ এবং নীতিতে কঠোর। এ রকম মানুষের উপরেই আস্থা স্থাপন করা যায়। আমিও অবশ্য মহতের সঙ্গে মহৎ ব্যবহার করতে পারি, আবার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতেও পারি। ইচ্ছে করলে আপনিও তা করতে পারেন।

নরমে গরমে মেশানো বিদ্যাধরের কুট বাক্যালাপে হুসেন শাহ চমৎকৃত ও অভিভূত হল। বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইল। কথাটার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল। কিন্তু সবটা স্পষ্ট হল না। কোথায় যেন একটা রহস্য আছে। কিছু যেন বলতে চাইছিল বিদ্যাধর। হুসেন শাহ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভ একটু হাসল।

বিদ্যাধরের দুই চোখে জীবন রহস্য বোঝার কৌতুক, মুখে চতুর হাসি। কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিনম্র কোমলতা একসঙ্গে ঝংকারে বেজে উঠল। বলল : সুলতান, আপনাকে যে অপমান করলে তার উপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না?

হুসেন শাহ বিদ্যাধরের আন্তরিক এবং অকপট স্পষ্ট ভাষণে চমকে উঠল। ভেতরটা তার শীতের হাড় কাঁপুনি বাতাসের মত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করল : আপনি কার কথা বলছেন?

বিদ্যাধর তীক্ষ্ণ চোখে হুসেন শাহকে দেখে বুঝবার চেষ্টা করল। হুসেন শাহের ভুরু কুঁচকে চোখ দুটো কিঞ্চিৎ ছোট এবং ধারাল হয়ে উঠল। হিংসায় ক্রোধে জ্বল জ্বল করতে লাগল। ওই চোখের চাহনি তার গভীরভাবে চেনা। একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া যে তার ভেতরে কাজ করছে এটুকু অনুমান করতে পারল চতুর বিদ্যাধর। মানব চরিত্র সম্পর্কে বিদ্যাধরের অভিজ্ঞতা প্রবল। হুসেন শাহের কাছে নিজের ইচ্ছেকে উন্মুক্ত করার আগে তার প্রতিক্রিয়াটা ভাল করে জেনে বুঝে নেয়ার উদ্দেশ্যে দুষ্টুমি করে বলল : নবদ্বীপের সেই নিমাই সন্ন্যাসীর কথা বলছি। একদিন সাকর মল্লিক, দবির খাসকে চোরের মত নিঃশব্দে সে আপনার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছে। আপনার সেই বৃহৎ ক্ষতি ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইলে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

হোসেন শাহ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল : শুধু এই কথা বলতে আপনি এসেছেন?

বিদ্যাধর একটু ফাঁপড়ে পড়ল। কিন্তু খুব দ্রুত তার অসহায় অবস্থা

কাটিয়ে উঠল। একটু ক্ষীণ হেসে বলল: হ্যাঁ। সে আমার দেশের শত্রু। আমার শত্রু। দেশের মানুষকে বিপথে টানছে। সমাজ জীবন ভেঙে পড়েছে। রাজাও পর্যন্ত তার মোহগ্রস্ত। একজন দেশপ্রাণ দেশকর্মী হয়ে সন্ন্যাসীর কাজকর্ম সহ্য করতে পারছি না। অথচ সে থাকলে উৎকলের প্রভূত ক্ষতি হবে। সন্ন্যাসী বলেই তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজার সংঘর্ষ হওয়াটা খুব সম্মানজনক হয় না। সবচেয়ে ভাল হয়, আপনার রাজ্যের নাগরিক শ্রীচৈতন্যকে আপনার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে কয়েদ করে রাখুন, আপনার অপমানের প্রতিশোধ নিন।

হুসেন শাহ মৃদু মৃদু হাসল। বলল: সন্ন্যাসীকে কারারুদ্ধ করলে আপনার স্বার্থ অবশ্যই রক্ষা পায়, কিন্তু তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

বিদ্যাধরের মুখে সহসা কোন কথা যোগাল না। দুই ভুরুর মধ্যস্থল কুঁচকে গেল। ললাটের মধ্যে শিরা ফুলে উটল। কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল সে।

হুসেন শাহ বিদ্যাধরের ভাবান্তর লক্ষ্য করে মৃদু হাসল। বলল: সেনাপতি আপনি যখন পারস্পরিক সাক্ষাতের প্রস্তাব বহন করে রাত্রিকালে দেখা করতে এলেন সে কি শুধু এই কথা বলতে? আর কিছু নয়?

এরকম একটা প্রশ্নে বিদ্যাধর একটু ভরসা পেল। মনের ভেতর একটু জোর পেল। দ্বিধা সংশয়ও একটু একটু করে ফিকে হয়ে গেল। মনে মনে নানারকম কূট রাজনীতির ছক আঁকল। কিন্তু মনের কথাটা কিছুতে স্পষ্ট করে বলতে পারল না। হুসেন শাহের চোখে সে একজন ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক হয়ে থাকবে এই লজ্জায় চুপ করে রইল। অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্র হল। মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত গলায় হুসেন শাহের কৌতূহলী জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বলল: আপনার কি মনে হয়?

হুসেন শাহের দুই চোখে জীবনকে দেখার কৌতুক ও বিস্ময়। বলল: রাজনীতিতে নিজের স্বার্থটাই বড় কথা। আপনার লোভ উচ্চাশা বুদ্ধি ও সাহস আছে। আপনার'ত থেমে থাকার কথা নয়। আপনি চাইলেই আমার মত একজন সামান্য দাস থেকে সুলতান হয়ে যেতে পারেন। চাইলে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। রাজনীতিতে আপন পর কেউ নেই।

এতটা আশা করেনি বিদ্যাধর। তাই অবাক হল খুব। এলোমেলো

হাজার প্রশ্নে ভারাক্রান্ত হল মস্তিষ্ক। অকস্মাৎ বুকের অতল থেকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বেড়িয়ে এল। বলল: সেজন্য আমাকে দাম দিতে হবে অনেক।

হুসেনের মুখে হাসি, চোখে কপটতা। তার শরীরের মধ্যে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট এক প্রতিশোধ স্পৃহা বার বার শিহরিত হল! এই অবোধ রহস্যময় অনুভূতির কোন মানে হয় না। তবু বুকটা কেমন করছিল। মৃদু হেসে বলল: হাঁ। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। আপনিই আমার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কাঁটা। প্রতাপরুদ্রকে জব্দ এবং ধ্বংস করতে আমিও চাই। আপনি আমার সহায় হোন।

হুসেন শাহের ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধি গোবিন্দ বিদ্যাধরকে সতর্ক এবং সাবধান করল। হঠাৎ একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বলল: সুলতান, সাহায্যের দরকার নেই। বন্ধুত্ব পেলেই খুশি হব। আরো পরিস্কার করে বলি, উৎকলের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বাইরে থেকে প্রতাপরুদ্রকে ধ্বংস করার আত্মনিয়োগে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। কিন্তু কোন মূল্যে বা শর্তে কখনও নয়।

হুসেন শাহ অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। গোবিন্দ বিদ্যাধর সম্বন্ধে তার ধারণাই বদলে গেল। দু'হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে বলল: তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি আপনার সঙ্গেই থাকব।

বিরাট একটা জয়ের সাফল্যের পরিতৃপ্তি নিয়ে বিদ্যাধর গৃহে ফিরল। সে রাত্রে ঘুম এল না তার। সারারাত নিজের মনের সঙ্গে কত কথা বলল: কত স্বপ্ন দেখল। বিদ্যাধরের ভিতরটা মৃদু কাঁপছিল আশায় আনন্দে। শরীরের এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন তাকে স্থির থাকতে দিল না। হাওয়ার মুখে বিপন্ন পাতার মত সে কাঁপছিল উত্তেজনায়।

এর পরেই প্রধানমন্ত্রী আপ্পাজীর কাছে দূত পাঠাল বিদ্যাধর। উৎকলের সিংহাসন লাভ করতে হলে এর সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। দইতাপতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রাজনীতি, কূটনীতি এদের ধমনীতে বহু পুরুষ ধরে প্রবাহিত। আপ্পাজীর রাজনীতিতে সাবধানী পথ অনুসরণ করে বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধরের সঙ্গে তার তেমন সদ্ভাব নেই। আপ্পাজীকে খুব একটা বিশ্বাসও করে না। যেহেতু রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র

এবং উৎকলের দ্বিতীয় বিধাতা সেহেতু তাকে একটু খাতির করে চলে। কিন্তু তার প্রতি আপ্পাজীর মনোভাব কোনদিনের জন্যে জানতে পারেনি। তাই সর্বক্ষণ একটা ভয় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটাতে হয়।

দৌত্য সফল হল। সাক্ষাতের ব্যাপারটা খুব গোপনে করাল বিদ্যাধরের বিশ্বস্ত দূত সীতারাম পাণ্ডে। স্থান গুণ্ডিচাবাটী।

আপ্পাজী সব শুনল। শুনে স্তম্ভিত হল। কথা বলার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। কিন্তু তার ভিতরকার বুদ্ধিমান ও বিবেচক রাজনীতিক বিদ্যাধর সম্পর্কে তাকে সাবধান করে দিল। বিদ্যাধর স্বার্থপর, নীচ, খল, বিশ্বাসঘাতক। প্রতাপরুদ্রের রাজক্ষমতার শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তাকে কলিঙ্গের সিংহাসন থেকে সরানোর এক বৃহৎ পটভূমি তৈরী করতে চাইল মানুষের মনের অভ্যন্তরে এবং প্রশাসনের মধ্যে। কেমন একটা হতাশ বিষণ্ণতায় আপ্পাজীর মনটা ভার হয়ে উঠল। ভীষণ ঘৃণা হল। শরীরের ভেতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার মত কি যেন পাকিয়ে উঠতে লাগল।

অনেকগুলি মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। আপ্পাজী কথা খুঁজে পেল না।

স্তব্ধতার ভেতর বিদ্যাধর একটু অস্বস্তিবোধ করল: প্রসঙ্গটা বড় লজ্জাকর। তবু তার অন্ধকার মানসে গোপন উচ্চাভিলাসের কথা বলতে একটুও সংকোচ বোধ করেনি। কিন্তু তার অনুরোধের অসম্মান হতে পারে একথা একটুও মনে হয়নি। আপ্পাজীর মনোভাব তার ভাল লাগল না। তার অভিপ্রায় এখন আর গোপন নেই। দ্বিধা একবার গেলে আর লজ্জা থাকে না! বিদ্যাধরেরও কেমন লজ্জা ছিল না। সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল: রাজনীতি বলুন আর জীবননীতি বলুন তা নির্দিষ্ট হয় সমাজ, ধর্ম, আর্থিক ব্যবস্থা দেশের রাজনীতির অবস্থা ও ঐতিহাসিক বিবর্তন দিয়ে। সাম্রাজ্য তৈরি করতে গিয়ে স্বর্গের দেবতারাও এমন কোন দুর্নীতি নেই যা প্রয়োগ করেনি। নীতি দুর্নীতির চিরন্তন মাপকাঠি ব্যবহারিক জীবনে নেই। বেঁচে থাকার মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের দিকে নজর রেখেই তা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। যে রাজা থেকেও নেই, যে রাজা রাজকর্তব্য বলে ধর্মচারী নিয়ে মত্ত তাকে দিয়ে রাজকর্ম চলে না। রাজার প্রতি দেশের অগণিত মানুষের এবং রাজকর্মচারীদের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধার পাত্র দিন দিন শূন্য হচ্ছে। একজন দেশপ্রাণ দায়িত্বশীল রাজকর্মচারী এবং দেশ সেবক হয়ে'ত চুপ করে থাকতে পারি না। একটা কিছু করা দরকার।

আমি শুধু সেই কাজটা করতে এগিয়ে এসেছি। সিংহাসনে আমার লোভ নেই। ইচ্ছে করলে আপনিও মুকুট পরতে পারেন।

আপ্পাজীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিষণ্ণ গলায় বলল ঃ দিগ্‌বিজয়ী প্রতাপ-রুদ্রের সবচেয়ে বড় পরাজয় বোধ হয় তার নিজের কাছে। যে নিজেকে নিজে রক্ষা করতে শেখেনি তার হার ঠেকাব কি দিয়ে?

বিদ্যাধর স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। গোবিন্দ বিদ্যাধর ইচ্ছে করেই তার মনের গতিবিধি বুঝবার জন্যে তার দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল ঃ আপনি আমায় ভুল বুঝলে নিজেই কষ্ট এবং দুঃখ ভোগ করবেন। আমাকে যারা প্রতাপরুদ্রের বিকল্প বলে ভাবছে তাদের কেউ নন আপনি। আপনার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নেই। কূটবুদ্ধির যুদ্ধ কিছু থাকে এই গুণ্ডিচাবাটিতেই ফয়সালা হবে আজ। আপনার এক পিঠে আমি, আর এক পিঠে মরণ। আপনিই বেছে নিন, কোনটা আপনার পক্ষে বেশি শুভকর?

আপ্পাজির মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। বিদ্যাধরের লোক চরিত্র অভিজ্ঞতা প্রবল। মানুষ পটাতে এবং নিজের অনুকূলে তাকে টানতে কি বললে ভাল হয় সে তা জানে। বিদ্যাধরের কথাতে আপ্পাজী বেশ একটু ভড়কে গেল। স্তব্ধতা ভেঙে বলল ঃ অত কঠিন হবেন না। আপনি কঠিন হলে আমি কোথায় দাঁড়াব? আপ্পাজীর গলাটা একটু দুর্বল শোনাল।

সমস্যা হল ধনমন্ত্রী মহাপাত্রকে নিয়ে। সে রাজার খুব বিশ্বস্ত, জনগণের প্রিয়। তার মত রাজ ভক্ত মহান ব্যক্তি আছে বলেই চতুর্দিকে বিশৃংখলার মধ্যেও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় নি। তার সমর্থক এবং গুণগ্রাহীর সংখ্যাও অগণিত। তার বিরুদ্ধাচরণ করারও লোক দেখা দেয়নি। মহাপাত্রকে তার দলে টানতে না পারলে প্রতাপরুদ্রের 'মন্ত্রীসভার স্বাস্থ্যহানি এবং জীবননাশ একেবারে সম্ভব নয়। বিদ্যাধর তার মর্যাদাহানি করার টোপ হিসেবে ব্যবহার করল মালপিট্যা দণ্ডপাটের প্রশাসক গোপীনাথ পট্ট-নায়ককে। গোপীনাথ বিলাসী, অমিতব্যয়ী, ললনাপ্রিয়, স্ফূর্তিবাজ লোক। এ রকম মানুষকে ফাঁদে ফেলা সহজ। বিদ্যাধরের প্ররোচনায় এবং পরামর্শে গোপীনাথ রাজাকে বাৎসরিক রাজস্ব দেয়া বন্ধ করল। এবং সমুদয় অর্থ বিলাস ব্যসনে ব্যয় করল। এই ভাবে তার অংশের রাজস্ব বাকী পড়তে এক বিপুল অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াল। তখন ধনমন্ত্রী মহাপাত্র তার বিরুদ্ধে অর্থ

আত্মসাতের অভিযোগ আনল। রাজাদেশে গোপীনাথের প্রাণদণ্ড হল। গোপীনাথকে বাঁচানোর পথও দেখিয়ে দিল বিদ্যাধর। চৈতন্য একবার বললেই কিংবা তার সম্মতি আছে জানলেই রাজা তার সব অপরাধ মার্জনা করবে। বিদ্যাধরের অনুমান নির্ভুল। হলও তাই। এক ঢিলে দুই পাখী মারল সে। একসঙ্গে রাজা ও সন্ন্যাসীকে লোকচক্ষে হেয় করে তোলা গেল।

সাধারণ মানুষের মনে এর প্রতিক্রিয়া হল সুদূর প্রসারী। রাজা সন্ন্যাসীর হাতের পুতুল। সন্ন্যাসীর জন্যেই দেশে শাসন শৃংখলা ন্যায় বিচার বলে কিছু নেই। বিচার শুধু প্রহসন। রাজা এবং সন্ন্যাসীর মর্জির ব্যাপার বাজা ও সন্ন্যাসীর প্রতি লোককে বিরূপ করা এবং তাদের খেপিয়ে তোলার পক্ষে গোপীনাথকে মার্জনা করা এবং তার প্রাণ রক্ষার ঘটনাটা খুবই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। উৎকলবাসীকে আলোড়িত করল। মানুষের মনের অভ্যন্তরে রাজানুগত্যের ভূমি ক্ষয় করে চলল। সন্ন্যাসী উৎকলের মানুষের জীবনে এক কুগ্রহ। প্রবল পরাক্রান্ত প্রজানুরঞ্জন রাজাকে সে জাদু করেছে। তাই দেশে এত অশান্তি, বিশৃংখলা। কার্যতঃ তাব জন্যেই উৎকলের সুখ ও শান্তি গেছে। একজন বিদেশীর এত বড স্পর্ধার মূলে আছে রাজার প্রশ্রয় এবং দুর্বলতা। এ রকম একটা প্রচার খুব সহজেই মানুষের মনে ধরল।

গোপীনাথকে নিয়ে খেলা করার আরো কয়েকটা সুযোগ বিদ্যাধর পেল। গোপীনাথের জীবন রক্ষা করে কার্যতঃ সে চৈতন্য অনুরাগী ভাইদের হৃদয় জয় করে নিল। তারা বিদ্যাধরের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকল। এর অর্থ চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে সে অনুপ্রবেশ করল। এদেব বিশ্বস্ততা কৃতজ্ঞতার সোপান বেয়ে একদিন ক্ষমতার চূড়োয় পৌঁছে যাবে আর মহামানী ধনমন্ত্রী মহাপাত্র রাজার অদ্ভুত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সেদিন হয়ত রাজনীতির থেকে অবসর নেবে।

বিদ্যাধর খুব ধীরে সুস্থেই এগোল। পাণ্ডা পুরোহিত উচ্চবর্ণের মানুষদের ভেতর চৈতন্যের জাতপাতহীন সামাজিক এবং ধর্মীয় আন্দোলনের জন্যে একটা বিরাট ক্ষোভ ছিল। বিদ্যাধর তাদের মানসিক প্রবণতার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে, উস্কে দিল তাদের অসন্তোষ। চৈতন্যের সঙ্গে তাদের বিরোধ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহকে টেনে আনল প্রকাশ্যে। প্রতাপরুদ্রের রক্তচক্ষুর ভয়ে যা ছিল

চাপা এবং গোপন এবার তা প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ নিল।

চৈতন্যকে জড়িয়ে যে একটা কিছু গোপনে হচ্ছিল এটা বুঝতে কারো কোন অসুবিধা হল না। মন্দিরে প্রহরী, পাণ্ডা, পুরোহিতদের হাবভাব ইদানীং কেমন একটু বদলে গেছে। মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করতে গেলে পাণ্ডা, পুরোহিত, সেবাইতরা চৈতন্যকে নিয়ে কানাকানি, বলাবলি করে, কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায়।

চৈতন্যের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সঠিক বোঝেও না কিছু। বুঝবে কোথা থেকে? তখন'ত সে আর মানুষ থাকে না অন্য এক গ্রহের লোক হয়ে উঠে। এক মহৎ অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে যায় তার চেতনা। নিজের উপরেই তার বশ থাকে না। একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নের ভেতর সে মন্দিরে আসে। দ্বারের কাছে দীন নয়নে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে যায়। দু'চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে অবিরল।

চৈতন্যের মুখ যেন দর্পণ। তার মুখ দেখলে স্বরূপ দামোদর টের পায় কোনটা তার আনন্দ এবং দুঃখের কান্না? মহাপ্রভুর দিকে তাকালে বেশ বুঝতে পারে, প্রভুর বুকে একটা অপমানের কান্না বিঁধে আছে। জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকলে আরো বেশি করে অনুভব করে। প্রতিদিন মন্দিরে যাওয়া তার অভ্যাস। না গেলে থাকতে পারে না। কিন্তু মন্দিরে দেবতাকে স্পর্শ করার কোন 'অধিকার নেই। পুরোহিতেরা তাকে আর মূল মন্দির প্রকোষ্ঠে যেতে দেয় না। নাট মন্দিরের যে অংশটা মূল মন্দিরে এসে মিশেছে সেখান থেকে তাকে জগন্নাথ দর্শন করতে হয়। নয়ন দুটি দূরে অন্ধকার কক্ষে দীপা-লোকিত মূর্তির দিকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের ধ্যানের ভেতর মগ্ন হয়ে যায়। তারপর কিছু পরে কোথা থেকে কূল ভাসানো বেদনায় সমুদ্র উথাল পাথাল হয়ে উঠে বুকের ভেতর। আর তীক্ষ্ণ ও তীব্র যন্ত্রণায় তার দেবতার মত অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা এঁকে বেঁকে দুমড়ে যায়। তবু চাপা কান্নার শব্দ চাপা থাকে না। প্রভুর সে কষ্ট দেখলে দামোদরের ভীষণ কষ্ট হয়। বুক ফেটে যায় যন্ত্রণায়। নিজেই কেঁদে ভাসায়।

চৈতন্যের উপর তার ভীষণ অভিমান হয়। ভিতরে ভিতরে কেমন রাগও হয়। একদিন অসহিষ্ণু হয়ে বলল: শ্রীক্ষেত্রের মানুষ আপনাকে চায় না। তাদের ভালবাসার ভাঁটা পড়েছে। পাণ্ডা, পুরোহিত, প্রহরী

কেউ আর সমীহ করে না। সন্ন্যাসীকে সামান্য সৌজন্যটুকুও তারা দেখায় না। এই অপমান নিয়ে, শুধু একটা অভ্যাস রক্ষার জন্যে জগন্নাথ দর্শনে যাওয়ার আপনার দরকার নেই। বাকী আছে গলাধাক্কা। বলতে বলতে দামোদরের গলা ধরে গেল। বুকের ভেতর কান্নার সমুদ্র উথলে উঠল।

চৈতন্য মৃদু হাসল। বলল : দামোদর তুমি না বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের রাগ, অভিমান, দুঃখ থাকতে নেই। অহংকারও তাকে মানায় না।

দামোদর নীরব। তার সব কথা হারিয়ে যায়। চৈতন্যের এই সব কথার সামনে সে একেবারে প্রতিরোধহীন। নিঃশব্দ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছিল তার বুক। একটু হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। অশ্রু অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল : নীলাচলে আপনি ছিলেন জনগণের সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং জনপ্রিয়। তীর্থযাত্রীরা তীর্থ দর্শনে এসে আগে আপনাকে দর্শন করে, তারপর মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথকে প্রণাম করে। আপনি তাদের চোখে নররূপী জগন্নাথ। অচল জগন্নাথ সচল হয়ে উঠেছে আপনার মধ্যে। মানুষের প্রেমের ঠাকুরকে একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী সুনজরে দেখছে না। তাই, তাকে অপমান করতে হন্যে হয়ে উঠেছে। অথচ দেশের রাজার কোন অভিযোগ নেই, তিনি কোন দোষ অপরাধ খুঁজে পাচ্ছেন না। তা হলে কার কাছে অপরাধী আপনি?

চৈতন্য নীরব। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে লাগল তার মাথার ভেতরটা। আর কেমন একটা অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মনটা। ভেতরে ভেতরে সে ভীষণ মুষড়ে পড়ল। আর কেউ না জানলেও সেত জানে, সন্ন্যাসটা তার ছদ্মবেশ। মানুষকে সংস্কারের অচলায়তন থেকে সমাজকে মুক্ত করা, সমতা আনা এবং সবার উপরে মানুষ সত্য এই আদর্শ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে এক অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠন এবং শ্রীকৃষ্ণের পথে ভারতের মুক্তি, এরকম একটা বিশ্বাসে প্রত্যয়বান হয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল। সংসার পলাতক কিংবা নির্জন গুহাবাসী সন্ন্যাসীর মত সমাজ থেকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে কোনদিন ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন হয়নি। মানুষ তার সাক্ষাৎ ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর ভারতবর্ষের সমাজে আচার-প্রথা-সংস্কার বিশ্বাসের কারাগারে বন্দী। সেই বন্দী মানুষের শৃংখল মুক্তি ছিল তার ঈশ্বর সাধনা। মানুষের ভেতরেই জগতের নাথকে খুঁজতে গিয়ে নিজেই মানুষের চোখে হয়ে উঠল অচল জগন্নাথের সচল স্বরূপ।

হিন্দু অধ্যুষিত ভারতভূমিতে হিন্দুর মানস মুক্তির অভিযানে এবং হিন্দু-ধর্ম রক্ষায় তাকে একজন সুচতুর রাজনীতিকের ভূমিকায় খুবই প্রচ্ছন্নভাবে পালন করতে হয়েছিল। তাতে অনেকের রাজনৈতিক স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষুণ্ণ হল পুরী মন্দিরের পাণ্ডা ও পুরোহিতদের। তাদের বহু-কালের প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্বের উপর হাত পড়ায় তারা খুবই ক্ষুব্ধ। কিন্তু উৎকলের মানুষের তাতে কোন অকল্যাণ, কিংবা অমঙ্গল হয়নি। তার অপরাধ, নীলাচলকে মানবপূজার সাধনক্ষেত্র করেছে। কেননা সর্ব মানবের মিলন তীর্থ হওয়ার এক উপযুক্ত এবং অনুকূল অবস্থা এখানেই ছিল। এটি এক হিন্দুরাজ্য। তারপর ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তের লোক সারা বছর ধরে এখানে যাওয়া আসা করে। তারা আসে জগতের নাথ যিনি, সেই সর্বৈশ্বর্যময় বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের কাছে। ভগবানের কাছে মানুষের কোন জাত, ধর্ম, ছোট বড়, ধনী-দরিদ্র, জমিদার-মহাজন ছুঁ্যৎ অচ্ছুঁ্যৎ বলে কিছু নেই। সকলে তাঁর কাছে যেতে পারে ও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে এবং দর্শন করতে পারে। পুরীর মন্দিরের সেই বন্ধ দরজাটা চৈতন্য সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে দিল। রথের রশি ধরার সকলের অবাধ অধিকার। এতবড় একটা ধর্মীয় বিপ্লবের সাফল্য ধর্মব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। শ্রীচৈতন্যকে তারা সহ্য করতে পারছিল না। তাই তাকে হেয় এবং অপমান করার এক চক্রান্তে মেতে উঠল। তাদের চক্রান্তের শিকার না হওয়ার জন্যেই ভীষণ মৌন এবং নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে ঈশ্বরের বিচিত্র লীলারস আস্বাদনে নিমগ্ন হয়ে রইল। এসব গূঢ় কথা দামোদরকে কেমন করে বলে শ্রীচৈতন্য? তাই সে চুপ করে রইল। আজকাল অবশ্য কথা খুবই কম বলে। কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং বিশ্বস্ত পার্ষদের মধ্যে তার বাক্যালাপ সীমাবদ্ধ।

রামানন্দ চৈতন্যকে মৌন দেখে বলল: প্রভু, বহু মানুষের সঙ্গে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা, হরিনাম করা এক জিনিস আর তার স্বরূপকে অনুধ্যান করা আর এক ব্যাপার। সংকীর্তনে সবটাই বাহ্য উচ্ছ্বাস, তাতে চিত্তে একাগ্রতা আসে না। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় না। নিভৃতে ঈশ্বর চিন্তার মধ্যে ডুবে যাওয়া দরকার। মনের মধ্যে তাঁকে খুঁজতে হবে। নিভৃতে, নির্জনে ঈশ্বর চিন্তায় একাত্ম হয়ে না গেলে সাধনায় সিদ্ধি আসবে না। চিত্তের মধ্যে তীব্র আর্তি না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সন্তানের অদর্শনে জননীর অন্তর যেমন ব্যাকুল হয়, সমস্ত চিত্ত যেমন উন্মুখ হয়ে উঠে ঠিক সেই

ধরণের প্রগাঢ় ব্যাকুলতার হৃদয় আর্ত্ত হলে তবে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

চৈতন্যের দৃষ্টিটা রামানন্দের মুখের উপর স্থির। অপলক চোখ দুটো কৌতুকে স্নিগ্ধ। হাসি হাসি চোখে নীরবে দেখছিল তাকে। বেশ বুঝতে পারল, রামানন্দের সুচতুর ভাষণে একটা নিষেধ প্রচ্ছন্ন। জগন্নাথ মন্দিরে তার যাওয়া আসা তার পছন্দ নয় বলে অন্তর্মুখী সাধনায় মেতে উঠতে ইংগিত করছে। কিছুক্ষণ রামানন্দের দিকে চেয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলল: আমার জন্যে তোমাদের খুব ভাবনা হয় তাই না?

রামানন্দ ফাঁপড়ে পড়ল। একবার ইচ্ছে করল মুখের উপর বলে হাঁ। কিন্তু সে রকম কথা বললে চৈতন্যের সন্দেহটাই কেবল দৃঢ় হবে। তাই হৃদয়াবেগ দমন করল। বেশ একটা ভাল জবাবও এসে গেল মুখে। বলল: ভালবাসার ধর্ম হল অকারণ উৎকণ্ঠা বোধ করা।

চৈতন্যদেব বিশ্বাস করল না। কিন্তু এই জবাবটা তার ভাল লাগল। তবু হাসি হাসি মুখ করে বলল: তোমরা এভাবে আর কতকাল আগলে রাখবে? হঠাৎ অন্তর্মুখী সাধনায় লিপ্ত হয়ে থাকলে শত্রুরা বলবে কি?

রামানন্দ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল: সন্ন্যাসীর এত আমি আমি ভাব কেন? প্রভুত্ব চালাবার যদি এত ইচ্ছে থাকে তা-হলে নিঃস্ব রিক্ত সন্ন্যাসী সাজতে গেলেন কেন? আপনি কি মনে করেন সন্ন্যাসীর এই ছদ্মবেশ অন্যেরা বোঝে না?

রামানন্দের কাছে ধমক খেয়ে চৈতন্য চমকে উঠল ভীষণভাবে। শীতের হাড় কাঁপুনি বাতাসের মত ভেতরটা তার কেঁপে গেল। গভীর একটা ব্যথায় থমথম করতে লাগল তার মুখখানা। করুণ আর মৃদুকণ্ঠে বলল: মন থেকে আমিটাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে কত চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। পারিনি রামানন্দ। পারিনি—কেমন বুকফাটা হাহাকারের মত শোনাল তার কথা-গুলো।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল।

ধীর পদক্ষেপে কেমন আচ্ছন্নের মত রামানন্দের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল। কাঁধে হাত রেখে বলল: তুমি ঠিক বলেছ রামানন্দ। অনেক ভুল আমি করেছি। আজ তার প্রায়শ্চিত্তের দিন। পাণ্ডাদের অপমান, অমর্যাদা আমার প্রাপ্য। তোমার তিরস্কারে যদি চৈতন্যোদয় হয়।

কথাগুলো রামানন্দকে বিঁধল। দু'চোখ ছল ছল করে উঠল। আর্ত্ত গলায় বলল: প্রভু অমন করে বলবেন না। আপনার অনুশোচনা দেখে বুক

আমার জ্বালা করছে।

চৈতন্যের কণ্ঠস্বরে উদাস প্রসন্নতা। বলল: রামানন্দ একদিন দুর্বার উন্মাদনায় যে গণসংযোগ ঘটেছিল তার মোহ আজ আর নেই। মোহ চিরদিন থাকেও না মানুষের। মোহ কেটে গেলেই তবে আসে মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ। কাল নিরপেক্ষ। সময়ের স্রোতে যা ভেসে যাবার তা যাবেই। তার জন্যে দুঃখ করব কেন? যদি সত্য মূল্য কিছু দিয়ে থাকি তবে মহাকালের মহাফেজখানায় তা একদিন জমা থাকবেই।

রামানন্দ কথা বলতে পারল না। চুপ করে ছিল। নিটোল স্তব্ধতার মধ্যে রাত্রিটা ডুবেছিল বেশ কিছুক্ষণ। এই সময়টা চৈতন্য ভাবছিল, আর নিজেকে প্রশ্ন করছিল মানুষের মোহ সত্যিই কেটে গেছে কি? হরিনাম সংকীর্তনের যে বিপুল জোয়ারের বেগে নীলাচল ভেসে গিয়েছিল তার কিছুই কি মানুষের অন্তঃপুরে অবশিষ্ট নেই? সে কি শুধুই উচ্ছ্বাস? কয়েকটা মুহূর্ত কাটল নিঃশব্দে। চৈতন্যের কিন্তু উদ্বেগ নেই। মুখে অনিন্দ্য সুন্দর হাসি। বলল: যে জীবনের সামনে অনির্দ্দিষ্ট সমুদ্র সেখানে কে সঙ্গে চলল সেটা খুব বড় হয়ে উঠে না, তবে মানুষের অন্তঃস্থলের বিশ্বাসের মূল শুদ্ধ ধরে নাড়া খেয়ে গেছে। এটাই আমার সান্ত্বনার পুরস্কার। এক জীবনে এর বেশি কি চাইব?

রামানন্দের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘ-শ্বাস পড়ল খুব ধীরে, বলল: প্রভু তুমি আমাদের সচল জগন্নাথ। আমাদের কাছে ঈশ্বরের ধ্যানমূর্তি। ঈশ্বর ধারণার সহায়ক। আমাদের মানসিক আশ্রয়। সকল বিতর্কের অতীত। ক্ষুদ্র মূঢ় প্রাণীর কি শক্তি তোমাকে ধারণা করবে? সেইজন্যে নিজে থেকে আমাদের ভাবনায়, কল্পনায় ধরা দিয়েছ। জগন্নাথ তোমার মধ্য দিয়েই আমাদের ভক্তি প্রেম, শত্রুতা বিরূপতা আস্বাদন করছে। তুমি ভক্তের আশ্রয়, সচ্চিদানন্দ।

রামানন্দের কথাগুলো শুনতে শুনতে চৈতন্য কেমন হয়ে গেল। মনে হল সমস্ত চেতনা তার লুপ্ত হয়ে গেছে। নিদ্রোত্থিতের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে দূরে বহুদূরে জ্যোৎস্নালোকিত জগন্নাথ মন্দিরের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বসে রইল।

চৈতন্য বুঝতে পারছিল অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ তার মন্দিরে যাওয়া কিংবা

গম্ভীরার বাইরে যাওয়া কোনমতে অনুমোদন করছে না। মানুষের হৃদয়ে তার ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে ধরে রাখার জন্যে মানুষের সংস্পর্শ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী। এতে মানুষ তার সম্পর্কে অতিমাত্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠবে। তার রহস্যময় আত্মগোপন নিয়ে অনেক কিংবদন্তির সৃষ্টি হবে। তবু এসবে তার মন ভুলে থাকল না। ভাবতে গিয়ে কুল-কিনারা হারিয়ে ফেলল।

এই দুরন্ত অস্থিরতায় সে চৌকি থেকে উঠে চঞ্চল পায়ে পায়চারি করতে লাগল। দামোদর ছায়ার মত অতন্দ্র পাহারায় সর্বক্ষণ পাশে পাশে থাকে। চৈতন্যকে হঠাৎ উঠতে দেখে ধীর স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল: সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করলে রুদ্ধ আক্রোশে শুধু ছটফট করে, আপনাকেও ভীষণ বিচলিত দেখছি। কি হয়েছে আপনার?

দামোদর, আমি যে অক্ষম নই, অসহায় নই এই কথাটা দারুণভাবে প্রমাণ করতে হবে। যারা অপমান করতে চাইছে তাদের সে সুযোগ দিতে চাই না আর।

তাতেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

খানিকটা যাবে।

কি ভাবে?

আমি নীলাচল ছেড়ে চলে গেলে বিরোধীদের উত্তেজনা হ্রাস পাবে। তারা শান্ত হবে।

কথাটা শুনে দামোদরের বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। বেশ গম্ভীর গলায় বলল: এ রকম কথা আর কখনও উচ্চারণ করবেন না।

কিন্তু নীলাচল আমাকে ছাড়তে হবেই। সে অনেক কারণ।

চৈতন্যের এ কথায় দামোদর একটু ঘাবড়ে গেল। বলল: কেন?

সব কথা বলতে নেই। বলা উচিতও নয়। চতুর্দিকে শত্রু। কথায় বলে দেয়ালেরও কান আছে। সামনে একটা নিদারুণ সংকট আসছে। সেই ঝড় ঠেকানো কাজটা শুরু করতে চাই।

সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে দামোদর এক গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। কিছুতেই বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কি? কৌতূহলটাই কেমন তীব্র হচ্ছিল। একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, কী কারণ তা আমার জানা দরকার। নীলাচল এখন অগ্নিগর্ভ।

খানিকক্ষণ সময় নিয়ে চৈতন্যকে বলল : আপনাকে বলতেই হবে। আপনাকে রক্ষার ভার আমার।

বৃন্দাবনে একবার না গেলেই নয়। রূপ সনাতনকে অনেককাল দেখিনি। তাদের একবার দেখে আসব।

দামোদর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চৈতন্যকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল : শুধু এইটুকু ?

চৈতন্য শান্ত গলায় বলল : হাঁ।

দামোদর স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে বলল : নীলাচল কেন, উৎকল জুড়ে একটা অশান্তি, উত্তেজনা গণ্ডগোল, গৌড়ের সন্ন্যাসীকে নিয়ে চক্রান্ত, একটা অদ্ভুত ও অর্থহীন ষড়যন্ত্র—এসব কথা তাদের বলবেন না ?

শুনেই চৈতন্যের মুখখানা ধরা পড়ে যাওয়ার বিড়ম্বনায় সাদা হয়ে গেল। একটু বিব্রতভাবে মাথা নাড়ল। বলল : হাঁ।

এই জবাবে দামোদর একটু ধাক্কা খেল। খানিকক্ষণ সময় নিল। চৈতন্যকে একটা অস্বস্তিতে বারবার উশখুশ করতে দেখল। তারপর একটু মলিন হেসে মৃদুস্বরে বলল : আপনি চিন্তা করছেন কেন ?

চৈতন্যকে ভারী ক্লান্ত দেখাল। মুখের সেই দ্বিধার ভাবটা তখনও ছিল। আস্তে আস্তে বলল : দামোদর, বৃন্দাবন যাওয়ার পথে উড়িষ্যার বৈষ্ণবদের পাঁচটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। তারা আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং অন্ধ অনুরাগী। এরা একত্রিত হয়ে হরিনাম সংকীর্তন অব্যাহত রাখবে। ভক্ত হৃদয়ের দুঃখ দূর করতে, পাপের উচ্ছেদ সাধন করতে এবং সাধু মানুষদের পরিত্রাণ করতে ভগবান শ্রীহরি সর্ব মানবের তীর্থক্ষেত্রকে নিজ লীলারস আস্বাদনের ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেছেন। এই কথাটা উৎকলের আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তোলার দায়িত্ব দিয়ে যাব পাঁচ সম্প্রদায়র অধিকারী যথাক্রমে জগন্নাথ, বলরাম, যশোবন্ত অনন্ত ও অচ্যুতানন্দকে। এই পঞ্চসখা তোমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। আমার অনুপস্থিতিতে এখানকার সব কিছু তুমি দেখবে।

কৃষ্ণপ্রাণ চৈতন্যের বুকের মধ্যে একটা ঝড় উঠল। সমুদ্রের ঝড়ের চেয়ে ঢের বেশি উত্তাল। কিন্তু বাইরে তার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। তীব্র একটা আবেগে হৃদয়ের অভ্যন্তর মথিত হতে লাগল। রামানন্দর কথাগুলো তার

সব গণ্ডগোল করে দিল। জানা কথাও অপরূপ হয়ে গেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে রামানন্দের অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর চোখ পেতে রাখল।

রামানন্দর দু'চোখ বোজা। ধ্যানের মধ্যে ডুবে গিয়ে সে যেন কথাগুলো আহরণ করে আনছিল অন্য কোন অজ্ঞাত রহস্যলোক থেকে। বলছিল ঃ প্রভু প্রেম ও ঈশ্বরে কোন তফাৎ নেই। প্রেমের কোন রূপ নেই, ঈশ্বরেরও কোন আকার নেই। প্রেম একটা অনুভূতি, ঈশ্বরও একটা উপলব্ধি। ভালবাসাই ঈশ্বর লাভের উপায়। পাত্রভেদে ভালবাসা ভিন্ন ভিন্ন। তার স্বাদ প্রকাশও আলাদা। পুরুষও প্রকৃতিরূপে এই ভালবাসার রস আস্বাদন করছে নিখিল। মা পুত্রের একরকম ভালবাসা, আবার স্বামী স্ত্রী একরকম, পিতা ও কন্যার, ভাই ও বোনের একরকম, ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব একরকম। মানুষের এই ভালবাসা চিরসুন্দরের আঙিনায় লীলাভিসারে "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"। মানব-মানবীর এই নিত্য স্তব্ধ প্রেম পুরুষ প্রকৃতি রূপে অন্তরে বাইরে প্রেম ডোরে বাঁধা। এই মানবিক সত্য অমৃত পিপাসু প্রেমের কবি চণ্ডীদাসের ছন্দে নব আনন্দে ব্রহ্মানন্দ রসের আস্বাদন করেছে সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। নর-নারীর প্রণয়ে একাত্মবোধ জীবনে মরণে প্রেমাস্পদের জন্যে আকুলি-বিকুলি বিদ্যাপতির পদে অমর হয়ে আছে ঃ

জনম অবধি হাম ও রূপ নেবারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

কৃষ্ণ বিরহে যুগযুগান্ত ধরে দিবানিশি ভক্ত হৃদয় কেঁদে কেঁদে ফেরে

এখন কখন করি দিবস গোঙায়নুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিস গোঙায়নুঁ
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥

আজ সে শ্যাম নেই, বাজে না বাঁশরী যমুনার কূলে। ছোটে না সেই গাভীর দল হাম্বা হাম্বা করে, নাচে না সেই রাখাল বালকেরা হাত তালি দিয়ে বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরায়, আজ কাঁদে না সে, 'গোপীগণ বিবশ হইয়া'! তবুও সেই প্রাণ কাঁদান মুরলীর ধ্বনি আজও তেমনি উদ্বেল করে ভক্ত হৃদয়।

প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল চৈতন্যের মুখাখানা। উৎসুক চোখ দুটো

আগ্রহের প্রদীপের মত জ্বলে উঠল। শান্ত নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর বুকের ভেতর কথাগুলো সংগীতের সুরের মত দ্রুত লয়ে অবিরাম বাজতে লাগল। আর এক আশ্চর্য অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ল চেতনার ভেতর, সমস্ত সত্তার ভেতর। নিজের মনে নিঃশব্দে বলল: যমুনাতীরের সেই বিশ্ববিমোহিনী ঝংকার কোন দিনই থামেনি, তেমনি সুরে, তেমনি আকুল, তেমনি বিহ্বল। কত যুগ পরে শ্যামসুন্দরের রূপে পাগল বাঁশরী বিতানে আত্মহারা কেন্দু বিল্বের জয়দেব গোস্বামী বুক ভাসান, মন কাঁদান, প্রেমের লহরী তুলেছেন ভক্ত ও ভগবানের প্রাণে। প্রেমের অনন্ত মহিমার কাছে নিবেদনের সকরুণ ব্যাকুলতা ভক্তের মত ভগবানের অন্তরেও জাগল। "দেহি পদপল্লব মুদারম।" ভক্ত ও ভগবানের চিরকালের দেয়ালটাকে ভেঙে দিল কবি।

চৈতন্য স্তব্ধ, গম্ভীর, বিহ্বল। তার চেতনার ভেতর জ্বল জ্বল করতে লাগল রাধা ও কৃষ্ণের ছবি। রাধা অভিমান করে ঘাড় ফিরিয়ে বসে আছে, আর কৃষ্ণ পায়ের কাছে বসে তার পা দু'খানি ছুঁয়ে আছে। রাধা বাঁধা দিতে চেষ্টা করছে। কৃষ্ণের মুখে দুষ্টু হাসি। রাধার দুই চোখ বোজা। অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে মুখখানা। সংকোচে, কুণ্ঠায়, লজ্জায় মুখের সঙ্গে দেহটাও কুঁকড়ে দুমড়ে যেতে লাগল। আর একটা তীব্র অস্বস্তিতে সে মাথা নাড়তে লাগল।

জগন্নাথ মন্দিরের বিশাল পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। সেই দিকে চোখ দুটো তীব্র আবেগে ছড়িয়ে দিতেই তীব্র আবেগে কাঁপতে লাগল ঠোঁট দুটো। যেন নিঃশব্দ আকুল প্রার্থনা জাগিয়ে বলল: রামানন্দ, প্রত্যেক মানুষের ভেতর ঈশ্বর আছেন। কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়। ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক অভিন্ন। দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া, এক তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া। বলতে বলতে তীব্র আবেগে তার দুই চোখ বুজে এল। তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছিল।

রামানন্দ ধ্যান থেকে জেগে উঠল। কেমন একটা আস্বাদিত পূর্ব সুখের অনুভবে তার চেতনা আবিষ্ট হয়েছিল। চৈতন্যের কথাগুলো তখনও তার কানে সেতারের মত রিন্ রিন্ করে বাজছিল। বলল: যাকে ভালবাসে তাকে সবটুকু উজার করে দিলে তবে'ত ভালবাসা পাবে। শ্রীরাধা যে তাঁর জন্যে সব ত্যাগ করেছে সমাজ সংসার, সংস্কার, লজ্জা। সবটুকু রাধা দিয়েছিল বলে তিনিও নিঃস্ব হয়ে নিজেকে একজন সেবকের মত নিবেদন করল। আর

তখনই ভক্তের জীবনে বড় সমস্যা হল, যাঁর জন্যে তার এই আকুলতা, তিনি যখন বলছেন কি চাও বল ? তখন চাইবার কিছু থাকে না। সে মুহূর্ত'ত সমাধিস্তরে ; তখন সব একাকার। স্ত্রী, পুরুষ, ভক্ত ভগবান ভেদ থাকে না।

চৈতন্য রামানন্দকে দেখছে। তার মুখ চোখ কেমন যেন অন্যমনস্ক কি ভাবছিল সে, কে জানে ? চৈতন্য নিজেও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

গম্ভীরাতে দিনগুলো বিবিধ তত্ত্ব কথা আলোচনায় সকাল থেকে সান্ধ্য একই নিয়মে গড়িয়ে চলে।

গম্ভীরার গবাক্ষ হীন কুটীরে অভ্যন্তরের দিনগুলো দুঃসহ শূন্যতায় চেপে ধরল। এই শূন্যতাবোধ তার অস্তিত্বের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। শূণ্যতার এই অনুভূতির উৎস তার মনে না শরীরে অনেকদিন ধরে বুঝবার চেষ্টা করল শ্রীচৈতন্য, মনের অনেক নীচে গহন লোকের গূঢ় কথাত বলে বোঝানো যায় না। তবু, এর একটা অর্থ টের পায়। বেশ বুঝতে পারল, অন্য কাউকে নয় সে নিজেকেই খুঁজছিল। কারণ সে যা বলতে চেয়েছিল তা বলা হল না। সে যা চেয়েছিল তাও পাওয়া হল না। এই অনির্দ্দিষ্ট আকাংখায়, এই চির অতৃপ্তির কোন নাম নেই।

চৈতন্যের মনের গভীরে যে পরিবর্তনটা চলেছে তার রূপ, তার প্রকৃতি অন্য।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত চৈতন্যের বিনিদ্র অবস্থায় কাটতে লাগল। তার ভেতরের অহংটা পুড়তে শুরু করেছে! আর তার দীপ্ত শিখায় ভেতরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। একটু একটু করে গলে যাচ্ছে। মোমবাতির মত গলে পড়ছে ভেতরটা। প্রেমের আলো তার অন্তরের গভীরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। সত্যের পূর্ণ মূর্তি দেখতে পাচ্ছে।

রামানন্দর আশ্চর্য লাগে। ভাবাবেশের সময় রাধা-কৃষ্ণের যুগ্মসত্তা তার ভেতর যেন এক হয়ে গেছে। ভক্ত ও ভগবান এক অঙ্গে দুইরূপে মূর্ত হয়ে উঠে। বহিরঙ্গে রাধার বক্ষদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা, আর অন্তরঙ্গে আর একটা ভাব জাগে সেটা একেবারে অন্য।

দামোদরের বিস্ময়ের অন্ত নেই। সে রামানন্দের দিকে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করে ঃ এ কোন লীলারূপ প্রভুর ?

রামানন্দ তদগতভাবে বলল ঃ পরমানন্দময় থেকে বিশ্বের সব কিছুর

সৃষ্টি। আনন্দময় সচ্চিদানন্দ সকলের মূলে থেকে বুঝিয়ে দিতে চান নিরন্তর আনন্দ ও নিরানন্দ ক্রমবিবর্ত্তনেরই প্রকাশ। চাকা ঘুরে আজ হয়ত যেমন নিরানন্দ আনছে তেমনি নিরানন্দ এলেই বুঝতে হবে আনন্দ এলরে। দুঃখের মধ্যেও যে আছে আনন্দের এক রস। নিরানন্দের পাত্র পূর্ণ হলে বুঝতে হবে এবার তা উপচে আনন্দের আধারে পড়বে। নিরানন্দের ভাণ্ডার শেষ হয়ে আনন্দের কুঠুরী খুলে দেবেন দয়াময়।

প্রভুর ধ্যান ভাঙলে মুগ্ধ অভিভূত দামোদর প্রশ্ন করলঃ প্রভু, রাধাকে কখনো চোখে দেখিনি। কিন্তু আজ তাকে জীবন্ত প্রত্যক্ষ করলাম আপনার ভেতরে। আপনার সত্তার ভেতর ধ্যানের ভেতর এত ব্যাকুলতা, এমন আর্ত্তি, প্রগাঢ় দুঃখ যন্ত্রণার এত কষ্ট আগে কখনও দেখিনি।

চৈতন্যের মুখে অনির্বচনীয় হাসির দীপ্তি। মৃদু কণ্ঠে বললঃ আমি'ত কোন কষ্ট পাইনি দামোদর। কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তার সঙ্গেই'ত ছিলাম সর্বক্ষণ। তুমি ভুল বলছ। কষ্ট পেলে টের পেতাম।

দামোদর বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল চৈতন্যের দিকে। বুকের ভেতর অনেক জিজ্ঞাসা আটকে ছিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে কয়েকটা মুহূর্ত লাগল। তারপর আস্তে আস্তে বললঃ আপনিত আর আপনার ভেতর নেই। তাই এই সব কিছুই টের পাচ্ছেন না। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে আপনার এত কষ্ট আমাকে দেখতে হচ্ছে।

কিন্তু আমার বুকের আর্তির ভেতর কৃষ্ণের মুখ জেগে উঠল। আমার সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। শরীরটা আমার হাল্কা হয়ে গেল। মনে হল আমি যেন উড়ে যাচ্ছি। কৃষ্ণের হাতের বাঁশরী আর তার সেই অদ্ভুত হাসিটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সব মধুময় মনে হচ্ছে।

॥ চোদ্দ ॥

শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন ফেরার অল্পকাল পরেই সুদূর পাঞ্জাব থেকে রাজনৈতিক নেতা ও শিখধর্মগুরু নানক এলেন চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে ধর্মালোচনায় কাটল নানকের দিনগুলো। তার

পরেই, একে একে এল উত্তর ভারতের ভক্ত সাধক সন্ত কবীর, সন্ত রুইদাস, অসমীয়া মহাপুরুষ শঙ্কর দেব, দক্ষিণ ভারত থেকে এলেন রাজা অচ্যুতানন্দ রায়, বিজয় নগরের রাজগুরু ব্যাসরায় আর বহু সুফী সাধক। গম্ভীরা হয়ে উঠল বহু মনীষীর স্মৃতি বিজড়িত এক মন্দির! উৎকলের হরিনামের মরা গাঙে নতুন করে লাগল জোয়ার।

গোবিন্দ বিদ্যাধরের সন্দেহপ্রবণ সতর্ক মনটি বুকের অতলে একটা অশুভ কিছু টের পেল। চৈতন্যের ভাবমূর্তি আগের চেয়ে বেশি উজ্বল হয়ে উঠেছে। গম্ভীরা থেকেও খুব একটা বেরোয় না। দর্শনার্থীদের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়ে খুব অল্পক্ষণের জন্যে মাত্র সাক্ষাৎ করে। মানুষের সঙ্গে দিন দিন তার দূর ব্যবধান যত সৃষ্টি হচ্ছে ততই সাধারণ মানুষের সব রাগ অসন্তোষ গিয়ে পড়ছে পুরীর পাণ্ডা এবং পুরোহিতদের উপর। তাদের মধ্যে প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার জন্যেই সচল জগন্নাথের দর্শন হতে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এই আক্ষেপ দিন দিন তীব্র হল। চৈতন্য যে সচল জগন্নাথ তাতে সাধারণ মানুষের কোন সন্দেহ ছিল না। নররূপী ঈশ্বর বলতে সারা ভারতবর্ষ থেকে বড় বড় সাধু সন্ত মহাপুরুষ, রাজা মহারাজা তাকে দর্শন করতে ছুটে আসছে। তিনি কারো কাছে ছুটে যাচ্ছেন না। সবাই তাঁর কাছে আসছে। দর্শনার্থীরা চলার পথের ধূলি নিতে নিতে সমস্ত পথটাই গর্ত করে ফেলছে। মানুষের এই মুগ্ধতা, উন্মত্ততা উৎকলবাসীকে পুনরায় চৈতন্যের দিকে মাধ্যাকর্ষণের মত প্রবল বেগে টানতে লাগল। গোবিন্দ বিদ্যাধর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল।

এলোমেলো হাজার চিন্তা বিদ্যাধরের মস্তিষ্কে জট পাকাল। একটা কিছু তাকে করতে হবে। কিন্তু কি করলে এই সন্ন্যাসীর উপর প্রতিশোধ নেয়া যায়, তার চিন্তা তাকে একটা মারাত্মক কিছু করে ফেলতে উত্তেজিত করছিল। কিন্তু তার উপায় এবং কৌশলটা নির্ভর করতে পারল না। পারবে কোথা থেকে? সে'ত শুধু সন্ন্যাসী না, জনগণের সচল জগন্নাথ।

একা একা বসে গোবিন্দ বিদ্যাধর নিজের মনের অভ্যন্তরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার রূপটা দেখতে লাগল। সন্ন্যাসীর সঙ্গে এমনিতে তার কোন বিরোধ নেই। কিন্তু তার লোভের সঙ্গে উচ্চাকাংখার সঙ্গে সন্ন্যাসীর একটা বিরোধ বেধেছে। কিন্তু সন্ন্যাসী উপলক্ষ্য। রাজা প্রতাপরুদ্রের গায়ে তার চক্রান্তের কোন আঁচ যাতে না লাগে তার এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে জনগণকে দিয়ে, সারা ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে একটা

নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করে। এই স্নায়ুচাপ কাটিয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে কিছু করা সুকঠিন। শুধু তাই নয় চৈতন্যের প্রভাবেই রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে বিজয়নগরের প্রবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণদেব রায়ের বৈবাহিক সৌভ্রাত্র সম্পর্ক বেপরোয়াভাবে কিছু করার পথে তার এক প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ এই সন্ন্যাসী তাকে কূটবুদ্ধির নাগপাশে এমন আষ্টেপিষ্টে বেঁধেছে যে, তা থেকে পরিত্রাণের কোন রাস্তা নেই। সন্ন্যাসী তার উচ্চাকাংখার প্রতিবন্ধক। সমাজ সচেতন, রাজনৈতিক সচেতন সন্ন্যাসীর ক্ষুরধার বুদ্ধি, কূট রাজনীতিজ্ঞান তার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকেও হার মানিয়ে দিল। অথচ তার পরিকল্পনা ও কৌশলের রাজনৈতিক রূপ কখনও দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। কিন্তু তার গোপন চক্রান্ত ও পরিকল্পনাকে ঠিকই অনুমান করতে পারল।

চৈতন্য সন্ন্যাসী। ধ্যানে অভ্যস্ত। ধ্যানে একটা মানসিক স্থিরতা আসে। ধ্যানে অনেক কিছু গভীর করে উপলব্ধি করা যায়। অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে যায়। তাই বোধ হয় এমন করে তার বিশ্বাসের প্রত্যয় ভূমি ভেঙে চৌচির করে দিচ্ছিল।

এরকম একটা ব্যর্থতা, বিফলতার অবসাদ তাকে স্থির থাকতে দিল না। চৈতন্যের উপর তার আক্রোশ দিন দিন প্রবল হল। এবার তার সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে এক গোপন কুটিল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করতে হবে। চৈতন্যের মনের অভ্যন্তরে সে সংঘাত পৌছে দিতে হবে।

এ কার্যে সহায়রূপে তাকে চৈতন্যের অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তির সহায়তা দরকার। কিন্তু কে সে? মনের গভীরে তন্ন তন্ন করে একটি চেনা মুখ খুঁজতে লাগল। অনেকের নাম, মুখ মনে পড়ল। কিন্তু কেউই নির্ভরযোগ্য ছিল না। বিশ্বাসযোগ্য হল না। বেশ একটু হতাশ হল বিদ্যাধর।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিদ্যাধরের ঘুম হল না। মাথায় ধিকি ধিকি অঙ্গার জ্বলছে। চারদিকের কলুষিত পরিবেশের ভেতর কাউকে বিশ্বাস করার মত নেই। প্রশস্ত ঝুলন্ত বারান্দায় এসে দাঁড়াল বিদ্যাধর। সামনে দিগন্তনীল সমুদ্র আর নির্মেঘ আকাশ। সমুদ্রের বুকে ঝলকে ঝলকে বাতাস এসে লাগছে তার গায়। হতোদ্যম বিদ্যাধর উর্ধ্বমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। আকাশ শান্ত, নির্বিকার। তার কোন দুঃখ, উন্মাদনা, ক্ষোভ, বিদ্বেষ কিছু নেই। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র সন্ন্যাসীর চোখ হয়ে যেন তাকে নিরীক্ষণ করছে। তার বুক থেকে উর্ধ্বে ধাবিত হয় পুঞ্জীভূত অভিমান।

অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল বিদ্যাধর। তারপর একটা আরাম কেদারায় দেহটাকে এলিয়ে দিল। বাতাসে মাথার চুল এলোমেলো হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে, জলও আসে।

বসে থাকতে থাকতে সহসা একখানা খুবই পরিচিত মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে মুখ জগন্নাথ দাসের। চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পঞ্চসখার এক জন। অমনি বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। একদা এই মানুষটি দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হলে সে উদ্ধার করে এবং শুশ্রূষা করে সে যাত্রার মত বাঁচিয়ে তোলে। এই লোকটির তার প্রতি এক ধরণের দুর্বলতা এবং কৃতজ্ঞতা আছে। জগন্নাথ দাসের দুর্বলতা ও কৃতজ্ঞতাকে তার মূলধন করে তুলতে হবে। জগন্নাথ দাসকে সব দিক দিয়ে তার উপযুক্ত মনে হল। সে চৈতন্যের খুব কাছের মানুষ। তার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও সহায়। তার অসাধারণ লোকরঞ্জন ক্ষমতার গুণে উড়িষ্যার সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রিয় এবং প্রত্যেকের সঙ্গে তার সম্বন্ধও মধুর। চৈতন্যের পঞ্চ সখার আর চারটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কও খুব আন্তরিক। তার পক্ষেই প্রচ্ছন্নভাবে সন্দেহের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করা সহজ।

এরকম একটা ভাবনা চিন্তায় গোবিন্দ বিদ্যাধরের মনে আশা জাগল। ভরসা হল। মনের ভেতর একটু জোরও পেল। মনে মনে জগন্নাথকে ব্যবহার করার একটা ছকও করল।

প্রত্যুষেই জগন্নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাত্রা করল। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এরকম কোন ধারণা জগন্নাথের হল না। কাকতালীয় ভাবেই যেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আচমকা। প্রাথমিক বিস্ময় ও কুশল জিজ্ঞাসার পর বিদ্যাধর তার কৃতজ্ঞ ও দুর্বল মাটিকে নাড়া দেয়ার জন্য অতীতের ঘটনা পুনরুল্লেখ করল।

আচমকা একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল জগন্নাথের। বুকটা তার কেমন করে উঠল। বলল: আপনার ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না।

বিদ্যাধর একটু হাসল। বলল: শোধ করতে চাও তুমি?

আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ আপনার কোন কাজেই লাগবে না। প্রতিদানে কিছু করতে পারলে ভালই লাগত।

বিদ্যাধর নীরব। তার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অনেক কথা ভাবল

বিদ্যাধর। বলল : যুগটা অকৃতজ্ঞতার তুমি যে এখন মনে রেখেছ তাইতো আশ্চর্য বোধ করছি। ভিতরকার উত্তেজনায় বিদ্যাধরের বুক কাঁপছিল। গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে স্নেহ ভরে বলল : তোমার প্রতি আমার একটা মায়া পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলে তুমি আমার একজন সহযোগী হয়ে উঠতে পার।

জগন্নাথ চমকে উঠল। তার বক্ষস্পন্দন দ্রুত হল। বলল : আমি একজন কৃষ্ণপ্রাণ সামান্য বৈষ্ণব। রাজনীতি, কূটনীতি কিছুই বুঝি না। আমাকে নিয়ে এই মর্মান্তিক পরিহাস করা আপনার শোভা পায় না। আমাকে অপমান করে আপনি কি খুব আনন্দ পান?

বিদ্যাধর একটু দিশেহারা হয়ে পড়ল। বলল : অনেক ভাবেই সহযোগিতা করা যায়। তোমাদের পঞ্চসখা এবং অন্যতম সুহৃৎ চৈতন্য সম্পর্কে আমার কৌতূহল অগাধ। কিন্তু তিনি'ত আর আমার মত একজন রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা করবেন না। তুমি করুণা করলে আমার চৈতন্যলাভ হয়।

জগন্নাথ শশব্যস্ত হয়ে বলল : করুণা কেন বলছেন? এত বিবেকের কর্তব্য। আপনার অনুমতি পেলেই আমি তাঁর গুনগান করে শোনাব।

বিদ্যাধর হাসল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল তার জবাব। বলল : তোমায় আমি যথাসময়ে স্মরণ করব। কিন্তু তোমার প্রভু যেন এসব জানতে না পারেন। তিনি রাজা ও রাজকর্মচারীদের উপর দারুণ চটা।

জগন্নাথ থামল। বলল : তাই হবে।

গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চৈতন্যের এমন নিস্পন্দ পাথর মূর্তি আগে কেউ দেখেনি। দেহে যেন তার প্রাণের স্পন্দন পর্যন্ত নেই। নির্লিপ্ত, নির্বিকার, ভীষণ মৌন, গম্ভীর শান্ত নির্বাক। কোন কিছুতে তার মন নেই। সমস্ত মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই বুঝি। কেমন যেন এক নিষ্ক্রিয় বিষণ্ণতার গহ্বরে ডুবে আছে সর্বক্ষণ।

বেশ বোঝা যাচ্ছিল ভেতরটা তার দুঃসহ যন্ত্রণার এক সমুদ্র। তার মনের ভেতর শান্তি নেই। যতদিন যেতে লাগল ততই তার মানসিক শক্তিতে টান ধরল। তার মনের মধ্যে এখন শুধু একটি মাত্র মুখ। সকাল থেকে রাত

অবধি সেই মুখ একবারের জন্যেও অন্তর্হিত হয় না। সে মুখ রাজা প্রতাপ রুদ্রের।

রাজা প্রতাপরুদ্র তার একজন ভীষণ অনুরাগী এবং ভক্ত। নিজেকে তার সেবা ও সুখের জন্যে উৎসর্গ করেছে। তাকে সুখী করতে সে নিজে কতটা দুঃখ পেল তার হিসাব করেনি। সর্বস্ব সমর্পণ করে সে শুধু কৃপা চেয়েছে। আনন্দ, ঐশ্বর্য, সুখ, বিলাস কিছুই চায় না। আত্মনিবেদনে তার সুখ এবং আনন্দ। এ রকম স্বার্থহীন দানে পরিপূর্ণ প্রেমই শ্রেষ্ঠ। তবু চৈতন্য প্রাণ প্রতাপরুদ্রকে করুণার বদলে একখণ্ড উত্তরীয় দিয়ে কৃপা করে-ছিল শুধু। সেই বস্ত্রখণ্ডটি বুকে চেপে ধরে এবং তার মধ্যে মুখ গুঁজে কতবার রাজা বলেছে ঃ প্রভু তোমার কৃপার কোন তুলনা হয় না। তোমার অনন্ত প্রেম সাগর থেকে একমুঠো ফেনা পাঠিয়ে আমাকে ধন্য করলে।

কথাটা চৈতন্যের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। স্বার্থহীন, প্রত্যাশাহীন এক সুখের গৌরবে প্রতাপরুদ্রের হৃদয়টা মহৎ আর উদার হয়ে গেল। ধর্মচর্চায় রাজা সব ভুলে রইল। নিয়মিত রাজকার্য দেখাশোনা না করার ফলে নানারকম প্রশাসনিক জটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অরাজকতা, বিশৃংখলা এবং গণরোষ দেখা দিল। বিশ্বাসঘাতক বিদ্যাধর তার পূর্ণ সুযোগ নিল।

রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে গোবিন্দ বিদ্যাধরের ক্ষমতার লড়াইটা বেশ জোরাল হয়ে উঠল। এতদিন ধরে যা ছিল চোখের আড়ালে এবার তা রাজ্য-ব্যাপী অরাজকতা বিশৃংখলা এবং জনরোষের মধ্যে প্রকাশ্য হয়ে পড়ল।

চৈতন্যের মস্তিষ্ক জুড়ে প্রতাপরুদ্রের জন্য চিন্তা। বিষণ্ণ প্রতাপরুদ্রের জন্য মমতায় ভরে উঠল তার অন্তর। তাই এক দুর্বিষহ অশান্তির ভেতর তার দিন কাটতে লাগল।

রাত গভীর। অন্ধকার ঘুট ঘুট করছে। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। অন্ধকারের ভেতর কাশীনাথ মিশ্রের বাড়িটা ভুতুড়ে লাগছিল। বাড়ির কাছে এসে রামানন্দের খেয়াল হল রাত খুব গভীর। চৈতন্যদেব হয়ত ঘুমুচ্ছে।

গা ছমছম পরিবেশ। দূরে শেয়াল ডেকে উঠল।

গম্ভীরার সামনে এসে দাঁড়াল রামানন্দ। দেখল প্রদীপ জ্বলছে ভিতরে। দরজার উপর সটান হয়ে ঘুমুচ্ছে দামোদর। আর চৈতন্য প্রদীপের সামনে চুপ করে বসে আছে। তার চোখে ঘুম নেই।

পদশব্দেই ঘুম ভেঙে গেল দামোদরের। মুখ ফেরাতেই রামানন্দকে দেখতে পেল। অবাক হয়ে বলল ঃ রামানন্দ তুমি ?

মুখে আঙ্গুল দিয়ে রামানন্দ চুপ করতে ইশারা করল। তাতেই চৈতন্য রামানন্দের আগমন টের পেয়ে গেল। মৃদু স্বরে ডাকল তাকে। বলল ঃ এস রামানন্দ। রাত্রি শেষ হতে আর কত বাকি ? অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা বড় যন্ত্রণা আর দুঃখের। তাই না ?

রামানন্দ কথা খুঁজে পেল না। কেমন দিশেহারা বোধ করল। প্রদীপের সলতেটা তেলের ভেতর ডুবিয়ে দিয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্যকে নিস্প্রভ করল। ছাই ছাই অন্ধকারে কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। টের পাওয়া যাচ্ছিল তিনটি মনুষ্য মূর্তির অস্তিত্ব।

চাপা গলায় ফিস্ ফিস করে দামোদরের দিকে চেয়ে বলল ঃ গোবিন্দ বিদ্যাধরের চরেরা চতুর্দিকে সতর্ক। তাই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আসতে হল। গোবিন্দ বিদ্যাধরেব সব আক্রোশ এখন প্রভুর উপর। তিনি তার পথের কাঁটা। তাই একটা হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

দামোদর অবাক স্বরে প্রশ্ন করল ঃ তুমি বলছ কি ?

দামোদর ভাবাবেগ ত্যাগ কর। বাস্তব বড় রূঢ়। তাকে বুক পেতে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু একটু সতর্ক থাকলে বড় সংকটও কাটিয়ে উঠা যায়। এখন থেকে আমিও তোমার সঙ্গে প্রভুর পাহারায় থাকব সর্বক্ষণ।

চৈতন্যের ভুরু কুঞ্চিত হল। একটু হাসল। মৃদু স্বরে বলল ঃ রামানন্দ বুক পেতে বাস্তবকে গ্রহণ করার কথা বলছ, কিন্তু আমাকে লুকিয়ে রাখছ এ কেমন কথা ? তোমরা সকলে মিলে আমাকে একটা গণ্ডিতে বেঁধে রেখেছ। বিশাল পৃথিবীটা আমার কাছে বোজা। একটা জানলা পর্যন্ত নেই। সমুদ্র আকাশ কতদিন দেখিনা ! এইভাবে লোকচক্ষুব আড়ালে কুনো ব্যাঙের মত বেঁচে থাকার সার্থকতা কি ? একে কি বেঁচে থাকা বলে ? জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একফালি জমিতে যেন থিতু হয়ে বসেছি। এ যেন মৃত্যুপথ যাত্রীর এক বিশ্রামের জায়গা।

রামানন্দর চোখে মুখে একটা কষ্ট ফুটে উঠল। ত্রস্ত ব্যাকুল গলায় বলল ঃ প্রভু, আপনি অবুঝ হলে চলে ? এত একটা সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র। আপনাকে যে পৃথিবীর বড় প্রয়োজন। পৃথিবীর পাপী তাপীর একমাত্র আশ্রয় আপনি। মানুষের স্বার্থে ও কল্যাণে, এবং আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে

এটুকু কষ্ট আপনাকে মেনে নিতে হবে। জীবন মানেই জীবিত থাকার চেষ্টা।

যুদ্ধের ফাঁসীর আসামীর মত বেঁচে থাকাকে কেউ জীবন বলে?

দামোদর আকুল স্বরে বলল: জীবনে যা কিছু পাওয়া যাক না কেন, সব কিছুর জন্যে মূল্য ধরে দিতে হয়। কেউ রক্ত দেয়, কেউ অন্য কিছু।

এ ভাবে কোন কথাই চৈতন্য চিন্তা করতে পারছিল না। দুঃসহ বন্দীত্ব তাকে আকুল করে তুলল। বুকের মধ্যে তার ঝড় উঠল। বলল: যারা বেঁচে থাকাটা জীবনের পরমার্থ মনে করে তারা অনেক ভাবাভাবি করে, তাদের মনে নানা যুক্তিই আসে। এ সব নরম মানুষের জন্যে। কিন্তু আমি'ত আঘাত দেয়া এবং পাওয়ার জন্যে তৈরী করিনি নিজেকে। এবং মনে মনে প্রস্তুত হয়েই আছি। যা কিছু জীর্ণ, জরা তাকে ঝড়ের মত প্রবল ধাক্কায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিংবা ভেঙে ফেলতে হবে।

রামানন্দ প্রভুর মনের অলিগলি ভাল করেই চেনে। তাকে খুশি করার জন্যে বলল: প্রভু এই নিষ্ঠুর নির্মম প্রেমহীন পৃথিবীতে কারও বুকে যদি অন্য কারোর প্রতি একটু প্রেম থাকে তা আছে শুধু আপনার হৃদয়ে। তাই মনের মধ্যে যখন ঝড় উঠে, পরিবেশ, জীবন, জীবনযাত্রার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠি তখন যে আমরা আপনার অন্তরঙ্গেরা আপনার কাছে বসে শান্তি পাই। আপনিই আমাদের নতুন প্রাণ দেন। ফুরিয়ে যাওয়া আমাদের জীবনকে নতুন করে তোলেন।

রামানন্দর কথাগুলো তাকে ভাবাল। হঠাৎ বন্যার জলে ঘর ভেসে গেলে যেমন অসহায় লাগে, মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে ঠিক সেরকম একটা বিস্ময় বোধ চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখল। ভেতরে একটা গভীর অবসাদ বোধ হচ্ছিল। কি একটা হারানোর যন্ত্রণায় বুকটা টাটাচ্ছিল ভীষণ। নিস্তব্ধ রাতে কল্লোলিত সমুদ্রের জল ভাঙার অবিরাম শব্দ কানে আসছিল। সহসা মনে হল সমুদ্রের জল ভাঙার অবিরাম শব্দের সঙ্গে তার অন্তরের অজস্র কথা ও উদ্বেগ যেন মিশে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুকটা ভীষণ ভার ভার ঠেকল। অনেকক্ষণ পর বেশ মৃদু স্বরে বলল: রামানন্দ! রাজা প্রতাপরুদ্র বিপন্ন। একটা মানুষ আমার জন্যে পাগল, আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করল। তার এই উন্মাদনার কোন অর্থ হয় না। সামান্য মানুষ আমি। তার জন্যে কিছু করতে পারছি না। এই কষ্টটা কাঁটার মত বিঁধছে। শরণাগত রাজা প্রতাপরুদ্রের জন্যে আমার একটা বড় কিছু করতে

হবে। কিন্তু রুদ্ধ কক্ষে বসে থাকলে তা কেমন করে হবে? এই বদ্ধ কক্ষে আমার মন বসছে না।

অভিভূত আচ্ছন্ন গলায় রামানন্দ বলল: প্রভু আর কিছুদিন ধৈর্য ধরুন।

রামানন্দ, ধৈর্য আর মানছে না। সময়'ত অনন্ত নয়। আমার সমস্ত সত্তা মুক্তির জন্যে ছটফট করছে। তোমরা আমাকে আর আগলাতে পারবে না। দেখবে একদিন তোমাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে আমি উধাও হয়ে গেছি।

অন্ধকার আকাশে চাঁদ ছিল না। মহিষ কালো অন্ধকারে জল স্থল অন্তরীক্ষের সব বাস্তবতা হারিয়ে যেন অলৌকিক হয়ে উঠেছে। গুণ্ডিচা বাটী ভূত ভূত চেহারা পেয়েছে। চারদিকে এক গা ছম ছম পরিবেশ।

জগন্নাথ দাস একবার পিছন ফিরে তাকাল। ভাল করে চারদিকটা দেখল। তারপর ধীরে ধীরে প্রাচীরের বিশাল দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। থম থমানোর মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতা। হয়তো এই স্তব্ধতা আর অন্ধকারের জন্যেই। জগন্নাথ দাসের চোখে দস্যুদের নির্যাতন, অত্যাচারের ছবি ভেসে উঠে। শুধু ছবি ভাসে না, জিজ্ঞাসা জাগে। এই উৎকর্ণ, উৎকণ্ঠিত স্তব্ধ অন্ধকারে নিজেকে সে প্রশ্ন করে—সে কোথায় চলেছে? কেন? কার আকর্ষণে? ভিতরের একটা কৃতজ্ঞতা, একটা দুর্বলতা তাকে টেনে নিয়ে এল সেখানে। গুণ্ডিচার বাড়ীর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করল এখন তার মনে কিসের পালা? দুঃখ না সুখের, না অনুশোচনার, যন্ত্রণার। কোনটা? বোধ হয় কোনটাই নয় কোন একটা থাকলে সে এখানে আসত না। দুঃখ নেই, সুখও নেই, অনুশোচনাও নেই—এই অবস্থাকে কি বলে? জগন্নাথ দাস নিজের মনেই তার উত্তর দিল, বিবেকহীনতা। বিবেক গেলে মানুষের কিছুই থাকে না। কৃতজ্ঞতা এমন এক জিনিস যা অনেক সময় মনুষ্যত্ব ও বিবেক দিয়ে মেটাতে হয়। কৃতজ্ঞতা মহাজনের মত শুধু সুদ চায়।

হঠাৎ একটা গলার শব্দে থমকে দাঁড়াল জগন্নাথ। শব্দটা কোন দিক থেকে এল ঠিকমত ঠাহর করতে না পেরে সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে ও দুর্ভাবনায় দু'পা মাটিতে সেঁটে গেল। আবার শব্দ হল একটু

পরে। মনে হল গুণ্ডিচা বাটির দিক থেকে এল। গুণ্ডিচা বাটীর অভ্যন্তরে ঢোকার সাহস হল না। এবার একটা দরজা খোলার শব্দ হল। আলো হাতে একজনকে দেখা গেল। জগন্নাথ একটা ঝোপের ভেতর লুকোল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখল, লোকটির কোমরে একটা তলোয়ার ঝুলছে। চুমকী লাগানো পোষাক। বড় গোঁফ। লোকটিকে দেখেই চিনতে পারল। গোবিন্দ বিদ্যাধর।

জগন্নাথের গায়ের রোম সব সোজা হয়ে উঠল। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। এখন খুব দ্রুত ভাবনার সময়। অনেক ভাবনা।

গোবিন্দ বিদ্যাধর তাকে ভাবার সে সময় দিল না। অস্ফুটস্বরে ডাকল : ঝোপ থেকে বেরিয়ে এস জগন্নাথ। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। গুণ্ডিচাবাটী বিদ্যাধরের নিজের জায়গা। এখানে কোন ভয় নেই।

জগন্নাথ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। অবাক চোখে গোবিন্দ বিদ্যাধরকে প্রদীপের আলোয় দেখল। রহস্য গম্ভীর চোখের তারায় এক আশ্চর্য কৌতুক হাস্যের স্নিগ্ধতা। মনে হল, তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে বিদ্যাধর তাকে দেখছে।

গুণ্ডিচা বাটির অভ্যন্তরে তারা প্রবেশ করল। ঢুকতে ঢুকতে বিদ্যাধর চাপা গলায় ফিস ফিস করে জিগ্যেস করল : তোমাদের মহাপ্রভু নিজেকে এমন করে গুটিয়ে নিচ্ছেন কেন? তাঁর কি হয়েছে?

জগন্নাথের মনে হল তার পায়ের তলায় মাটি কেঁপে গেল। বিদ্যাধরের প্রশ্নে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা আর সন্দেহ। জগন্নাথ সতর্ক হল। আস্তে আস্তে বলল : প্রভু বলেন, পাণ্ডা পুরোহিতেরা উৎকলের মানুষকে ধর্ম ও আফিং খাইয়ে যত বুঁদ করে রাখবে, তত তাঁর সুবিধা। একমনে তাহলে একটু ঈশ্বর আরাধনা করতে পারবেন। এখন'ত সর্বক্ষণ তাঁর ভাবোন্মদনায় কাটে। একই দেহে মানুষ ভক্ত ও ভগবান হয়ে উঠে এই ভাব সাধনায় মগ্ন তিনি।

বিদ্যাধর জগন্নাথের উত্তরে সন্তুষ্ট হল না। মনে হল সে যেন কিছু গোপন করতে চাইছে। অথবা তার কাছে ধরা দিতে চাইছে না। তবু কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে বলল : তোমাদের প্রভু আর কি বলেন?

বলেন, যাদের আত্মা মুক্ত এবং শুদ্ধ তারাই সৎ লোক। তাদের আত্মাতেই ভগবান থাকেন। বিদ্যাধর একটু মুচকি হেসে বলল : তোমরা কখনও ভগবানকে দেখেছ?

না, তবে আমার চেতনার ভেতরে, আত্মার ভেতরে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করি।

গোবিন্দ বিদ্যাধরের ভারী মাংসল মুখে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। ধূর্ত চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল: মহাপ্রভুর ভক্তি তত্ত্বের ব্যাখ্যা শোনার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। আমার জন্যে তুমি কি খবর এনেছ বল। চুপ করে আছ কেন? মনে রেখ একদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে তোমার মত একজন সামান্য মানুষের জন্যে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে লড়াই করেছি। আজ আমার নিজের সঙ্গে লড়াই বেঁধেছে ঐ সন্ন্যাসীর। তুমি চুপ করে থাকবে? সন্ন্যাসী তোমাকে কি দিতে পারে? তার আছে কি? সে তোমার দারিদ্র্য ঘোচাতে পারবে না, ঐশ্বর্য দিতে পারবে না, ক্ষমতা গৌরব-কিছুই দিতে পারে না। কিন্তু আমি তোমাকে অনেক কিছু দিতে পারি। তুমি চাইলে মন্ত্রীত্ব পর্যন্ত। শুধু তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর।

জগন্নাথের বুকের ভেতর একটা তোলপাড় দেখা দিল। মাথার ভেতর ঝিম ঝিম করতে লাগল। ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল বিদ্যাধরের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তার একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। জোরে, সশব্দে। বলল: আমি গরীব, কিন্তু লোভী নই, আপনার প্রস্তাবে যদি রাজি না হই?

তা-হলে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। আর কোনদিন সূর্যোদয়ও দেখবে না।

জগন্নাথ অসহায় চোখে বিদ্যাধরের দিকে একটু তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল ঘৃণায়? ভয়ে? কুটবুদ্ধিতে? কে জানে? উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় কাঁপা গলায় বলল: আমি'ত আপনাকে বিভ্রান্তও করতে পারি।

গোবিন্দ বিদ্যাধর একটু হেসে মাথা নাড়ল। বলল: গোপন পথে সব খবর আমার কাছে পৌঁছয়। মিথ্যে বললে ধরা পড়ে যাবে। তখন তোমারই প্রাণ সংশয় হবে।

কিছুক্ষণ কথা না বলে জগন্নাথ দাস দুটি চোখ পেতে রাখল গোবিন্দ বিদ্যাধরের মুখের উপর। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে মনে মনে বলল: প্রভু এ তোমার নিয়তি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। একটা বিষণ্ণতায় সমস্ত মন তার আচ্ছন্ন হয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: বেশ আমি রাজি। কি করতে হবে বলুন।

আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দাও এখন। সামনে রথ। সন্ন্যাসী সপার্ষদ রথোৎসবে যোগদান করছে, এ কথা কি সত্য ?

হাঁ।

সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য ?

অসংখ্য অনুগামী মানুষদের নিয়ে তিনি পুরী মন্দির অভিযান করবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব অনুরাগী দর্শনার্থী আসছে তাদের মনে পাণ্ডা পুরোহিতদের প্রতি পুঞ্জীভূত আক্রোশ জমে আছে। এদের অত্যাচার জুলুম থেকে মানুষকে চিরতরে বাঁচানোর মহান সংকল্প নিয়ে অগণিত মানুষদের সঙ্গে পুরী মন্দিরে ঢুকবেন। কোন বাধাই মানবেন না।

বিদ্যাধরের অধরে ক্রুর হাসি। ভুরু কুঁচকে বলল : তবু সব কথা বললে না। আমার জন্যে কিছু রাখলে আবার। সন্ন্যাসীর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত, ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ মানুষ। তার বুদ্ধি, বিষয় ও কর্মপন্থায় এমন এক গভীরতা আছে যে বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না। বাইরে সে মৌন সন্নাসী। কিন্তু ভেতরে তার মন সর্বদা কর্মব্যস্ত। এসব তোমাদের জানার কথা নয়। হরিনামের ঘোরে আর মোহে তোমাদের বোধ-বুদ্ধি আচ্ছন্ন এবং লুপ্ত। তাই, ভেতরের ছদ্মবেশটা টের পাও না। কিন্তু এসব সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষুরধার পথে গোবিন্দ বিদ্যাধরের মেধা বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। সে যাই হোক সন্ন্যাসী আমার রাজনৈতিক প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছে। উৎকলের মত একটি দেশের ভাগ্য নির্মাণ মাঝে মাঝে যখন বিধাতার রহস্যময় খেয়ালে আমার হাতে এসে পড়ত তখন আমার সবটুকু সুবুদ্ধি দিয়ে তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাজনীতি এক কঠিন ব্যাপার। প্রতাপরুদ্র নিজের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা ঢাকতে হরিনামের নামাবলীতে মুখ ঢাকল। সুচতুর রাজা সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব, তেজ, অসাধারণ লোকরঞ্জন ক্ষমতা, বশীকরণ শক্তি, খ্যাতি, গৌরব এবং সন্ন্যাসকে রক্ষা কবচ করল। সন্ন্যাসী রাজার উদ্দেশ্য এবং ছলনা টের পেয়েছিল। তাই তার ব্যাকুলতা সত্ত্বেও তাকে কোনদিন দর্শন দেয় নি। আজ হঠাৎ অপদার্থ রাজা প্রতাপরুদ্রে প্রতি তার করুণা উথলে উঠল। তাতে আমার প্রত্যাশাই আঘাত পাচ্ছে। সন্ন্যাসীকে আটকাবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু এর পরিণাম যা দাঁড়াবে তা অনেকখানি রাজনৈতিক বাস্তব এবং লৌকিক দুঃস্বপ্ন। তোমাকে এত কথা বলার

প্রয়োজন ছিল না। গোটা ব্যাপারটা তোমার জানা থাকলে আর পাঁচজন জানতে পারবে। তাতে আমার প্রতি গভীর আস্থা জন্মাবে।

বিদ্যাধরের কথাগুলো জগন্নাথের মনকে নাড়া দিল। দুলিয়ে দিল ভীষণ। যে মানুষ এত আস্থা আর গভীর বিশ্বাস নিয়ে অকপটে নিজের বাসনার কথা বলতে পারে নিজের অধিকার দাবি করতে পারে তাকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি ছিল না তার। কিন্তু প্রত্যাখ্যান যে করবে তার পথও খোলা ছিল না। বিদ্যাধরের অবাধ্য হওয়া মানেই মৃত্যু। এক পিঠে তার চৈতন্যপ্রেম অন্য পিঠে বিদ্যাধরের জিঘাংসা। এই দুই দ্বন্দ্বে তার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল।

নিজের ভেতরের জিজ্ঞাসা নিয়ে জগন্নাথ বিদ্যাধরের চোখে চোখ রেখে চুপ করে রইল। তারপর একবার মরিয়ার হাসি হাসল। বলল: সবই প্রভুর ইচ্ছে।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গোটা নীলাচল হয়ে উঠেছে এক উৎসব মুখর নগরী। অগণিত মানুষ এসেছে দেশ-দেশান্তর থেকে। লোকে লোকারণ্য নীলাচল।

রথ যাত্রার দিন রাজা প্রতাপরুদ্র স্বহস্তে স্বর্ণ সমার্জনী দিয়ে পথ পরিস্কার করছে। তারপর চন্দনচর্চিত করে তুলল সমস্ত মহাপথ। মহাপ্রভু স্থির দৃষ্টিতে রাজার প্রতিটি কার্য পর্যবেক্ষণ করে পঞ্চ সখার অন্যতম বলরামকে বলল: যথার্থ যোগ্য রাজা। সাধারণ মানুষের কাজও সুচারু রূপে করার অসাধারণ ক্ষমতা এর আছে।

উৎসাহী কৌতূহলী জনতা এবং অনুগামীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সে বিস্ময়। চৈতন্য মুখনিঃসৃতবাণী জনতার প্রাণে খুশির হিল্লোল তুলল। অত্যুৎসাহী জনতা চৈতন্যকে খুশি করতে রাজা প্রতাপরুদ্রের জয়ধ্বনি দিল। সেই জয়ধ্বনি সমুদ্র কল্লোলবৎ ছড়িয়ে পড়ল গোটা প্রাঙ্গণে।

চৈতন্যের অধরে বিজয়ীর হাসি। ঝকঝকে দুই চোখে আনন্দের দ্যুতি। মুখে মুগ্ধতা। প্রতাপরুদ্রের জয়ধ্বনি জগন্নাথের জয়ধ্বনির সঙ্গে মস্তিষ্কের ভেতর একটি স্ফুরিত ঝংকার হয়ে বেজে যাচ্ছিল। এক উত্তেজিত আচ্ছন্ন চেতনায় তাকে অভিভূত করল। কেমন একটা খুশী আর গৌরববোধ মনে জাগল।

বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্রার নামে আলাদা আলাদা জয়ধ্বনি করে জনতা রথের দড়ি ধরে টান দিল। রথ এগিয়ে চলল। রথের সম্মুখে পঞ্চ সখার

পাঁচ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদল, আর দুই পাশে শান্তিপুর কুলীন গ্রাম থেকে আগত দলের সম্মিলিত সংকীর্তনে সমস্ত আকাশ বাতাস মুখরিত হল। সমস্ত জনতার সম্মিলিত আকর্ষণে জগন্নাথের রথ সচল হয়ে কখনও জোরে, কখনও মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল। জনতা, পিছনে জগন্নাথ এবং রাজার জয়ধ্বনি দিতে দিতে গুণ্ডিচা বাটীর দিকে এগিয়ে চলল।

গদাধরের কীর্ত্তনে মন ছিল না। সে ভীড়ের ভেতর এবং কীর্ত্তন দলের ভেতর জগন্নাথকে কোথাও দেখতে পেল না। গদাধরের খুব আশ্চর্য লাগল। মনের কোণে একটা সন্দেহ দোলা লাগল। বেশ কিছুদিন ধরে জগন্নাথের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। আগের মত স্বতস্ফুর্ত্ত নয় সে। কেমন একটা সংকুচিত বিপন্ন ভাব তাকে সর্বদা অন্যমনস্ক করে রাখত। একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেলে মানুষ যেমন অত্যন্ত অসহায় এবং হতভম্ব হয়ে পড়ে অনেকটা সেইরকম একটা ভাব ছিল তার।

সংকীর্তন যাত্রা চলেছে উদ্দাম গতিতে উদাত্ত ধ্বনিতে। নীলাচলের সমগ্র মানব সমাজকে শ্রীচৈতন্য যেন নিয়ে চলেছে এক মহামুক্তির পথে। রাজা প্রতাপরুদ্রও চলেছে চৈতন্যের পাশে পাশে। জীবনের আজ কোথাও কোন বিরোধ নেই। মানুষে মানুষে নেই কোন প্রভেদ। সকলে সমান। অনির্বচনীয় এক তৃপ্তি সুখের উল্লাস রাজাকে অধীর করে তুলেছে। নিজেকে নিবেদন করার এক ব্যাকুলতা ফুটে উঠল তার উল্লাসে, আনন্দে, অস্থিরতায়। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল: প্রেমের ঠাকুর তোমার মতই যেন মানুষ সব ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে। কোথায় চলেছে, কেন যাচ্ছে, তা ভাববার অবকাশ নই। নীলাচল যেন আজ অভিসারিকা রাধা। কি ভাল যে লাগছে।

শ্রীচৈতন্য গাঢ়স্বরে বলল: এ আপনার অভিষেকের শুভেচ্ছা। দীপ জ্বালিয়ে বরণ করার তর সয়নি তাদের। মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসা আর শুভেচ্ছা পুণ্যের আলোর মত আপনার জীবনের উপর ঝরে পড়ছে।

প্রতাপরুদ্রের সুন্দর মুখ কেমন শান্ত আর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত কমনীয়। চৈতন্যের স্বপ্নালু চোখের উপর চোখ রেখে বলল: লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের মত উল্লাসে উচ্ছাসে মানুষ চলেছে ছাখ ওদের প্রাণে কোন ভয় নেই। ওরা ঝর্ণার মত উচ্ছল, বায়ুর মত চঞ্চল, আকাশের মত মুক্ত। কি দারুণ উল্লাসে

জয়ধ্বনি দিচ্ছে আর হরিনাম করছে, দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। একই সঙ্গে আমি দর্শন করছি অচল আর সচল ব্রহ্ম। আমার জন্ম সার্থক হয়েছে। জীবন ধন্য হয়ে গেছে আপনার কৃপায়।

সংকীর্তন যাত্রা এগিয়ে চলল গুণ্ডিচা বাটীর দিকে। ক্রমেই পথের দূরত্ব কমে সমাপ্ত হল পরিক্রমা।

গুণ্ডিচা বাটীতে চৈতন্য টের পেল পঞ্চ সখার মধ্যমণি জগন্নাথ শুধু নেই। কিন্তু তার পুরো দলটি আছে। এর অর্থ কি? কোথা গেল তার প্রাণ সখা? তবে কি? ভাবতে তার ভীষণ কষ্ট হল। বুক ফেটে গেল। তবু মনে হল, এই অনুপস্থিত খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তার সমস্ত চিন্তার ভেতর, মস্তিষ্কের ভেতর জগন্নাথের চিন্তাটা ঢুকল। কিন্তু ভাল লাগল না। সর্বান্তঃকরণে যাকে চেয়েছিল দলের মধ্যে, তার অনুপস্থিতিটা সমস্ত শিরায় উপশিরায় ঝংকারে বাজতে লাগল। সখার পরিনামের কথা ভেবে বার বার শিউরে উঠল।

সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় কাটল।

দু'দিন পর লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল: জগন্নাথ দাস গুণ্ডিচা বাটীতে আটক আছে। চৈতন্যের কানেও সে খবর পৌঁছল। কথাটা শোনা থেকে তার উদ্বেগ, দুর্ভাবনার অন্ত নেই। কে বা কারা একজন নিরীহ ধর্মপ্রাণ চৈতন্যভক্তকে আটক করল কেন, কিছুই বোঝা গেল না। এখন জগন্নাথ দাস গুণ্ডিচাবাটিতে সত্যিই আটক কিনা, এই সংবাদটা নেয়া জরুরী হল।

ঠিক সেই সময় রামানন্দ অকস্মাৎ গম্ভীরায় পদার্পণ করল। এবং নিভৃতে প্রভুর সঙ্গে একাকী মিলিত হয়ে নিবেদন করল: প্রভু, শ্রীক্ষেত্রের অবস্থা খুব ভাল নয়। বাইরে থেকে ভেতরে কোথায় কি ঘটছে কেউ টের পাচ্ছে না। লোক চক্ষুর অন্তরালে সুচতুর বিদ্যাধর তার চক্রান্তের জাল ধীরে ধীরে গুটিয়ে তোলার জন্য রথের সময়টা বেছে নিয়েছে। এই সময়টা সব দিক দিয়ে অনুকূল এবং উপযুক্ত সময়। এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে।

দুই চোখে আগ্রহের দীপ জ্বালিয়ে চৈতন্য অশান্ত চিত্তে প্রশ্ন করল: তুমি বলছ কি রামানন্দ? এখন যে চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য।

রামানন্দ একটু হাসল। বলল: এটাই সব চেয়ে উপযুক্ত সময়। বাহিরাগত দর্শক পর্যটক তীর্থযাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং শান্তি শৃংখলা অটুট রাখার জন্যে বিপুল পরিমাণে নগর রক্ষীবাহিনী এবং সৈন্যবাহিনী নামানো হয় প্রতিবছর। কিন্তু এবছর নগরের শান্তি শৃংখলা রক্ষার সব দায়িত্ব নিয়েছে সৈন্যবাহিনী। সর্বত্র প্রচুর অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যের সমাবেশ হয়েছে। গোটা শ্রীক্ষেত্রেই সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। লোকে ভাবছে কড়া নিরাপত্তার জন্যেই এত সৈন্য মোতায়েন হয়েছে। কিন্তু আদৌ তা নয়। নেপথ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের এ এক নিঃশব্দ নাটক। রথের ব্যস্ততার ভেতর সে দৃশ্য কারো নজরে এল না। স্বয়ং রাজাও জানতে পারল না। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে রাজগৃহ সৈন্যসজ্জিত করে সুরক্ষিত করা হয়েছে। রাজার বাইরে বেরোনোর সব পথ বন্ধ হয়েছে। কার্যতঃ রাজা এখন নজরবন্দী।

চৈতন্যের দুই চোখে কষ্ট ফুটে উঠল। বলল: রামানন্দ, মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয় কি করে? কিছুদিন আগে রাজা প্রতাপরুদ্র তার বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করে হৃদয় পরিবর্তনের সুযোগ দিল। তাকে আরো বেশি বিশ্বাসভাজন করে তোলার জন্যে অনেক বেশি দায়িত্ব দিল। সে কথা ভুলে গেল কেমন করে?

প্রভু বিদ্যাধর বুঝেছিল রাজা দুর্বল, অসহায়। বাধ্য হয়েই তাকে ক্ষমা করেছে। তাই রাজাকে আর গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। তার একমাত্র ভয় এবং বাধা আপনি। রাজা প্রতাপরুদ্রের হাত থেকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণের আগে সে আপনার সঙ্গে বোঝাবুঝিটা সেরে ফেলতে চায়। জগন্নাথ দাসকে ... করে কার্যতঃ সে আপনাকে ফাঁদে ফেলতে চায়। ওর ফন্দীতে কখনও ... বেন না প্রভু। ওর উদ্দেশ্য ভাল নয়। ওর উচ্চাকাংখার পথে কাঁটা আপনি। ও তাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাইছে।

চৈতন্য দু'চোখের নীরব চাহনি মেলে রামানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতর তার জ্বলে যাচ্ছিল। নিজের যন্ত্রণাকে, দুঃখকে প্রকাশ করার ভাষা ছিল না তার। কেমন যেন একটা বুকচাপা কান্না এল। আস্তে আস্তে বলল: রামানন্দ তুমি কি বলছ? আমার সবচেয়ে দুই প্রিয়জন

আজ বিপন্ন। অসহায়। আমার জন্যেই'ত তারা বিদ্যাধরের চক্রান্তের খপ্পরে পড়েছে। তাদের বিপদে, দুর্দ্দিনে আমি কি গম্ভীরায় থাকতে পারি? যত বড় বিপদ আসুক, আমাকে যেতেই হবে।

প্রভু!

রামানন্দ অবুঝ হয়ো না। আজ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের দ্বন্দ্ব বেধেছে। আমি সন্ন্যাসী। আমার হারানোর যেমন কিছু নেই, তেমনি লাভেরও কিছু নেই। আমি কেন ভয় করব বিদ্যাধরকে? সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার কোন লড়াই থাকা উচিত নয়। তবু যদি আমাকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে থাকে, তবে যোদ্ধার সাজেই যাব তার কাছে।

প্রভু ওরা আপনাকে হত্যা করবে।

রামানন্দ তুমি বাধা দিও না। কীর্ত্তনের আয়োজন কর। হর পঞ্চমীর দিন অভিমানিনী লক্ষ্মী জগন্নাথের গোঁসা ভাঙ্গাতে যাবেন গুণ্ডিচায়। ঐ দিনেও লোক সমাগম হয় প্রচুর। নাম কীর্ত্তনে তারাও সঙ্গী হবে। বিপুল জনতা নিয়ে আমিও যাব আর এক জগন্নাথের কাছে। বিদ্যাধরের সাধ্য কি আমার জগন্নাথকে লুকিয়ে রাখে?

সিংহদ্বারে হর পঞ্চমীর আয়োজন সমাপ্ত। লক্ষ্মীকে নিয়ে পূজারী এবং পাণ্ডারা গুণ্ডিচা বাটীর উদ্দেশ্যে রওনা হল।

জনতা বিপুল হর্ষে জগন্নাথ এবং লক্ষ্মীর জয়ধ্বনি দিল। এবং পিছন পিছন তারা অনুগমন করল।

তখন অপরাহ্ণ।

গম্ভীরা থেকে চৈতন্যও এসেছেন সদলবলে উৎসবে যোগ দিতে।

বিরাট জনতা তার অনুগমন করল। মুখে তার হরি হরি বোল। সমস্ত জনপথ মুখর হয়ে উঠল নাম গানে। জনতার প্রাণে হরিনামের জোয়ার এসে লাগল। প্রতিমুহূর্ত্ত তাদের মনে হতে লাগল একটা কি পরমাশ্চর্য যেন এসে পড়ল তাদের জীবনে। জনতার মন আলোড়িত হয়ে উঠল। অনাগত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাদের চেতনার ভেতর যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগল।

রাস্তা দিয়ে জনস্রোত বয়ে চলেছে। প্রত্যেকেই তার সামনের লোকটিকে দেখেই ছুটল সেইদিকে। চৈতন্যের অনুগমন করতে পারা এবং তার সঙ্গী হওয়া ভাগ্যের কথা। চন্দন পুকুরের কাছে একটু দাঁড়াল চৈতন্য। অমনি তাকে ঘিরে ধরল বিশাল জনতা। কে কি করবে, আর করবে না তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল পরিকরদের।

বিশাল জনতার অনেকে তাকে ভাল করে দেখতে পেল না। হাজার হাজার মানুষের কলরবের ভেতর ভাল করে অনেকে শুনতে পেল না তার নির্দ্দেশ। কথা শেষ হওয়ার পরই শ্রীচৈতন্য ছুটল মন্দিরের দিকে। জনতা তার পিছনে দৌড়তে লাগল। বুকের রক্তের কলধ্বনিতে বাজতে লাগল তার মধুর গীত "জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে"।

তীব্র একটা আবেগে চৈতন্যের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। মনে হল সে যেন একটা ভুবনজোড়া আলোর রাজ্যে এসে পড়েছে। তার সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল এক বিহ্বল স্বপ্ন।

মনে হল চৈতন্য যেন জনতা, জনতা যেন চৈতন্য হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় প্রহর।

বিরাট জলোচ্ছ্বাসের মত জনতা ভেঙে পড়ল গুণ্ডিচা বাটিতে। জনতার আগে আগে চলল চৈতন্য। দামোদর গদাধর তার সঙ্গ ছাড়েনি কখনও। পিছিয়েও পড়েনি। ছায়ার মত লেপ্টে ছিল সর্বক্ষণ। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোরে খুব দ্রুত পা ফেলে তারা মন্দিরের ধাপগুলো ভেঙে উপরে উঠছিল।—বিনম্র আত্মনিবেদনের সকরুণ ব্যাকুলতা জাগল তাদের কণ্ঠে : জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে' মন্ত্রস্বরের মত মন্দিরের চত্বরে চত্বরে জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল সেই গীত।

স্তব্ধ অপরাহ্ণ।

দিক্‌দিগন্তে বাতাসের মর্মরে, মন্দিরের দেয়াল গাত্রে গাত্রে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল প্রভু চৈতন্যের মধু নিঃষ্যন্দী কণ্ঠের সেই সকরুণ ব্যাকুল আর্তি। সমস্ত পরিবেশটা কেমন অলৌকিক হয়ে উঠল। জনতার পদভারে দুলে উঠল গুণ্ডিচার বিশাল মন্দিরটা।

মহৎ একটা আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে চৈতন্য জনতার আগেই মন্দিরে ঢুকল।

শূন্যগর্ভ মন্দির আলোড়িত হয়ে উঠল তার মধুস্রাবী সুরেলা কণ্ঠ : জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী। চৈতন্যের পিছনে বাঁধ ভাঙা জল স্রোতের মত বিরাট জনতা দল ছুটে এল। দ্বারী খুব দ্রুততার সঙ্গেই দ্বার বন্ধ করে দিল।

জনতা বন্ধ দরজার উপর আছড়ে পড়ল। হাজার কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে লাগল : দ্বার খোল। দ্বার খোল।

নির্ভিক বীর সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সব জেনেই বিদ্যাধরের ফাঁদে পা দিল। বিপুল আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে সে এল বিক্ষুব্ধের ক্ষমা করতে। তাদের বুকে প্রেম জাগাতে। তাকে ভালবাসতে। তাকে জয় করতে।

কিন্তু সে সুযোগ দিল না চক্রান্তকারীরা। তারা প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রবেশ করা মাত্রই মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হল। সঙ্গে ছিল শুধু গদাধর। মন্দিরের অভ্যন্তরে ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হিংস্র একটা দৈত্যের মত গদাধরকে কে যেন ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল। মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারল না। চৈতন্য অন্ধকারে কিছু বুঝে উঠার আগেই আচম্বিতে অন্ধকারে কে যেন প্রহারে প্রহারে তাকে জর্জরিত করে ফেলল। সেই নিদারুণ প্রহারে তার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল চৈতন্যের চোখে।

মর্মান্তিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলল : তোমরা আমাকে মারছ কেন?

তীব্র যন্ত্রণা শরীরের ভেতর পাক খেয়ে খেয়ে উঠল। নিদারুণ যন্ত্রণায় টন টন করতে করতে লাগল ভেতরটা। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হল তার গোটা শরীর। তবু ক্ষত বিক্ষত দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে কখনও বা মেঝের উপর পাক খেয়ে খেয়ে জগন্নাথের বেদীটাকে দু'হাতে পরম আবেগে আকড়ে ধরল। সমস্ত দেহটা তার টান টান হয়ে গেল। এবং যন্ত্রণা মথিত ক্লান্ত স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল : জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী—

কে একজন দীপ ধরে দেখল। এত অত্যাচারের পরেও প্রশান্ত আর নিরুদ্বেগ তার মুখাবয়ব।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে একজন অন্ধকারের মধ্যে ব্যঙ্গ করে বলল : বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলিস—

আর একজন ব্যঙ্গ করে বলল : সচল জগন্নাথের হাত পা'ত সবই আছে,

তবু নিজেকে রক্ষে করতে পারছ কৈ? কোথায় গেল তোমার ঐশী ক্ষমতা? ভূমিকম্প, দুর্যোগ, কিছুই হল না? নিজেকে রক্ষা করার শক্তি পর্যন্ত তোমার নেই।

বেদীর খুব কাছে একজন রাজপুরুষ তার কোমরবন্ধে আবদ্ধ দীর্ঘ অসির স্বর্ণমণ্ডিত হাতল মুষ্টিতে ধরে তীব্র উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করল। রাজপুরুষ হল গোবিন্দ বিদ্যাধর। ঘৃণায় জ্বলতে জ্বলতে বলল: সন্ন্যাসী হলে কি হবে? সুদর্শন চেহারা আর বিনয় ব্যবহার দিয়ে লোককে যাদু করেছ। অনেক গভীর জলের মাছ তুমি, জালে টেনে তোলা তোমায় কঠিন: এইবার বাছা জব্দ। সন্ন্যাসী হয়ে রাজনীতি করতে যাওয়া বিড়াবনা ছ্যাখ।

পরিছা আবার বেত্রাঘাত সুরু করল। খুব ভারী আর অচল অনড়, শবদেহের মত পড়ে থাকা দেহে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু ভেতরটা ঠিকই তার অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল। আর একটু একটু করে অতল এক অন্ধকারের মত তলিয়ে যাচ্ছিল তার চেতনা। সম্পূর্ণ অবলুপ্তির ঘটার আগে একবার চোখ খুলে চতুর্দ্দিকে কাকে খুঁজল। দেখল, একটা অতি পরিচিত মুখ, তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে। তার নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা দেখছে। চোখ টান টান করে তার দিকে তাকিয়ে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল: জগন্নাথ* তুমি?

---

* শ্রী জগন্নাথ কলেবর। একাত্মা একাঙ্গ শরীর।
সমস্তে এমন্ত দেখন্তি। মায়া শরীর ন জাণন্তি॥
শ্রী জগন্নাথ আজ্ঞা পাই'। অন্তর্ক্ষে নেলে শব বহি।
গঙ্গারে মেলি দেলে শব। সে শব হোইনা:ক জীব॥

চৈঃ ভাঃ ঈশ্বর দাস

সমকালের উড়িয়া কবি ঈশ্বর দাস বলেছেন জগন্নাথের সামনেই চৈতন্য দেহ পড়েছিল। তখন জগন্নাথের আজ্ঞায় শবদেহ কাঁধে করে বহন করে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেয়া হল। এই পংক্তিটি খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। বিগ্রহ জগন্নাথের সামনে চৈতন্যের দেহ পড়ে থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কোন জগন্নাথের আজ্ঞায় শবদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হল? এই জগন্নাথ'ত বিগ্রহ নয়, মানুষ। তা-হলে কে সে? এই প্রশ্ন সূত্রে পঞ্চ সখার অন্যতম জগন্নাথের নামটা মনে পড়ে যায়।

অধরে বিচিত্র হাসি চৈতন্যের। আশ্চর্য, সেই শান্ত মুখ, স্মিত হাসি। দুচোখে সুদূর, স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। সে যেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের সেই সিংহদ্বার অতিক্রম করে অনন্ত সেই আনন্দলোকে যাত্রার উল্লাসে বিভোর হয়ে আছে। খুব থেমে থেমে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল: জগন্নাথ, বন্ধু আমার, প্রিয় আমার অমন করে চোখের জল ফেলতে নেই। তোমার কোন দোষ নেই। আমি অপরাধী। আমি মানুষকে ভালবেসে ছিলাম, আমি মানুষের শুভ কামনা করেছিলাম, আমি চেয়েছিলাম মানুষ সুখী হোক, মানুষের মঙ্গল হোক। হিন্দুধর্ম সুন্দর হোক। কিন্তু আজ টের পেলাম মানুষকে বিশ্বাস করা, ভালবাসার শুভ কামনা করা পাপ। ধর্মকে সুন্দর করা অপরাধ। ঐ চক্রান্তকারী রাজপুরুষ আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল সত্যবাদিতা পাপ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে বিদ্রোহ করা পাগলামি। মানুষকে দায় করা নির্বুদ্ধিতা; ভালবাসা পাপ। আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। তাই আমার কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, অনুশোচনাও নেই। বড় বিশ্বাস করে মন্দিরে ঢুকেছিলাম। এবার পাশার দান আমার উল্টে গেছে। কথাগুলো গভীর মমতায় কেমন কোমল।

কথা তার জড়িয়ে গেল। একটু একটু করে তার বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে। চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছে। চোখে ঘুম নামছে। চারদিক থেকে গড়িয়ে আসছে একটা ঘন অন্ধকার। চৈতন্যের সমস্ত চেতনা, অস্তিত্ব অবশেষে হারিয়ে গেল এক রহস্যময় চির অন্ধকার রাজ্যে।

অকস্মাৎ মন্দিরের অভ্যন্তরটা শব্দহীন হয়ে গেল।

চৈতন্যের প্রাণহীন শরীরটা টান টান হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

মুখ খোলা।

ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁতের সারি। উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁকে এক বিচিত্র কৌতুক যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

বিদ্যাধর কেমন একটু চমকে উঠল। হঠাৎ একটু দিশেহারা বোধ করে চুপ করে থাকল। মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল এখন তার কর্তব্য কি? দু'দুটো শব মন্দিরের বাইরে হাজার হাজার মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে? কোথায়?

বাইরে উত্তেজিত জনতার কোলাহল। অপরাহ্ণের আলো মুছে সন্ধ্যা নামল। তবু জনতার আগমনের বিরাম নেই। প্রতীক্ষার ক্লান্তি নেই। সময় যত দীর্ঘ হতে লাগল ততই ভীড় বাড়তে লাগল।

বিদ্যাধরের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

চতুর্দিকে জনতা তাদের ঘিরে আছে।

সময় দীর্ঘ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতাও অধৈর্য হয়ে পড়ল। তাদের সন্দেহ তীব্র হল। সংশয় মারাত্মক আকার ধারণ করল। ঘন ঘন করাঘাত হতে লাগল দ্বারে। জনতার তীব্র আক্রোশ যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল মন্দিরে। বাইরে তাদের দাবিতে চিৎকারে।

মন্দিরের ভেতর তখন চলেছে জোর পরামর্শ।

সন্ন্যাসী এবং তার সঙ্গীর মৃতদেহ কোথায় কেমন করে লুকোলে সব কুল রক্ষা পায় তাই নিয়ে চলল এক সতর্ক পরিকল্পনা। ব্যাপারটা যে এতখানি জটিল হয়ে উঠবে চক্রান্তকারীরা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

সময়ের গতি তখন নিরন্তর, অবাধ্য।

থম থমানো স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতা। এই উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত বিপদের স্তব্ধ অন্ধকারে নিরন্তর জিজ্ঞাসা জাগে অতঃ কিম?

প্রধান পাণ্ডা সূর্যকান্তর নিচু গম্ভীর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল অন্ধকারে। বলল: গুপ্ত পথ দিয়ে মন্দিরে লাশ সরানোর পথও বন্ধ। সেখানে, অগণিত জনতার ভীড়। সন্ধ্যারতির সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দর্শনার্থীদের কৌতূহল ধৈর্য মানছে না। আর বেশিক্ষণ দ্বার রুদ্ধ করা যাবে না। আপাতত মন্দিরের কোন একটি কক্ষে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে।

বিদ্যাধর মাথা নাড়ে। হঠাৎ ভয় পাওয়া মানুষের মত একটা অসহায় কষ্টকর অবস্থা তার। কিন্তু তার সচেতন অনুভূতি সূর্যকান্তকে সাবধান করল। বলল: দ্বার খুললে বেনো জলের মত মন্দির ছাপিয়ে যাবে জনতায়। তখন তাদের কি জবাব দেবে? কি বোঝাবে? উন্মত্ত জনতা কোন নিয়ন্ত্রণ মানবে না। ঘর দোর ভেঙে তছনছ করেও তারা খুঁজে বার করবে ঠিক। তখন নিজেদের রক্ষা করার কোন পথ খোলা থাকবে না।

শ্মশানের স্তব্ধতা নামে কক্ষে। সকলের শ্বাস পতনের শব্দ শোনা যায় বাইরে।

উৎকণ্ঠিত জনতার ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা যায়।

বিদ্যাধরের মস্তিষ্কে তখন নানা চিন্তা ও জিজ্ঞাসার ভীড়। কিছুই স্থির করতে পারে না।

জগন্নাথ দাসের মস্তিষ্ক হঠাৎ ঝলকে ওঠে একটা জিজ্ঞাসা মিশ্রিত সমাধান: গুপ্ত পথ দিয়ে যদি তাদের সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া যায়, তাহলে কেমন হয়?

সূর্যকান্ত বলল: একটা কাঁচা কাজ হবে। সমুদ্রে কিছুই ভেসে যায় না, সব তীরে ফিরে আসে। তাছাড়া সেখানে যাব কেমন করে? প্রতাপ-রুদ্রের রক্ষীরা হয়ত এতক্ষণ সে পথ পাহারা দিচ্ছে।

সকলের অবস্থা তখন এক অসহায় অভিসম্পাতের মত মনে হতে লাগল। নিশ্চিত মৃত্যুভয়ে আতঙ্কে তারা আড়ষ্ট। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসনার দাহ, লোভের ধিক্কার প্রবল হয়ে উঠে। আত্মানুশোচনা তীব্র হয়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মন্দিরের অন্ধকার নিরেট, বোবা। কার্নিশে পায়রার পাখা ঝাপটার শব্দ শোনা যায়।

বাইরে শোনা গেল জনতার আর্তনাদ, চিৎকার ছুটোছুটি হুড়োহুড়ির শব্দ।

বিদ্যাধরের স্বস্তির শ্বাস পড়ল। বলল: ঐ শোন। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে সৈন্যবাহিনীর তাণ্ডব। চতুর্দিকে তারা এখন ভয় আর আতংক সৃষ্টি করছে। তবু তার চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ। একটা অস্বস্তির ভাব বেশি।

সূর্যকান্ত বিদ্যাধরের মুখের দিকে তাকায়। চোখে সন্দেহ, অনুসন্ধিৎসা উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় তার বুকের ভেতরটা টনটন করছিল। ভয়ার্ত স্বরে বলল: মনে হচ্ছে প্রাণভয়ে ভীত জনতা মন্দিরেই আশ্রয় নিচ্ছে, তাই বাইরে এত উত্তেজনা।

বিদ্যাধর চুপ করে থাকে। ধর্মস্থানে সৈন্য ঢোকার নিয়ম নেই। তাই

বিদ্যাধরের মুখে আতঙ্কের ছায়া নামল। চোখের চাহনিতে নিরুপায় অসহায়তা। তবু গোবিন্দ বিদ্যাধর নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছিল। নিজেকে শক্ত করছিল। নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল সেই ক্ষুরধার বুদ্ধি ও দৃপ্ততাকে।

জগন্নাথ মাথা নিচু করে অপরাধীর মত একভাবে দাঁড়িয়েছিল। তীব্র অপরাধবোধের যন্ত্রণা তার সত্তার ভেতর, মস্তিষ্কের ভেতর বিষের মত ক্রিয়াশীল। তার সমস্ত মন জুড়ে অপরাধবোধের যন্ত্রণা। নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারছিল না। চৈতন্য তাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু সে তার মূল্য দিতে পারেনি। নিজের উপর একটা তীব্র ঘৃণা হল। কেমন একটা ঘোর লাগা অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে চৈতন্যের শবদেহের দিকে চেয়ে বলল: প্রভু, তোমার বড় সাধ ছিল জগন্নাথের পায়ে মাথা রেখে মরবার। দারুব্রহ্ম বোধহয় এভাবেই তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করল। কিন্তু তোমার সমাধির উপর জগন্নাথের বিগ্রহ স্থাপন করে মন্দির নির্মাণের ভার আমায় দিয়েছিলে তা বোধ হয় রক্ষা করা গেল না। কিন্তু আমি কি করব বল? তুমি বলে দাও। অন্তর্যামী তুমি। বলতে বলতে সে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল তার শবদেহের উপর।

বিদ্যাধরের নিস্প্রভ বিষণ্ণ কৃষ্ণতারা দুটি যেন ঝিক করে হেসে উঠল। শ্বাসের সঙ্গে তার উৎকণ্ঠা ভয় সব বেরিয়ে গেল। বলল: জগন্নাথ! তোমার প্রভুর মনে যে বাসনা জেগেছিল সেটাও ত ঈশ্বরের ইচ্ছায়। আর সে ইচ্ছা পূর্ণ করলে আমরাও পরিত্রাণের পথ পেয়ে যাব। সাধুর অভিলাষ পূর্ণ হবে, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। সব বিপদ কেটে যাবে।

অন্ধকারের মধ্যে সহসা আলো দেখতে পেল সকলে। কিন্তু সংস্কার সহজে যায় না। সূর্যকান্ত একটু আপত্তি করল। বলল: বিগ্রহের বেদীর নিচে শবদেহ লুকিয়ে রাখা সবচেয়ে নিরাপদ।* কিন্তু হিন্দুর ধর্ম বিশ্বাস

---

*মন্দিরের মধ্যেই দেববিগ্রহের প্রকোষ্ঠ—সংলগ্ন বৃহৎ মণ্ডপের এক কোণে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়।...বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত তাঁহার সমাধিকার্যে ব্যাপৃত হয়, তৎপরে সেই মণ্ডপের পাথরগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সমাধির

সংস্কার তাতে রক্ষা পায় না। বড় অশাস্ত্রীয় কর্ম।

বিদ্যাধরের বুদ্ধি তুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। তৎক্ষণাৎ মৃদু হেসে বলল: সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। দেবতা নিজেই তাঁর একটি সাধ পূর্ণ করলেন। যা ছিল অসম্ভব তাই হয়ে গেল বাস্তব। এর চেয়ে বিস্ময় আর কিছু হয়? শেষ ইচ্ছাটা এইভাবে পূর্ণ হোক এও জগন্নাথের ইচ্ছা। জগন্নাথ দাসের মুখ দিয়ে দারু ব্রহ্ম তাঁর ইচ্ছের কথাটা আমাদের শোনাল।

তবু হয় না।

কেন হবে না? ভারতবর্ষের সাধু সন্তদের সমাধির উপর মন্দির করে নিত্য পূজাদি হয়। মহাপ্রভুর স্বাভাবিক মৃত্যু তাতে'ত মন্দিরের পবিত্রতা হানি হয় না। চৈতন্যের সাধ পূর্ণ করতে হয়ত রাজা প্রতাপরুদ্রও তার সমাধির উপর আর একটা জগন্নাথ মন্দির তৈরী করত এবং অনুগামী ভক্তবর সে সমাধি মন্দিরকে চোখের মণির মত রক্ষা করত। শ্রদ্ধা প্রীতি অর্ঘ্য নিয়ে এমনিতে তিনি সচল জগন্নাথ হয়ে আছেন। আত্মরক্ষার জন্যে এটুকু করা কোন অপরাধ নয়।

সূর্যকান্ত বলল: লাশ লুকিয়ে ফেললে কি সব সমাধান হয়ে যাবে? অপেক্ষামান জনতা যখন জানতে চাইবে, কোথায় তাদের মহাপ্রভু? তখন কি জবাব দেব?

বলব, জগন্নাথের সচল বিগ্রহকে জগন্নাথ আত্মসাৎ করেছেন। জগন্নাথের অঙ্গে সচল জগন্নাথ বিলীন হয়ে গেছেন। ভক্তরা একথা অস্বীকার করতে পারবে না। এতে মহাপ্রভুর উপর দেবত্ব ভক্তদের চোখে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। শোকার্ত ভক্তেরা আর কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। কেবল

চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। যাঁহারা সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন—তাঁহারা তিরোধান বেলা ৩টায় হইয়াছিল। এরূপ লিখিয়াছিলেন (জয়ানন্দ); কিন্তু আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় যে তিনি আর ইহলোকে নাই। (লোচন দাস)

২) They buried him somewhere under the floor of the temple and would not allow any ontsider to enter it until them Place was thoroughly repaired and no trace left after his burial.—Chaitanya and his age···Dr Dinesh ch sen.

বিশ্বাসের জন্যে চৈতন্যের উত্তরীয় দারু ব্রহ্মের অঙ্গে শোভা পাবে।' ব্যস!

সব ঠিক আছে সেনাপতি। কিন্তু মানুষের কৌতূহল বড় দুরন্ত। তাকে ঠেকাবেন কি করে? একদিন যে বেদী ভেঙে তার দেহ এবং সত্য উদ্ঘাটন করা হবে না, কে বলতে পারে?

ভবিষ্যতে যদি কেউ চৈতন্যের নাম উচ্চারণ করে তা হলে কোতল করা হবে। সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এখন আমার নিয়ন্ত্রণে। সর্বত্র এমন এক আতঙ্ক সৃষ্টি করব যাতে কেউ চৈতন্য সম্পর্কে কোন খোঁজ করতে না পারে। চিরদিন তার অন্তর্ধান রহস্যাবৃত থাকবে।

কথাটা শুনে সূর্যকান্ত, জগন্নাথ চমকাল। তাদের দুই চোখে কেমন একটা বিপন্ন অসহায়তা ফুটে উঠল।

মধ্য রাত্রি।

জনতার কোলাহল স্তিমিত। ক্লান্ত হয়ে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে। তবু এক বিশাল জনতা মাঝে মাঝে চিৎকার করছে, দ্বার খোল। প্রভু দেখা দাও।

অকস্মাৎ সশব্দে মন্দিরের বিশাল দ্বার খুলে গেল।

জনতা মত্ত মাতঙ্গের মত মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। মুহূর্তে গোটা মন্দির কক্ষ মানুষের ভীড়ে ভরে গেল। সকলে কয়েকমুহূর্ত ভীড়ের এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে লাগল শালপ্রাংশু মহাভুজ একটি অসাধারণ আশ্চর্য সন্ন্যাসীকে। গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন মন্দিরের কক্ষে ক্ষীণ দীপালোকে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। জনতা তীব্র একটা অস্থিরতায়, মনের যন্ত্রণাতেই যেন চীৎকার করে ডাকল: কোথায় আমাদের প্রভু?

বিগ্রহের পাশেই জগন্নাথদাস দণ্ডায়মান। বিদ্যাধর তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল: মহাপ্রভু জগন্নাথ দেহে'যে, বিলীন হয়েছে একথাটা তোমার মুখে না শুনলে জনতা বিশ্বাস করবে না। ওদের বোঝানোর কাজটা তোমাকেই করতে হবে।

জগন্নাথ বড় করুণ আর অসহায় দৃষ্টিতে বিদ্যাধরের দিকে তাকাল।

নাভিমূল থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। এক চোখ তার বিদ্যাধরের দিকে আর এক চোখ জনতার দিকে। বেশ কয়েকবার ঢোক গিলল। তারপর কেমন মরিয়া হয়ে আচ্ছন্ন গলায় বলল: জগন্নাথের সচল বিগ্রহকে অচল দারুব্রহ্ম আত্মসাৎ করেছেন। মহাপ্রভু দারুব্রহ্মের গায়ে চন্দন লেপন করছিলেন। দারুব্রহ্ম সন্তুষ্ট হয়ে মুখ ব্যাদান করলেন। মহাপ্রভু সেই মুখ গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অন্ধকারে জনতা একে অপরের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কেউ কারো মুখ ভাল করে দেখতে পেল না। কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস মন্দিরে হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ল।

একটা গুঞ্জন উঠল। লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল এ কি সম্ভব?

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥"
